সংশোধিত ও পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ

সঙ্গীত-পরিচিতি

॥ উত্তর ভাগ ॥

প্রয়াগ সঙ্গীত সমিতির (এলাহাবাদ) ৪র্থ থেকে ৬ষ্ঠ বর্ষ ;
ভাতখণ্ডে সঙ্গীত বিদ্যাপীঠের (লক্ষ্ণৌ) ৪র্থ ও ৫ম বর্ষ
তথা সর্ব-ভারতে মান্য যেকোন সঙ্গীত বিশ্ববিদ্যালয়ের
কণ্ঠ ও তন্ত্রবাদ্যের বি. মুজ. বিদ্যার্থীদের জন্য।

শ্রীনীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক : 'স্বরছন্দা' সঙ্গীত পত্রিকা
প্রাক্তন সম্পাদক : 'সচিত্র ভারত' ও 'হসন্তিকা'
অধ্যক্ষ : ভারতীয় সঙ্গীত সমাজ, কলিকাতা
পরীক্ষক : প্রয়াগ সঙ্গীত সমিতি, এলাহাবাদ

হসন্তিকা প্রকাশিকা

কলিকাতা-২৬

SANGEET PARICHITI ● UTTAR BHAG

প্রথম প্রকাশ ॥
১০ই আশ্বিন, ১৩৭১ ॥ ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪
দ্বিতীয় প্রকাশ ॥
২৪শে ভাদ্র, ১৩৭৪ ॥ ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৭
তৃতীয় প্রকাশ ॥
১০ই ভাদ্র '৭৬ ॥ ২৭শে আগষ্ট, '৬৯
চতুর্থ প্রকাশ ॥
২৫শে বৈশাখ, '৭৮ ॥ ৯ই মে, '৭১

প্রকাশিকা ॥
শ্রীমতী উমা বন্দ্যোপাধ্যায়
হসন্তিকা প্রকাশিকা
৩৯-বি, মহিম হালদার স্ট্রীট, কলিকাতা-২৬

মুদ্রক ॥
শ্রীকালীপদ নাথ
নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৬, চালতাবাগান লেন, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট ॥
শ্রীবিপুল সেনগুপ্ত

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ ॥
চয়নিকা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

বাইণ্ডার ॥
নিউ ইণ্ডিয়া বাইণ্ডার্স
৫-বি, পাটোয়ার বাগান লেন, কলিকাতা-৯

নয় টাকা

উৎসর্গ

সঙ্গীতকোবিদ ডাঃ বিমল রায়, এম. বি.

শ্রদ্ধাস্পদেষু

॥ প্রথম সংস্করণের ভূমিকা ॥

সুপ্রসিদ্ধ সংগীত-তত্ত্ববিদ্ ও সুগায়ক শ্রীনীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রয়াগ সংগীত সমিতির "সংগীত প্রভাকর" উপাধি পরীক্ষার প্রথম হইতে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী ঔপপত্তিক শিক্ষার জন্য "সংগীত-পরিচিতি" গ্রন্থের পূর্ব ভাগ কয়েক বৎসর পূর্বেই প্রকাশ করিয়াছিলেন। সঙ্গীত-শাস্ত্র বোধের পক্ষে সহজ সরল ভাষায় রচিত উক্ত গ্রন্থটি ছাত্র-ছাত্রী তথা শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের পক্ষেও খুবই সহায়ক হইয়াছিল এবং সেই জন্যই ইহার প্রথম সংস্করণ অত্যল্প কালের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া যায়। পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণটিও সকলের বিশেষ উপকার সাধিত করিয়াছে।

পূর্ব ভাগ পাঠ করিয়া আমাদের আকাঙ্ক্ষা এরূপ বর্ধিত হইয়াছিল যে এই গ্রন্থের উত্তর ভাগটি শীঘ্রই প্রকাশিত হউক এইরূপ ইচ্ছা পোষণ করিতেছিলাম। কারণ "সংগীত প্রভাকরের" চতুর্থ বার্ষিক হইতে উপাধি পরীক্ষার (৬ষ্ঠ বার্ষিক) শ্রেণী পর্যন্ত বাঙালী ছাত্র ছাত্রীদের সংখ্যা ক্রমশঃ এতই বৃদ্ধি পাইতেছে যে, বাঙলা ভাষায় পূর্ণ উপপত্তি বিষয়ক গ্রন্থের আশু প্রয়োজন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছিলাম। সুখের বিষয় শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় "সংগীত-পরিচিতির" উত্তর ভাগ প্রকাশ করিয়া আমাদের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা ও পরীক্ষার্থীদের সবিশেষ প্রয়োজন পূর্ণরূপেই মিটাইলেন। এজন্য তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ না জানাইয়া পারিতেছি না।

দীর্ঘকালব্যাপী বিশিষ্ট গুণীদের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করায় শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের সাঙ্গীতিক জ্ঞান যেমন গভীর, সুদীর্ঘকাল রস-সাহিত্য ও সঙ্গীত-পত্রিকার সম্পাদনা করায় তাঁহার ভাষা তেমনি প্রাঞ্জল ও মনোরম। ঘরোয়াভাবে, প্রশ্নোত্তরের মত করিয়া সংগীতের তত্ত্বকথাগুলি উত্তমরূপেই বর্ণিত হইয়াছে। বাংলাদেশে "সংগীত প্রভাকর" পরীক্ষার প্রচারে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় যেমন প্রথম প্রবর্তক, ঐ পরীক্ষার উপযোগী গ্রন্থ প্রণয়নেও তিনিই প্রথম ও প্রধান ব্যক্তি। সংগীতের প্রতি আগ্রহ বর্ধনে "সংগীত প্রভাকরের" অবদান যেমন অনস্বীকার্য 'সুরছন্দা' সঙ্গীত পত্রিকার প্রকাশনা, সঙ্গীত গ্রন্থাদির রচনা ও সঙ্গীত-অধ্যাপনার দ্বারা জনসাধারণের মন হইতে সঙ্গীত-শাস্ত্র-ভীতি অপসারণের ব্যাপারে নীলরতনবাবুর অক্লান্ত প্রচেষ্টাও তেমনি উচ্চ প্রশংসার দাবী রাখে। তাঁহার প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করুক, ইহাই আমাদের একান্ত কাম্য। ইতি—

৫৫, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড
কলিকাতা-১৯

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

চতুর্থ সংস্করণের নিবেদন ॥

শিক্ষক-শিক্ষিকা তথা শিক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থীদের প্রশংসাধন্য 'সঙ্গীত পরিচিতি' উত্তর ভাগের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। যাঁদের জন্য এই সাফল্য, তাঁদের সকলকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা।

এই সংস্করণে কিছু নতুন বিষয় সংযোজিত হয়েচে। কিছু কিছু সংশোধনও করা হয়েচে।

মুদ্রণ শিল্পের ব্যয় তথা কাগজের অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধির জন্য প্রকাশিকাকে বাধ্য হয়ে এই সংস্করণের দাম এক টাকা বাড়াতে হয়েচে। আশা করি পাঠক-পাঠিকারা সব দিক বিবেচনা করে এজন্য অপরাধ নেবেন না।

২৫শে বৈশাখ, ১৩৭৮ বিনীত
কলিকাতা-২৬ গ্রন্থকার

॥ অনুক্রমণী ॥

- ভারতীয় সঙ্গীতে প্রচলিত দুটি পৃথক পদ্ধতি ॥ শ্রুতি, স্বর, ঠাট, রাগ, জাতি, তাল ... ... পৃষ্ঠা ১—১০
- এক নজরে উত্তরী ও দক্ষিণী পদ্ধতির তুলনা ॥ সমতা-বিভিন্নতা পৃঃ ১০—১১
- নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ গান ॥ প্রাচীন ও আধুনিক কালের নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ গান ॥ ধাতু, বিদারী, রাগালাপ, রূপকালাপ, আলপ্তি, স্বস্থান নিয়ম, স্থায়ী, দ্বয়র্দ্ধ, দ্বিগুণ ও অর্দ্ধস্থিত স্বর পৃঃ ১২—১৫
- আধুনিক আলাপ গায়নের বিধি ॥ অল্পত্ব ও বহুত্ব ॥ লঙ্ঘনমূলক ও অনভ্যাসমূলক অল্পত্ব, অলঙ্ঘন ও অভ্যাসমূলক বহুত্ব ॥ সংন্যাস ও বিন্যাস ॥ মন্দ্র ও তার ॥ আবির্ভাব ও তিরোভাব ... ... পৃঃ ১৫—২১
- গ্রাম ও মূর্ছনা ॥ গ্রামভেদে শ্রুতি ও স্বরের বিভক্তিকরণ, বিভিন্ন সময় তথা বিভিন্ন গ্রামের প্রতিটি স্বরের শ্রুতি-সংখ্যা, মূর্ছনা, ষড়জগ্রাম, মধ্যমগ্রাম ও গান্ধারগ্রামের মূর্ছনা ॥ মূর্ছনা ও আধুনিক ঠাট .. পৃঃ ২২—২৮
- শ্রুতি ও স্বরের বিভক্তিকরণে বিভিন্ন কালের সঙ্গীতবিজ্ঞানীদের মতামতের তুলনা (প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক কাল) পৃঃ ২৮—৩১
- স্বরের আন্দোলন সংখ্যা ॥ তারের দৈর্ঘ্য ও আন্দোলন সংখ্যার রহস্য ॥ তারের দৈর্ঘ্য থেকে স্বরের আন্দোলন সংখ্যা নিরূপণ করা ॥ তারের দৈর্ঘ্য ও স্বরের অবস্থান ॥ ষড়জ-পঞ্চম ভাব ॥ পঃ শ্রীনিবাসকৃত বিকৃত স্বরের স্থান ॥ এক নজরে শ্রীনিবাসের শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর-তন্ত্রীর দৈর্ঘ্য ও আন্দোলন সংখ্যা ... ... পৃঃ ৩১—৪২
- আধুনিক কালের শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর-স্থান ... পৃঃ ৪৩—৪৪
- অধ্বদর্শক স্বর ... ... পৃঃ ১৫০
- ভরতের শ্রুত্যন্তর ও সারণা চতুষ্টয়ী ... ... পৃঃ ৪৪—৪৭
- জাতি গান ॥ রত্নাকরের দশবিধি ... ... পৃঃ ৪৮—৫০
- রাগ-রাগিনী পদ্ধতি ॥ ধ্রুপদ গানের চারটি বাণী ... পৃঃ ৫০—৫৪
- কণ্ঠসঙ্গীতে বিভিন্ন ঘরানা ও তার বিকাশ ॥ ... পৃঃ ৫৪—৫৮
- উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে অহোবলের অবদান ... পৃঃ ৫৮
- সঙ্গীত রচনার নিয়ম ॥ রাগে বিবাদী স্বরের প্রয়োগ ... পৃঃ ৫৮—৬০
- বিষ্ণুদিগম্বর স্বরলিপি পদ্ধতি ... ... পৃঃ ৬০— ২
- গীতশৈলীর বিভিন্ন প্রকার ॥ ত্রিবট, চতুরঙ্গ, বাউল, ভাটিয়ালী, কজলী ও চৈতী ... ... পৃঃ ৬২—৬৫
- কয়েকটি পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যা ॥ গায়ক ও গায়কী, নায়ক ও নায়কী, কলাবন্ত, বাগ্‌গেয়কার, পণ্ডিত, গান্ধর্ব বা মার্গ সঙ্গীত ও দেশী সঙ্গীত বা গান ... পৃঃ ৬৬—৬৭

● বাদ্য ও তার প্রকার ॥ সরোদ, সারঙ্গী, এস্রাজ, বেহালা, গীটার, বাঁশী বা বংশী, শানাই, হারমোনিয়ম … পৃঃ ৬৮— ৭৫
তানপুরায় উৎপন্ন সহায়ক নাদ … … পৃঃ ৭৬—৭৮
তন্ত্রবাদ্যের কয়েকটি পরিভাষা ॥ লাগডাট, লড়-গুথাও, কৃন্তন, তারপরণ, কস্‌বী, অতাঈ … … পৃঃ ৭৮—৭৯
বাদকদের গুণাবগুণ … … পৃঃ ৭৯
● রাগ-পরিচিতি ॥ শংকরা, দেশকার, পাহাড়ী, মাঁড়, আসা, কামোদ, ছায়ানট, শুদ্ধকল্যাণ, গৌড়সারং, হিণ্ডোল, জয়জয়ন্তী, রাগেশ্রী, গৌড়মল্লার, ঝিঁঝিট, বাহার, মিঞামল্লার, মালগুঞ্জী, সিন্ধুরা, দরবারী কানাড়া, আড়ানা, দেশী, বিভাস, রামকেলী, যোগিয়া, শ্রী, বসন্ত, পরজ, পুরিয়া ধনাশ্রী, মূলতানী, পুরিয়া ও ললিত পৃঃ ৮০—১৫০
● রাগের তুলনামূলক আলোচনা ॥ শংকরা ও বেহাগ, দেশকার ও ভূপালী, ছায়ানট ও কামোদ, শুদ্ধ কল্যাণ ও দেশকার, শুদ্ধকল্যাণ ও ভূপালী, হিণ্ডোল ও পুরিয়া, মালগুঞ্জী ও বাগেশ্রী, বাহার ও মিঞামল্লার, বাগেশ্রী ও বাহার, দরবারী কানাড়া ও আড়ানা, পরজ ও বসন্ত, টোড়ী ও মূলতানী, পুরিয়া ও সোহিনী, পুরিয়া ও মারোয়া … … … পৃঃ ১৫১—১৬২
● তাল-পরিচিতি ॥ টপ্পা, ধুমালী, ঝুমরা, আড়া চৌতাল, শিখরতাল, পঞ্চম সওয়ারী, গজঝম্পা মত্ততাল, পাঞ্জাবী ও অদ্ধা … … পৃঃ ১৬৩—১৭৭
গণিতের দ্বারা কোন গান বা তালের দুগুণ, তিগুণ ইত্যাদি আরম্ভ করার স্থান নির্ণয় … … পৃঃ ১৭৮—১৮০
● পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত ॥ পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের স্বর ও অক্‌টেভ পৃঃ ১৮১—১৮৩
স্বর-সপ্তক বা স্কেল ॥ ডায়াটনিক স্কেল, ইকোয়ালী টেম্‌পার্ড বা ক্রমেটিক স্কেল … … পৃঃ ১৮৩—১৮৭
স্বরলিপি পদ্ধতি ॥ স্টেভ বা স্টাফ, লেজার লাইন, ক্লেফ পৃঃ ১৮৭—১৯৪
স্থায়িত্বজ্ঞাপক চিহ্ন ॥ ব্রিভ, সেমিব্রিভ, মিনিম ইত্যাদি, স্টেম, ডট্ ও টাই … … পৃঃ ১৯৪—১৯৭
বিরাম চিহ্ন ॥ রেস্ট, পজ্ বা সায়লেন্স … পৃঃ ১৯৮
স্বরান্তর বা ইন্টারভাল ॥ পারফেক্ট, মেজর, মাইনর ইত্যাদি পৃঃ ১৯৮—২০২
পাশ্চাত্ত্য স্বরের তাল বা টাইম ॥ সিম্‌প্ল ও কম্পাউণ্ড, ডুপ্ল্, ট্রিপ্ল্, কোয়াড্রুপ্ল, মেলডী ও হারমোনী ইত্যাদি পৃঃ ২০২—২০৭
● থিওরী (শাস্ত্র) পরীক্ষার পাঠক্রম … … পৃঃ (১)—(৭)

———

॥ ভারতীয় সঙ্গীতে প্রচলিত দুটি পৃথক পদ্ধতি ॥

ভারতীয় সঙ্গীতে যে হিন্দুস্থানী ও কর্ণাটকী নামে দুটি পৃথক পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তা অনেক আগেই আপনারা জেনেচেন (মৎ লিখিত 'সঙ্গীত পরিচিতি' পূর্ব ভাগ দ্রষ্টব্য)। সে সময় বলা হয়েছিল, এই দুই পদ্ধতির স্বর, তাল, রাগ, গীতরীতি ও তার প্রকার ইত্যাদির মধ্যে যে পার্থক্য আছে, সে সম্বন্ধে বিস্তৃত অধ্যয়ন পরে করা হবে। পূর্ব-আলোচিত অংশগুলির পুনরালোচনা না করে তার পরের অংশগুলি আজ আলোচিত হবে। কিন্তু তার পূর্বে এ সম্বন্ধে একটি ভ্রমাত্মক বিষয়ের অবতারণা করা দরকার। কারণ, আপনারা এখন উঁচু ক্লাসের শিক্ষার্থী। এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে যাতে একটা স্পষ্ট ধারণা আপনাদের মনে জন্মায়, তারই জন্য এই অবতারণা।

অনেকেরই ধারণা, রাজনৈতিক কারণে উত্তর-ভারতীয় হিন্দুস্থানী সঙ্গীত যেমন বৈদেশিক সঙ্গীত ও সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে কালক্রমে তার নিজের বৈশিষ্ট্য বহুলাংশে হারিয়ে ফেলেচে, দক্ষিণ-ভারতে (মাদ্রাজ, মহীশূর, কর্ণাটক, অন্ধ্র প্রভৃতি) প্রচলিত কর্ণাটকী সঙ্গীত সেরূপ ভাবে প্রভাবিত না হওয়ায় এখনো প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য বজায় রেখে আসচে নির্ভেজাল রূপে।

ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যায়, দাক্ষিণাত্যে আর্যসভ্যতা বিস্তার লাভ করেছিল রামায়ণের যুগে। তার আগে যে এখানে আর্যসভ্যতার বিকাশ হয় নি, তার প্রমাণ, "প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে দাক্ষিণাত্যের অন্তর্ভুক্ত কোন জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায় না। গোদাবরীর দক্ষিণে অবস্থিত অঞ্চলসমূহের উল্লেখ রামায়ণের পূর্বে রচিত কোন গ্রন্থে দেখা যায় না।"—(ভারতবর্ষের ইতিহাস ॥ ১৫শ অধ্যায় ॥ অধ্যাপক এন. সি. রায়, এম. এ.)। আর্যসভ্যতা বিস্তারের পূর্বেও দাক্ষিণাত্যে সঙ্গীত ছিল কিন্তু সে বৈদিক সঙ্গীত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এমন কি আর্যসভ্যতা বিস্তারের পরেও প্রাচীন কর্ণাটকী-পণ্ডিতদের কোন গ্রন্থে বৈদিক যুগের বা বৈদিকোত্তর যুগের স্বরাবলির কোন উল্লেখ নেই। "কারণ তাঁরা জানতেন যে, তাঁদের স্বর-পদ্ধতি তাঁদেরই দেশের স্বাভাবিক

সাংস্কৃতিক বিকাশ থেকে উদ্ভূত এবং বৈদিক পদ্ধতি ছিল সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসার ও প্রচার ক্রমের কৃত্রিম শৈলী মাত্র।" "......এ কথা নির্বিবাদে সত্য যে মুস্লিম যুগে উত্তর ভারতের যে রাগগুলির সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলির সঙ্গে সঙ্গীত শাস্ত্রের নিয়মগুলির মিল নেই। তাতে সাতের চাইতে বেশি স্বরের প্রয়োগ আছে এবং এই ভাবেই প্রাচীন মূর্ছনার নিয়ম এবং শাস্ত্রীয় রাগের দশবিধ লক্ষণের নিয়ম করা হয়েছে। কিন্তু শুধু উত্তর ভারতই এর জন্য একমাত্র দোষী নয়। দক্ষিণ ভারতেও এই দোষ একটু অন্য প্রকারে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে সেখানে রাগে মাত্র সাতটি স্বরই প্রয়োগ করা হয় কিন্তু তার ক্রম প্রাচীন ভারতের মূর্ছনা প্রস্তারের বিপরীত।...মুস্লিম যুগে বিদেশী তত্ত্ব গ্রহণ করার দোষ কেবল উত্তর ভারতের মাথায় চাপালেই হবে না।"—("স্বরছন্দা" সেপ্টেম্বর '৬০॥ "কর্ণাটক সঙ্গীত কি মুস্লিম প্রভাব মুক্ত?"—ডাঃ বিমল রায়, এম. বি.)।

এই সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতিটুকু থেকেই বোঝা যায় যে, কর্ণাটকী সঙ্গীত যে বিদেশী প্রভাব বর্জিত হয়ে নির্ভেজাল ভারতীয় সঙ্গীতের ঐতিহ্য বজায় রেখে আসচে—তা ঠিক নয়।

এখনো উভয় পদ্ধতির মধ্যে যেমন কতগুলি বৈষম্য আছে, তেমনি সাম্যও আছে কয়েকটি ক্ষেত্রে। সেইজন্যই বোধ হয় শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ভাতখণ্ডে বলেচেন: "...হয়ত কিছুকাল বাদে ঐ দুটি পদ্ধতি বহুলাংশে এক হয়ে যাবে। যদি এই মিশ্রণ উত্তম অধিকারী বিদ্বানদের দ্বারা হয়, তাহলে দুই পদ্ধতিরই হিতসাধন হবে।"—(ক্রমিক পুস্তক মালিকা—৪র্থ ভাগ)।

* * * *

এবারে আসুন, এই দুই পদ্ধতির মধ্যে কোথায় কতটুকু মিল বা অমিল আছে দেখা যাক।—

শ্রুতি॥ দুই পদ্ধতিতেই শ্রুতি ও স্বর-বিভাজন একই নিয়মে অর্থাৎ "চতুশ্চতুশ্চতুশ্চৈব..." রীতিতে করা হয়েচে।

স্বর॥ উত্তরী ও দক্ষিণী—দুই পদ্ধতিরই এক সপ্তকে বারোটি করে স্বর আছে। এবং এই স্বরগুলি উভয় পদ্ধতিতেই বাইশটি শ্রুতির ওপর অবস্থিত। কিন্তু দুই পদ্ধতির স্বরের নাম ও স্বরের স্থান এক নয়। নিচে একটি তালিকা দেওয়া হচ্ছে, এই তালিকাটি দেখলেই বুঝবেন দুই পদ্ধতির স্বর-নাম ও স্বর-স্থানে কতটা তফাৎ। এই তালিকাটি এর আগেও আপনাদের সামনে

প্রকাশ করা হয়েছিল। আপনাদের সুবিধার জন্য এর পুনরুক্তি বোধহয় দোষাবহ হবে না।

॥ দুই পদ্ধতির স্বর-তালিকা ॥

সংখ্যা	হিন্দুস্থানী পদ্ধতির স্বর	কর্ণাটকী পদ্ধতির স্বর
১	সা	সা
২	কোমল রে	শুদ্ধ রে
৩	শুদ্ধ রে	চতুঃশ্রুতি রে বা শুদ্ধ গ*
৪	কোমল গ	সাধারণ গ বা ষট্‌শ্রুতি রে
৫	শুদ্ধ গ	অন্তর গ
৬	শুদ্ধ ম	শুদ্ধ ম
৭	তীব্র ম	প্রতি ম
৮	প	প
৯	কোমল ধ	শুদ্ধ ধ
১০	শুদ্ধ ধ	চতুঃশ্রুতি ধ বা শুদ্ধ নি
১১	কোমল নি	কৈশিক নি বা ষট্‌শ্রুতি ধ
১২	শুদ্ধ নি	কাকলী নি

ওপরের তালিকায় দেখা যাচ্ছে, আমাদের পদ্ধতিতে যেমন রে, গ, ম, ধ ও নি—এই পাঁচটি স্বরের দুটি করে (শুদ্ধ ও বিকৃত) রূপ আছে, কর্ণাটকীতে তেমনি রে—তিন রকম (শুদ্ধ,চতুঃশ্রুতি ও ষট্‌শ্রুতি), গ—তিন রকম (শুদ্ধ, সাধারণ ও অন্তর) ম—দু রকম (শুদ্ধ ও প্রতি), ধ—তিন রকম (শুদ্ধ, চতুঃশ্রুতি ও

---

* এই তালিকাটির সঙ্গে পূর্ব-প্রদত্ত (সঙ্গীত পরিচিতি—পূর্বভাগ॥ পৃষ্ঠা ৩৯) তালিকাটি মেলালে পাঠকদের মনে একটা সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে। কারণ, তালিকায় কর্ণাটকী শুদ্ধ গান্ধারের অপর নাম দেওয়া হয়েছিল পঞ্চশ্রুতি রে। অথচ এখানে তাকেই বলা হচ্ছে চতুঃশ্রুতি রে। তাই ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করে দেওয়া প্রয়োজন।

মধ্যযুগের গ্রন্থাদিতে আমরা কর্ণাটকী শুদ্ধ গান্ধারকে পঞ্চশ্রুতি রে রূপেই পেয়েচি কিন্তু পরবর্তী কালের হিসেবে এই পঞ্চশ্রুতকেই হিন্দুস্থানী হিসেব মতে দেখতে পাই চতুঃশ্রুতি রূপে। অর্থাৎ আমাদের শুদ্ধ ঋষভের সঙ্গে এর মিল খুঁজে পাই। এইজন্যই পরবর্তী কালের কর্ণাটী পণ্ডিতেরা তাঁদের শুদ্ধ গান্ধারকে, পঞ্চশ্রুতির বদলে চতুঃশ্রুতি ঋষভ বলেচেন। বস্তুতঃ 'মধ্যযুগীয় পঞ্চশ্রুতি ঋষভ যে ঠিক কী ছিল, তা স্পষ্ট করে বলা যায় না। কাজেই পঞ্চ বা চতুঃশ্রুতি—কোন্ ঋষভটি যে কর্ণাটকী গান্ধার, তা নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্চে না। ১০ম সংখ্যক স্বরটি সম্বন্ধেও বক্তব্য ঐ একই।

ষট্‌শ্রুতি) এবং নি—তিন রকম (শুদ্ধ, কৈশিক ও কাকলী)। অবশ্য দুই পদ্ধতিতেই সাতটি শুদ্ধ ও পাঁচটি বিকৃত স্বর মানা হয় কিন্তু এদের স্বর-স্থানে ব্যতিক্রম দেখা যায়। হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে যে স্থানে কোমল রে ও কোমল ধ-এর অবস্থান, কর্ণাটকীতে সেই স্থানেই বিরাজ করচে শুদ্ধ রে ও শুদ্ধ ধ। অর্থাৎ আমরা যাকে কোমল রে ও ধ বলচি, কর্ণাটকীরা তাকেই বলেচেন শুদ্ধ রে ও ধ। আবার হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে যেখানে শুদ্ধ রে ও শুদ্ধ ধ বসে আছে, কর্ণাটকীতে সেই স্থান জুড়ে বসে আছে যথাক্রমে শুদ্ধ গ (অথবা চতুঃশ্রুতি রে) ও শুদ্ধ নি (অথবা চতুঃশ্রুতি ধ)। শুদ্ধ মধ্যমের স্থান দুই পদ্ধতিতেই সমান এবং সা ও প-এর স্থানেও কোন পরিবর্তন হয়নি।

আরো একটি বিষয়ের প্রতি বোধহয় আপনাদের লক্ষ্য এড়ায় নি। কর্ণাটকী পদ্ধতিতে কোমল বলে কোন স্বর নেই। আমাদের পদ্ধতিতে যেমন শুদ্ধ থেকে কোমল স্বর নিচু, ওঁদের তেমনি শুদ্ধ স্বরটিই কোমল স্বরের নামান্তর। অর্থাৎ আমাদের শুদ্ধ স্বর যেমন চড়া, ওঁদের শুদ্ধ স্বর তেমনি নিচু।

একই স্বরের ভিন্ন দুটি নামকরণও কর্ণাটকী পদ্ধতির আর একটি বৈশিষ্ট্য। যেমন ৩নং স্বরটিকে তাঁরা একবার বলচেন চতুঃশ্রুতি রে, আরেকবার তাকেই বলচেন শুদ্ধ গ। ৪নং স্বর একবার হচ্ছে সাধারণ গ আরেকবার ষট্‌শ্রুতি রে। ১০ নং স্বরেরও দুই নাম—চতুঃশ্রুতি ধ ও শুদ্ধ নি এবং ১১নং স্বরকেও কৈশিক নি ও ষট্‌শ্রুতি ধ নামে চিহ্নিত করা হয়। সেই জন্যই কর্ণাটকী পদ্ধতিতে

সা রে̠ রে ম প ধ̠ ধ র্সা—এই স্বর সমষ্টি দিয়ে ঠাট রচনা করা হয়।

কর্ণাটকী পদ্ধতির শুদ্ধ সপ্তকের ঐ ঠাটটিকে বলা হয় মুখারী বা কণকাংগী।

ঠাট॥ দুই পদ্ধতিতেই ঠাট বস্তুটিকে মানা হয় কিন্তু ঠাট-সংখ্যা উভয় পদ্ধতিতে এক নয়। উত্তরীতে যেমন অঙ্ক কষে ৩২টি ঠাট রচনা করা গেলেও রাগ উৎপন্নকারী জনক ঠাট বলা হয় মাত্র দশটিকে, দক্ষিণীতে তেমনি গণিতের সাহায্যে মোট ৭২টি ঠাট রচনা করা গেলেও, রাগ উৎপন্নকারী জনক ঠাট বোঝায় মাত্র উনিশটিকে। তাছাড়া দুই পদ্ধতির ঠাট-নামেও তফাৎ আছে। আপনারা হিন্দুস্থানী পদ্ধতির দশটি ঠাটের নাম জানেন (সঙ্গীত পরিচিতি—পূর্ব ভাগ দ্রষ্টব্য)। কর্ণাটকী ১৯টি ঠাটের নাম নিম্নরূপ :—

মুখারী, সামবরালী, ভূপাল, বসন্ত ভৈরবী, গৌল, আহিরী, ভৈরবী, শ্রীরাগ,

হেজুজ্জী, কাম্ভোজী, শঙ্করাভরণ, সামন্ত, দেশাক্ষী, নাট, শুদ্ধ বরালী, পন্ত বরালী, শুদ্ধ রামক্রিয়া, সিংহরব ও কল্যাণী।

এই ঠাটগুলির সম্বন্ধে পঃ ব্যঙ্কটমখী তাঁর "চতুর্দণ্ডীপ্রকাশিকা" গ্রন্থে বিশদ ভাবে বর্ণনা করেচেন।

রাগ॥ উভয় পদ্ধতির রাগগুলির মধ্যে কোন কোন বিষয়ে মিল পাওয়া গেলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অমিল দেখা যায়। মিল দেখা যায় নামের ক্ষেত্রে—তাও কোন কোন জায়গায়। যেমন ভৈরবী, হিন্দোল, শ্রী, কল্যাণ প্রভৃতি। এই নামগুলি উভয় পদ্ধতির রাগেই পাওয়া যায়। কিন্তু দুই পদ্ধতির রাগগুলির মধ্যে কোন স্বর বা স্বরূপসাম্য নেই। উত্তরী পদ্ধতির দশটি আশ্রয়-রাগের মধ্যে দক্ষিণী কয়েকটি রাগের সাম্য দেখা গেলেও ঐ নামগুলির মধ্যে কোন রকম সমতা দেখা যায় না। যেমন :—

হিন্দুস্থানী আশ্রয় রাগ	কর্ণাটকী রাগ
১। বিলাবল	ধীর শঙ্করাভরণ
২। ইমন	মেচ কল্যাণী
৩। খমাজ	হরি কাম্ভোজী
৪। কাফী	খরহরপ্রিয়া
৫। আসাবরী	নট ভৈরবী
৬। ভৈরবী	মায়ামালব গৌল
৭। ভৈরব	হনুমত তোড়ী
৮। পূর্বী	কামবর্দ্ধনী
৯। মারোয়া	গমনপ্রিয়া
১০। তোড়ী	শুভপন্ত বরালী

দশটি আশ্রয় রাগ ছাড়াও কয়েকটি রাগ-নাম নিম্নরূপ :—

১১। ভূপালী	মোহনম্
১২। দুর্গা	শুদ্ধ সাবেরী
১৩। যোগীয়া	সাবেরী

জাতি॥ হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে যেমন প্রধানতঃ তিনটি জাতি আছে (ঔড়ব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণ), কর্ণাটকীতে তেমনি পাঁচ রকম জাতি আছে (ঔড়ব, ষাড়ব, সম্পূর্ণ, বক্র ও সঙ্কীর্ণ)।

তাল॥ হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে যেমন বহু রকমের বৈচিত্র্যপূর্ণ তাল আছে

কর্ণাটকী পদ্ধতিতে আজকাল তেমনি মাত্র পঁয়ত্রিশটি তাল বিদ্যমান। আজকাল বললাম এইজন্য যে, প্রাচীন কালে এই পদ্ধতিতে ১০৮ রকমের তাল প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়। অধুনা প্রচলিত পঁয়ত্রিশটি তালের মধ্যে আবার মুখ্য তাল হল সাতটি : ধ্রুব, মঠ, রূপক, ঝম্প, ত্রিপুট, অঠ ও একতাল। এই তালগুলির প্রত্যেকটির পাঁচটি করে জাতি আছে। সেগুলি হল : চতশ্র, তিশ্র, মিশ্র, খণ্ড ও সঙ্কীর্ণ। সাতটি প্রধান তালের প্রত্যেকটির পাঁচটি করে জাতি থাকায় মোট তালের সংখ্যা হয়েচে পঁয়ত্রিশটি।

এক-একটি তাল যেমন ৫টি বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হয়ে মোট ৩৫টি তাল হয়েচে, তেমনি প্রত্যেকটি তালের আবার অঙ্গভেদ আছে। মোট অঙ্গ হল ছয়টি, তবে আজকাল মাত্র তিনটি অঙ্গই কাজে লাগানো হয়। এই অঙ্গগুলির পৃথক পৃথক চিহ্ন আছে এবং প্রত্যেক অঙ্গের মাত্রা ভিন্ন ভিন্ন। যেমন—

অঙ্গের নাম	চিহ্ন	মাত্রা সংখ্যা
১। লঘু	I	৪
২। দ্রুত	o	২
৩। অনুদ্রুত (বা বিরাম)	‿	১
৪। গুরু	S (বা ৪)	৮
৫। প্লুত	{ (বা ৪)	১২
৬। কাকপদ	+ (বা ×)	১৬

প্রথম তিনটি অঙ্গই বর্তমানে প্রচলিত আছে।

একটি কথা। যদিও লঘু অঙ্গকে এখানে ৪ মাত্রা বলা হয়েচে কিন্তু জাতিভেদে তার মাত্রা সংখ্যার তারতম্য ঘটে। চিহ্ন অবশ্য একই থাকে, বদলায় না। যেমন : চতশ্র জাতিতে লঘুর মাত্রা ধরা হয় ৪, কিন্তু তিশ্র জাতিতে লঘুর মাত্রা হয়ে যায় ৩ ; আবার মিশ্র জাতিতে হয় ৭, খণ্ড জাতিতে ৫ এবং সঙ্কীর্ণ জাতিতে হয় ৯ মাত্রা। যেমন—

জাতির নাম	লঘুর পরিমাণ
চতশ্র (বা চতুরশ্র)	৪ মাত্রা
তিশ্র	৩ "
মিশ্র	৭ "
খণ্ড	৫ "
সঙ্কীর্ণ	৯ "

এই তালিকাটি মনে রাখলে হিসেব করতে সুবিধে হবে। এইবার দেখুন—

১ ॥ ধ্রুব তাল ॥

এই তালটি যখন **চতশ্র জাতিতে** থাকে, তখন লঘুর পরিমাণ হয় ৪ এবং এই তালের মাত্রাসমষ্টি হয় ১৪। লেখা হয় ।০।। =৪+২+৪+৪=১৪। অর্থাৎ । (লঘু)=৪+০ (দ্রুত)=২+ । (লঘু)=৪+। (লঘু)=৪, মোট ১৪ মাত্রা।

এবার দেখুন **তিশ্র জাতির** ধ্রুব তাল। এখানে লঘুর পরিমাণ হয়ে যাচ্ছে ৩। যেমনঃ ।০।।=৩+২+৩+৩=১১ মাত্রা। অর্থাৎ ধ্রুব তাল যেই তিশ্র জাতির অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, তখনই সেটি হয়ে যাচ্ছে ১১ মাত্রার তাল।

মিশ্র জাতিতে ধ্রুব তালের মাত্রা হচ্ছে ২৩ এবং লঘুর পরিমাণ তখন ৭। অতএব ।০।।মানে হচ্ছে ৭+২+৭+৭=২৩।

খণ্ড জাতির ধ্রুব তাল হবে ১৭ মাত্রার। লঘুর পরিমাণ তখন হবে ৫। তাহলে ।০।।=৫+২+৫+৫=১৭ মাত্রা।

সঙ্কীর্ণ জাতির ধ্রুব তাল বললেই বুঝতে হবে এটি ২৯ মাত্রার তাল। লঘুর মাত্রা-মান এখানে ৯। যদি লেখা থাকে।০।।, তাহলে বুঝতে হবে ৯+২+৯+৯=২৯ মাত্রা।

এবার বুঝতে পারলেন তো যে, চিহ্ন এক রকম হলেও বিভিন্ন জাতিতে লঘুর মাত্রা-সংখ্যা কী ভাবে বদলে যায়! এই নিয়মে প্রত্যেকটি তাল কী ভাবে বদলাচ্ছে দেখুন।—

২ ॥ মঠ তাল ॥

চতশ্র জাতির—মাত্রা সংখ্যা ১০

।০। =৪+২+৪=১০ মাত্রা

তিশ্র জাতি—মাত্রা সংখ্যা ৮

।০। =৩+২+৩=৮ মাত্রা

মিশ্র জাতি—মাত্রা সংখ্যা ১৬

।০। =৭+২+৭=১৬ মাত্রা

খণ্ড জাতি— মাত্রা সংখ্যা ১২

।০। = ৫+২+৫=১২ মাত্রা

সঙ্কীর্ণ জাতি—মাত্রা সংখ্যা ২০

।০। = ৯+২+৯=২০ মাত্রা

৩ ॥ রূপক তাল ॥

চতশ্র জাতি—৬ মাত্রা : { ০। =২+৪=৬
।০ =৪+২=৬ }

[উপরোক্ত দুই ভাবেই চতশ্র জাতির রূপক তালকে বিভক্ত করা হয়]

তিশ্র জাতি— ৫ মাত্রা : ।০ =৩+২=৫

মিশ্র জাতি— ৯ মাত্রা : ।০ =৭+২=৯

খণ্ড জাতি— ৭ মাত্রা : ।০ =৫+২=৭

সংকীর্ণ জাতি— ১১ মাত্রা : ।০ =৯+২=১১

৪ ॥ ঝম্প তাল ॥

চতশ্র জাতি— ৭ মাত্রা : ।◡০ =৪+১+২=৭

তিশ্র জাতি— ৬ মাত্রা : ।◡০ =৩+১+২=৬

মিশ্র জাতি— ১০ মাত্রা : ।◡০ =৭+ . +২=১০

খণ্ড জাতি— ৮ মাত্রা : ।◡০ =৫+১+২=৮

সংকীর্ণ জাতি— ১২ মাত্রা : ।◡০ =৯+১+২=১২

৫ ॥ ত্রিপুট তাল ॥

চতশ্র জাতি : ।০০ =৪+২+২=৮ মাত্রা

তিশ্র জাতি : ।০০ =৩+২+২=৭ মাত্রা

মিশ্র জাতি : ।০০ =৭+২+২=১১ মাত্রা

খণ্ড জাতি : ।০০ =৫+২+২=৯ মাত্রা

সংকীর্ণ জাতি : ।০০ =৯+২+২=১৩ মাত্রা

৬ ॥ অঠ তাল ॥

চতশ্র জাতি : ।।০০ =৪+৪+২+২=১২ মাত্রা

তিশ্র জাতি : ।।০০ =৩+৩+২+২=১০ মাত্রা

মিশ্র জাতি : ।।০০ =৭+৭+২+২=১৮ মাত্রা
খণ্ড জাতি : ।।০০ =৫+৫+২+২=১৪ মাত্রা
সংকীর্ণ জাতি : ।।০০ =৯+৯+২+২=২২ মাত্রা

৭ ॥ একতাল ॥

চতশ্র জাতি : । = ৪ মাত্রা
ত্রিশ্র জাতি : । = ৩ মাত্রা
মিশ্র জাতি : । = ৭ মাত্রা
খণ্ড জাতি : । = ৫ মাত্রা
সংকীর্ণ জাতি : । = ৯ মাত্রা

হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে যেমন প্রত্যেকটি তালকে কয়েকটি বিভাগে ভাগ করা হয় এবং কোন বিভাগের প্রথম মাত্রার ওপর হাততালির আঘাত এবং কোন বিভাগের প্রথম মাত্রায় আঘাত না করে শুধু হাতের ইঙ্গিত দিয়ে বিভাগগুলিকে বোঝানো হয়, দক্ষিণী মতেও সেই নিয়ম আছে। তবে আমাদের যেমন তালি এবং খালি (বা ফাঁক) দুটি জিনিস আছে, তাঁদের পদ্ধতিতে তেমনি শুধুই তালি আছে—খালি বা ফাঁক বলে কোন বস্তু নেই। সব বিভাগগুলিই দেখান হয় তালি দিয়ে।

যেমন মনে করুন আমাদের চৌতাল। আমাদের মতে এতে আছে ৬টি বিভাগ—যার মধ্যে ২টি বিভাগে খালি ধরা হয়। কিন্তু দক্ষিণী মতে ৪টি বিভাগ। প্রথম দুটি বিভাগ হবে চার-চার মাত্রার এবং পরের বিভাগ দুটি হবে দুই-দুই মাত্রার। ঠিক চতশ্র জাতির অঠ তালের মত। কারণ এতে কোন খালি নেই। আমাদের ঝাঁপতালকে ওঁদের মতে চতশ্র জাতিতে ভাগ করলে হবে মোট তিন ভাগ। ১ম ভাগটি ২ মাত্রার, ২য় ভাগটি ৫ মাত্রার এবং শেষ ভাগটি ৩ মাত্রার। অর্থাৎ ২+৫+৩=১০ মাত্রা। তাহলে আমরা বুঝলাম যে এই পদ্ধতিতে যতগুলি তালের চিহ্ন থাকবে, বিভাগও ততগুলিই থাকবে এবং ফাঁক বা খালি বলে কোন পদার্থ এতে নেই।

কিন্তু এতে আরেকটি জিনিস আছে যার নাম হল 'বিসর্জিতম'। প্রতিটি বিভাগের প্রথম মাত্রায় তালির আঘাত করার পর, অবশিষ্ট মাত্রাগুলিকে

দেখানো হয় এই 'বিসর্জিতম্' দ্বারা। 'বিসর্জিতম্' ক্রিয়াটিকে আবার তিন রকম ভাবে দেখাবার নিয়ম আছে। যেমন,

(১) পতাংক বিসর্জিতম্॥ হাত ওপর দিকে তুলে মাত্রার হিসেব রাখা হয়।

(২) সর্পিণী বিসর্জিতম্॥ ডান দিকে হাত তুলিয়ে এই ক্রিয়া দেখানো হয়।

(৩) কৃষয় বিসর্জিতম্॥ এতে বাঁ দিকে হাত হেলানো হয়।

এক মাত্রার বিভাগ অর্থাৎ অনুদ্রুত হলে, সেখানে বিসর্জিতম্ থাকে না। শুধুই আঘাতের দ্বারা তাল দেখানো হয়। দ্রুত অর্থাৎ দু' মাত্রার বিভাগ হলে, ১ম মাত্রায় তালি ও ২য় মাত্রায় বিসজিতম্ দেখাতে হয়।

॥ একনজরে উত্তরী ও দক্ষিণী পদ্ধতির তুলনা ॥

এতক্ষণ হিন্দুস্থানী ও কর্ণাটকী পদ্ধতির যে বিস্তৃত আলোচনা করা হল তাতে আমরা স্পষ্টভাবেই উভয় পদ্ধতির সমতা ও বিভিন্নতাগুলি বুঝতে পেরেচি। সুবিধের জন্য—সংক্ষিপ্ত ভাবে—এই দুই পদ্ধতির তুলনা আরেকবার আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করা হচ্ছে।—

॥ সমতা ॥

১। দুটি পদ্ধতি মূলতঃ একই প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীত থেকে উৎপন্ন। পূর্বে ভারতীয় সঙ্গীতের একটিমাত্র পদ্ধতিই প্রচলিত ছিল। রাজনৈতিক তথা সামাজিক কারণে, অনেকের মতে, 'মকরন্দ'কার নারদের সময় থেকে (৭ম-১১শ শতাব্দী) এই দুই পদ্ধতির প্রথম সূত্রপাত হয়।

২। উভয় পদ্ধতির সঙ্গীতেই গীত, বাদ্য ও নৃত্যের সমাবেশ থাকে।

৩। এক সপ্তকে বা স্থানে বাইশটি শ্রুতির স্থিতি সম্বন্ধে উভয় পদ্ধতির পণ্ডিতেরাই একমত এবং উভয় পক্ষই শার্ঙ্গদেব কৃত "চতুশ্চতুশ্চতুশ্চৈব" মতের অনুগামী।

৪। উভয় পদ্ধতিতেই বাইশটি শ্রুতির ভিত্তিতে শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরস্থান নির্ধারিত করা হয়েচে।

৫। উভয় পদ্ধতির এক সপ্তকে বা স্থানে শুদ্ধ ও বিকৃত মিলিয়ে মোট বারোটি স্বর সম্বন্ধে কেউই দ্বিমত নন।

৬। এক সপ্তকের বারোটি স্বর থেকেই উভয় পদ্ধতির ঠাট (থাট) রচিত হয়েচে।

৭। ঠাট-রাগ পদ্ধতি উভয় পক্ষেই মান্য।

৮। দুই পদ্ধতির কতকগুলি রাগের মধ্যে সমতা দেখা যায়।

৯। দুই পদ্ধতিতেই তাল বস্তুটি সমান গুরুত্বপূর্ণ।

১০। আচার্য শার্ঙ্গদেব কৃত "সঙ্গীত রত্নাকর" গ্রন্থটি (১২০৫-১২৪৭ খৃষ্টাব্দ) উভয় পদ্ধতির পণ্ডিতদের নিকটই সমাদৃত। উভয় পক্ষই এই গ্রন্থটিকে নিজ নিজ সঙ্গীত পদ্ধতির আধার বলে মনে করেন।

॥ বিভিন্নতা ॥

১। দুই পদ্ধতির স্বর-সংখ্যা সমান হলেও স্বরের নাম ও স্থানে ভিন্নতা আছে।

২। উভয় পদ্ধতিতেই গণিতের সাহায্যে বারোটি স্বরের বিভিন্ন সমন্বয়ে ঠাট সৃষ্ট হলেও দুই পদ্ধতির ঠাট-সংখ্যা এক নয়। যেমন, হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে মোট ঠাট-সংখ্যা ৩২ কিন্তু প্রচলিত জনক ঠাট মাত্র ১০টি। কর্ণাটকীতে তেমনি মোট-সংখ্যা ৭২ হলেও প্রচলিত জনক ঠাটের সংখ্যা হল ১৯।

৩। ঠাটের নাম ও স্বরূপ উভয় পদ্ধতিতে এক নয়।

৪। দুই পদ্ধতির বেশির ভাগ রাগগুলির মধ্যেই যেমন স্বরের মিল নেই, তেমনি স্বরূপেরও মিল পাওয়া যায় না।

৫। দুই পদ্ধতির তালের মধ্যেও বিভিন্নতা লক্ষণীয়।

৬। হিন্দুস্থানী গীতিকবিতাগুলি যেমন প্রধানতঃ ব্রজভাষা, হিন্দী খড়ী বোলী, পঞ্জাবী, বাংলা প্রভৃতি ভাষায় রচিত হয়, দক্ষিণী গীতিকবিতাগুলি তেমনি রচিত হয় তামিল, তেলেগু, কন্নড় প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতীয় ভাষায়।

৭। উভয় পদ্ধতির গীতশৈলীর মধ্যেও তফাৎ আছে। উত্তরী পদ্ধতির গানে যেমন ভাব ও রসের ব্যঞ্জনা বেশি প্রকাশ পায়, দক্ষিণীতে তেমনি দেখা যায় গণিত ও ব্যাকরণের প্রাধান্য।

॥ নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ গান ॥

প্রাচীন কালের গানগুলিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। একটি ভাগ ছিল তাল-বদ্ধ গানের, আরেকটি বিনা তালের। এই দুই ভাগের নাম হল নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ গান।

নিবদ্ধ মানে আবদ্ধ—বন্ধন যুক্ত। যে গানগুলি তালের মধ্যে বাঁধা থাকত, সেইগুলিকে বলা হত নিবদ্ধ গান।

অনিবদ্ধ মানে হল বন্ধন মুক্ত—স্বাধীন। এই ভাগের গানগুলি কোন তালে বাঁধা থাকত না। তাই এইগুলিকে বলা হত অনিবদ্ধ গান। এই হল নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ গানের মূল অর্থ।

॥ প্রাচীন ও আধুনিককালের নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ গান ॥

আগেই জানিয়ে ছিলাম যে, ধ্রুপদ ধমার গানগুলি প্রাচীন বা আদি গান নয়। কারণ আচার্য শার্ঙ্গদেব-এর "সঙ্গীত রত্নাকর" গ্রন্থে (ত্রয়োদশ শতাব্দী) ধ্রুপদাদি গানের কোন উল্লেখ নেই। সে সময়ে প্রচলিত ছিল প্রবন্ধ, বস্তু, রূপক, রাগালাপ, রূপকালাপ, আলপ্তি, স্বস্থান নিয়মের আলাপ গান ইত্যাদি। এইগুলির মধ্যে প্রবন্ধ, বস্তু, রূপক প্রভৃতি ছিল নিবদ্ধ গানের পর্যায় ভুক্ত। অর্থাৎ এইগুলি তাল সহযোগে গাওয়া হত। খেয়াল গানের বহুল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে যেমন ধ্রুপদাদি গানের প্রচলন কমে আসচে, ধ্রুপদ গানের প্রচার বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রবন্ধাদি প্রাচীন গানগুলির প্রচারও ঠিক তেমনি কমে আসতে থাকে। পণ্ডিতেরা বলেন, প্রবন্ধ থেকেই ধ্রুপদ গানের জন্ম হয়েচে।

আজকাল যেমন ধ্রুপদ গানে প্রধানতঃ স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ এই চারটি অবয়ব থাকে, প্রবন্ধ গানে তেমনি থাকত পাঁচটি অবয়ব। এই অবয়বকে ভাগ বা তুক-ও বলা হয়। প্রাচীন কালের ভাগগুলিকে বলা হত **ধাতু**। সেই পাঁচটি ধাতুর নাম ছিল—উদগ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব, অন্তরা ও আভোগ। একটি কথা, যদিও নাম হিসেবে পাঁচটি ধাতুর নাম পাওয়া যেত কিন্তু কোন একটি প্রবন্ধ গানের মধ্যে চারটির বেশি তুক বা ধাতু থাকত না। ধাতুর মত প্রাচীনকালের আরেকটি নাম পাওয়া যায় যাকে বলা হত **বিদারী**। গান কিংবা আলাপের যে ছোট-বড় বিভাগগুলি তাকে বলা হত বিদারী। ধাতু এবং বিদারীর মধ্যে তফাৎ এই যে, প্রাচীন ধাতু—উদগ্রাহ, মেলাপক প্রভৃতি, আধুনিককালের স্থায়ী, অন্তরা প্রভৃতির সঙ্গে যার তুলনা চলে, গীতের সেই অবয়বগুলিকে ধাতুও বলা হয়, বিদারীও বলেন অনেকে। কিন্তু ঐ অবয়বগুলির মধ্যে যে উপ-বিভাগ থাকে সেই

উপ-বিভাগগুলিকে বিশেষ করে বলা হয় **বিদারী**। যে স্বরগুলিকে ন্যাস, অপন্যাস ইত্যাদি বলা হয়, সেগুলি এই বিদারীরই শেষ স্বর।

আজকাল নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ পরিভাষাগুলি ব্যবহৃত না হলেও, ঐ দুই প্রকারের গান কিন্তু প্রচলিত আছে। যেমন, বর্তমানের ধ্রুপদ, ধমার, টপ্‌পা, খেয়াল, প্রভৃতি গানগুলিকে নিবদ্ধ গানের পর্যায়ে ফেলা যায়। কারণ এগুলি তাল-বদ্ধ করে গাওয়া হয়।

আজকালকার আলাপ গানকে—যা প্রধানতঃ ধ্রুপদ গাইবার আগে বা তন্ত্রবাদ্য বাজাবার আগে গাওয়া বা বাজানো হয়,—আধুনিক কালের অনিবদ্ধ গান বলা চলে। কেননা, এগুলি বিনা তালেই গাওয়া বা বাজানো হয়।

এই রকম প্রাচীন কালের অনিবদ্ধ গান ছিল রাগালাপ, রূপকালাপ, আলপ্তি গান, স্বস্থান নিয়মের আলাপ প্রভৃতি। এগুলি আলাপেরই বিভিন্ন প্রকার। তবে হ্যাঁ, অধুনা প্রচলিত আলাপের সঙ্গে তখনকার আলাপ গানের তফাৎ ছিল অনেক। যেমন—

রাগালাপ॥ 'সঙ্গীত রত্নাকর' গ্রন্থে বলা হয়েচে, যে আলাপে রাগের দশটি নিয়ম বিধিবদ্ধ ভাবে পালন করা হ'ত, সেই আলাপকে বলা হত রাগালাপ। এই দশটি নিয়মের নাম গ্রহ, অংশ, ন্যাস, অপন্যাস, অল্পত্ব, বহুত্ব, সংন্যাস, বিন্যাস, মন্দ্র ও তার।

রূপকালাপ॥ এটি হল সেকালের আরেক রকমের আলাপ। 'রূপক' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল—একটি বস্তুকে অন্য বস্তু রূপে বর্ণনা বা প্রমাণ করা। এখানেও রূপক কথাটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েচে। এই আলাপে প্রবন্ধ গানের বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটিয়ে তোলা হত আভাসে—ইঙ্গিতে। এই জন্যই এই ধরণের আলাপকে বলা হয়েচে রূপকালাপ।

রাগালাপের নিয়মগুলি এতেও প্রযোজ্য। অধিকন্তু রূপকালাপের সময়, আলাপকে ছোট ছোট বিভিন্ন ভাগে দেখাতে হত। এই ছোট বিভাগগুলি (উপবিভাগও বলেন অনেকে) যে স্বরের ওপর শেষ হত, সেই স্বরকে বলা হত অপন্যাস স্বর।

আলপ্তি॥ রাগালাপ ও রূপকালাপের পর গাওয়া হত আলপ্তি। রাগের পূর্ণ অংশ প্রকাশ করা হত এই আলাপে। তাছাড়া, রাগের আবির্ভাব-তিরোভাব ঘটিয়ে এই আলাপের মধ্যে বৈচিত্র্য প্রদর্শন করা হত। এতে বিকশিত হত রাগের সম্পূর্ণ রূপটি।

স্বস্থান নিয়ম॥ আজকাল যেমন শিল্পীরা নিজেদের ইচ্ছে মত স্থান থেকে রাগ সঙ্গীত শুরু ও শেষ করে থাকেন, আগের দিনে সেরূপ করা অমার্জনীয় ছিল। আলাপের সময়ও একটি বিশেষ ক্রম অনুসরণ করতে হত। স্বস্থান নিয়মের আলাপের জন্য চারটি বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট থাকত। সেই চারটির নাম ছিল স্থায়ী, দ্বয়র্দ্ধ, দ্বিগুণ ও অর্দ্ধস্থিত স্বর। এই ভাবে নিজ নিজ নির্দিষ্ট স্থান থেকে আলাপ আরম্ভ করা হত বলে এই আলাপকে বলা হত স্বস্থান নিয়মের আলাপ।

আগের দিনে **স্থায়ী স্বর** বলা হ'ত অংশ (বাদী) স্বরকে। সব রাগকেই অনেকখানি নির্ভর করতে হত এই স্থায়ী স্বরের ওপর এবং এই স্বর থেকেই আলাপ আরম্ভ করা হত।

স্থায়ী স্বরের পরবর্তী চতুর্থ স্বর হল **দ্বয়র্দ্ধ স্বর**। স্থায়ী স্বরকে যদি বাদী স্বরের সঙ্গে তুলনা করা হয় তবে দ্বয়র্দ্ধ হবে সম্বাদী স্বর। বর্তমানের বাদী-সম্বাদী যেমন ষড়্জ-মধ্যম বা ষড়্জ-পঞ্চম ভাবযুক্ত হয়ে থাকে, তেমনি স্থায়ী ও দ্বয়র্দ্ধের মধ্যে ব্যবধান ছিল ষড়্জ-মধ্যম ভাবযুক্ত। অর্থাৎ সা, রে, গ ও ম যদি স্থায়ী স্বর হয় তাহলে ম, প, ধ ও নি যথাক্রমে হবে দ্বয়র্দ্ধ স্বর।

দ্বিগুণ স্বর ছিল স্থায়ী স্বরের পরবর্তী অষ্টম স্থানে। যেমন মনে করুন মধ্য সপ্তকের সা যদি হয় স্থায়ী, তাহলে দ্বয়র্দ্ধ হবে ম এবং দ্বিগুণ হবে তার-সপ্তকের সা। এইভাবে মধ্য-সপ্তকের যে স্বরটি স্থায়ী স্বর হবে, তার-সপ্তকের সেই স্বরটিই হবে দ্বিগুণ স্বর। অর্থাৎ স্থায়ী ও দ্বিগুণ স্বর একই—তফাৎ শুধু স্থানের।

অর্দ্ধস্থিত স্বর হল সেইগুলি, যেগুলি দ্বয়র্দ্ধ ও দ্বিগুণ স্বরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। যেমন, ম যদি দ্বয়র্দ্ধ হয় আর তার-সা হয় দ্বিগুণ স্বর, তাহলে প, ধ ও নি স্বরগুলি হবে অর্দ্ধস্থিত স্বর।

এখন দেখুন, কী নিয়মে স্বস্থান আলাপ করা হত।—

প্রথমে আলাপ শুরু করা হত মন্দ্র-সপ্তক থেকে। মন্দ্র থেকে আরম্ভ করে দ্বয়র্দ্ধ স্বরের আগের স্বর পর্যন্ত (ম যদি দ্বয়র্দ্ধ হয়, তাহলে গ পর্যন্ত) এই প্রথম ভাগের আলাপ সীমিত থাকত। এর মধ্যে স্থায়ী স্বরকে খুব ভালো ভাবে দেখানো হত। মন্দ্র সপ্তকে শিল্পী নিজের ইচ্ছামত বিস্তার করতে পারতেন।

এইখানে আরেকটু বোঝা দরকার। মনে করুন, কোন রাগের স্থায়ী স্বর সপ্তকের উত্তরাঙ্গে এবং দ্বয়র্দ্ধ স্বর পূর্বাঙ্গে অবস্থিত, সে অবস্থায় কী ভাবে আলাপ শুরু করা হত? এ ক্ষেত্রেও প্রথমে দ্বয়র্দ্ধ স্বরের আগের স্বর পর্যন্তই আলাপকে সীমিত রাখতে হত।

যেমন ধরুন, কোন রাগে ধ হল স্থায়ী স্বর, গ হল দ্বয়র্দ্ধ এবং অন্য সপ্তকের ধ স্বরটিই হবে দ্বিগুণ স্বর, কেমন? এক্ষেত্রে মন্দ্র সপ্তক থেকে আলাপ আরম্ভ করে (মন্দ্র সপ্তকের ধ হবে দ্বিগুণ বা স্থায়ী স্বর) মধ্য রে পর্যন্ত আলাপ করতে হবে।

তারপর—মানে দ্বিতীয় ভাগের আলাপ—সীমাবদ্ধ থাকবে দ্বয়র্দ্ধ স্বর পর্যন্ত।

তৃতীয় ভাগের আলাপে নেওয়া হত অর্দ্ধস্থিত স্বরগুলি। স্থায়ী ও দ্বয়র্দ্ধ স্বরের আলাপ করার পর, মধ্য ও তার সপ্তকের স্বরগুলির সমন্বয়ে অর্দ্ধস্থিত স্বরগুলিকে সুন্দর ভাবে বিন্যাস করা হত এই ভাগে। প্রত্যেকবারই নতুন নতুন স্বর সমষ্টি দ্বারা অর্দ্ধস্থিত স্বরগুলিকে দেখান হত মনোজ্ঞ করে।

দ্বিগুণ স্বরের প্রয়োগ করা হত চতুর্থ ভাগে। তার সপ্তকের আলাপেও সেই আগের নিয়ম—মানে প্রথম ভাগে যেমন স্থায়ী স্বরকে দেখানো হত, সেই নিয়ম এখানেও অনুসরণ করা হত। আর এই ভাগের আলাপ শেষ করা হত স্থায়ী স্বরের ওপর ন্যাস করে। মনে রাখতে হবে যে এই নিয়মগুলির পালন সেকালে বাধ্যতামূলক ছিল।

॥ আধুনিক আলাপ গায়নের বিধি ॥

প্রাচীন কালে যে পদ্ধতিতে আলাপ গাওয়া হত, বলাই বাহুল্য, বর্তমানে আর সেভাবে আলাপচারী করা হয় না। আপনাদের বোধহয় মনে আছে যে, এর আগে আলাপ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হয়েছিল (পূর্ব ভাগ দ্রষ্টব্য)। এখন সে সম্বন্ধে আরো কিছু নতুন তথ্য আপনাদের জানানো হচ্ছে।—

আধুনিক কালের এই আলাপই হল একালের অনিবদ্ধ গান।

আগে বলেছিলাম যে আজকাল দু' রকম ভাবে আলাপ করা হয়—আ-কার ও নোম-তোম বাণী দিয়ে। আ-কারের চাইতে নোম-তোমের আলাপ বেশি শ্রুতিমধুর হয়। নোম-তোমের আলাপ মানে হল, নোম তোম দ তা রী রে নে প্রভৃতি বাণী দ্বারা আলাপ করা। গুরুজনেরা বলেন, আগের দিনে গায়কেরা গান আরম্ভ করার পূর্বে "ওঁ অনন্ত নারায়ণ হরি" বা "তু হী অনন্ত হরি"—ইত্যাদি বলে আলাপের মাধ্যমে ভগবানকে স্মরণ করতেন। বর্তমানের নোম-তোম ইত্যাদি শব্দগুলি তারই অপভ্রংশ মাত্র।

সেকালের গায়কেরা শুধুই গান-বাজনা করতেন না। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি সম্বন্ধেও তাঁদের গভীর জ্ঞান থাকত। তার প্রমাণ পাওয়া যায় সেকালের

গায়কদের রচিত গানগুলি এবং সঙ্গীত-শাস্ত্রালোচনা থেকে। তাঁরা ধার্মিক ও ভক্তিপরায়ণও ছিলেন। তাই গানের প্রারম্ভে তাঁরা ভগবানের প্রার্থনা করতেন আলাপ গানের দ্বারা। পরবর্তীকালে—বিশেষ করে মুসলমান আমলে—আলাপ গানের রীতিটাকেই শুধু বজায় রাখা হল কিন্তু জ্ঞানবুদ্ধির অল্পতার জন্য অথবা অন্য কারণে ঐ শব্দগুলির মধ্যে এলো এক অদ্ভুত পরিবর্তন। "ওম্ অনন্ত হরি নারায়ণ" কোন মতে টিঁকে রইলেন "তোম নেতে তেরী রী রে ন"-র মধ্যে। হাসবেন না, বর্তমানেও অনেক ভাষানভিজ্ঞ গায়ককে এই ভাবে ভাষার আত্মশ্রাদ্ধ করতে দেখা যায়।

স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ—এই চার ভাগে এবং বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত লয়ে আলাপ গাওয়া হত। কী নিয়মে এই ভাগগুলি বিভিন্ন লয়ে পরিবেশিত হত শুনুন।—

প্রথমে যখন স্থায়ী ভাগের আলাপ আরম্ভ করা হয়, তখন তা করা হয় মধ্য সপ্তকের সা থেকে। খুব ভালো ভাবে সা-কে দেখানোর পর ক্রমশঃ রাগের বাদী, সম্বাদী ও ন্যাস স্বরগুলির সাহায্যে মন্দ্র, মধ্য ও তার সপ্তকের মধ্য দিয়ে এই আলাপ এগিয়ে যায় মধ্য-নিষাদ বা তার-ষড়্জ পর্যন্ত। এইভাবে এগুবার সময় নতুন নতুন স্বরের সাহায্যে রাগবাচক যে নতুন স্বর সমষ্টির সমন্বয় করা হয়, তার দ্বারা প্রাচীন রাগের মধ্যে এক নবীন সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। ধীর মন্থর গতিতে চলে এই ভাগের আলাপ। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণ্ স্বরের স্পর্শ নিয়ে মীড় প্রধান এই আলাপের দ্বারা রাগের যথাযোগ্য গাম্ভীর্য বজায় রাখা হয়। খট্‌কা, মুরকী ইত্যাদির প্রয়োগ এতে করা হয় না। মধ্য-নি বা তার-সা পর্যন্ত এগিয়ে আলাপ শেষ করা হয় মধ্য-ষড়্জে। প্রধানতঃ পূর্বাঙ্গেই এই আলাপ সীমাবদ্ধ থাকে।

দ্বিতীয় ভাগ হল অন্তরা। এই ভাগ আরম্ভ করা হয় মধ্য গ, ম বা প থেকে এবং শেষ করা হয় তার ষড়্জে। রাগবাচক স্বর সমষ্টি নানা ভাবে দেখিয়ে কখনো তার-সা, কখনো মধ্য-সা, আবার কখনো বা মধ্য সপ্তকের অন্যান্য ন্যাস স্বরগুলির ওপর গিয়ে দাঁড়ান হয়। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অন্তরার আলাপ শেষ করা হয় মধ্য ষড়্জের ওপর। এই ভাগের আলাপ সীমাবদ্ধ থাকে উত্তরাঙ্গের মধ্যে। স্থায়ীর চাইতে এই ভাগের লয়ও কিছুটা বাড়িয়ে মধ্য গতির করা হয়।

সঞ্চারী ভাগের আলাপকে স্থায়ী ভাগেরই একটি নবীন রূপ বলা যেতে

পারে। এই ভাগের সীমাও মন্দ্র ও মধ্য সপ্তকের মধ্যেই আবদ্ধ। অবশ্য তার-সা পর্যন্তও এগুনো চলে। কিন্তু শেষ করা হয় মধ্য সা-তে। স্থায়ী ভাগের সঙ্গে এর আরেকটু তফাৎ এই যে এতে লয়ের গতি দ্রুত করা হয় এবং গমক, দানাদার কাজ ইত্যাদি বেশি প্রদর্শিত হয়।

আভোগ হল শেষ ভাগ। সঞ্চারীর পর স্থায়ীতে না ফিরে আলাপ সোজা গিয়ে উপস্থিত হয় আভোগে। স্থায়ীর নবীন রূপ যেমন সঞ্চারী, তেমনি অন্তরার নবীন রূপ হল আভোগ। এই আলাপে তার সপ্তকের যতখানি ইচ্ছে ওপরে ওঠার স্বাধীনতা শিল্পীর থাকে। লয় আরও দ্রুততর হয়।

রাগালাপ প্রসঙ্গে এবং রাগের লক্ষণ সম্বন্ধে বলার সময় যে দশটি নিয়মের (গ্রহ, অংশ, ন্যাস, অপন্যাস, অল্পত্ব, বহুত্ব, সংন্যাস, বিন্যাস, মন্দ্র ও তার) কথা উল্লেখ করা হয়েছিল, তার মধ্যে প্রথম চারটির বিষয় আগেই বলা হয়ে গেচে (পূর্বভাগ দ্রষ্টব্য)। এখন বাকী ছয়টির সংজ্ঞা দেওয়া হচ্ছে।

॥ অল্পত্ব ও বহুত্ব ॥

রাগালাপ প্রসঙ্গে অল্পত্ব ও বহুত্বের উল্লেখ করা হয়েছিল। অল্পত্ব মানে হল কম এবং বহুত্ব মানে বেশি। যে স্বরগুলি দিয়ে রাগ রচনা করা হয়, গাইবার বা বাজাবার সময় সেই স্বরগুলির মধ্যে সব স্বরই সমান ওজনে প্রয়োগ করা হয় না। কোন কোন স্বর কম লাগে, কোন কোন স্বর বেশি প্রয়োগ করা হয়। তাই, যখন কোন স্বর কোন রাগে অল্প পরিমাণে ব্যবহার করা হয় তখন তাকে বলা হয় অল্পত্ব। আর তার বিপরীত হলেই—মানে বহুল পরিমাণে কোন স্বরের প্রয়োগ হলে—তাকে বলা হয় বহুত্ব। বিশেষ করে আলাপ ও বিস্তারের সময় এই অল্পত্ব-বহুত্বের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

অল্পত্ব-বহুত্ব আবার ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে দেখানো হয়। এই প্রকারগুলিকে বলা হয় লঙ্ঘনমূলক অল্পত্ব ও অনভ্যাসমূলক অল্পত্ব তথা অলঙ্ঘনমূলক বহুত্ব ও অভ্যাসমূলক বহুত্ব।—

লঙ্ঘনমূলক অল্পত্ব ॥ লঙ্ঘন মানে হল অতিক্রম করা—ডিঙিয়ে যাওয়া। গান-বাজনার সময় যখন রাগের কোন স্বরকে অতিক্রম করে বা এড়িয়ে যাওয়া হয়, তখন তাকে বলা হয় লঙ্ঘনমূলক অল্পত্ব।

এখানে শিক্ষার্থীদের মনে রাখতে হবে যে, যে-স্বরটি রাগে একেবারে বর্জিত থাকে, সেই স্বরকে কিন্তু লঙ্ঘনমূলক অল্পত্বের সংজ্ঞা দেওয়া যাবে না। যেমন ভূপালী বা দেশকারের মধ্যম ও নিষাদ। তার কারণ, যে স্বর রাগে আদৌ ব্যবহার করা হয় না, তাকে লঙ্ঘন করার কথাই ওঠে না। যা আছে তাকেই লঙ্ঘন করা যায়, যা নেই তাকে আবার লঙ্ঘন করা কি? এক্ষেত্রে আসাবরীর নিষাদকে লঙ্ঘনমূলক অল্পত্ব বলা চলে। কারণ, আসাবরীতে নি ব্যবহৃত হয়, কিন্তু আরোহের সময় তাকে লঙ্ঘন করা হয়—ব্যবহার করা হয় না এবং অবরোহে লাগালেও সে দুর্বলই থাকে। কিন্তু গান্ধারকে লঙ্ঘনমূলক অল্পত্ব বলা যায় না। কারণ, আরোহে লঙ্ঘিত হলেও এখানে তার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে—সে এই রাগের সম্বাদী স্বর।

আরেকটি উদাহরণ দেখুন।—

মনে করুন কামোদ-এর গ। কামোদে এই স্বরটি বর্জিত নয়—বক্রভাবে প্রয়োগ করা হয় (এর জাতি বক্র-সম্পূর্ণ)। কিন্তু আরোহে একে লঙ্ঘন করা হয় কিংবা বক্রভাগে লাগলেও তা দুর্বল ভাবেই লাগে। আবার অবরোহে সোজাসুজি ভাবে লাগালেও তা দুর্বলই থাকে। কাজেই গান্ধারকে এই রাগের আরোহে লঙ্ঘনমূলক অল্পত্ব বলা হবে।

অনভ্যাসমূলক অল্পত্ব॥ কোন বিষয় বা বস্তুকে নিয়মিত ভাবে বারম্বার উচ্চারণ বা ব্যবহার করাকে বলা হয় অভ্যাস এবং সেরূপ না করাকে বলা হয় অনভ্যাস। এখানেও তাই। যে স্বর রাগে ব্যবহৃত হলেও কম প্রযুক্ত হয়, তাকেই অনভ্যাস অল্পত্বের সংজ্ঞা দেওয়া হয়। এই স্বর বারবার প্রয়োগ করাও হয় না বা ন্যাস স্বর হিসেবেও ব্যবহার করা চলে না। যেমন বেহাগের রে ও ধ, ভীমপলশ্রীর রে ও ধ কিম্বা হম্বীরের নি।

বিবাদী স্বরের প্রয়োগও এই অনভ্যাসমূলক অল্পত্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

এবার অলঙ্ঘনমূলক বহুত্ব ও অভ্যাসমূলক বহুত্বের ব্যাপারটা বোঝা যাক।

অলঙ্ঘনমূলক বহুত্ব॥ লঙ্ঘন মানে যেমন ডিঙানো বা এড়ানো,—উপেক্ষা করাও বলতে পারেন, অলঙ্ঘন হল ঠিক তার বিপরীত। মানে যাকে ডিঙিয়ে বা এড়িয়ে যাওয়া যায় না, কিম্বা উপেক্ষাও করা চলে না। তাই যে স্বরকে রাগের আরোহ বা অবরোহে কোন মতেই লঙ্ঘন করে এড়িয়ে যাওয়া যায় না—অথচ তার ওপর ন্যাস-ও করা যায় না (মানে বেশিক্ষণ দাঁড়ানো যায় না) তাকে বলা হয় অলঙ্ঘন দ্বারা বহুত্ব। উদাহরণ

স্বরূপ কালিংড়ার মধ্যম বা ইমনের তীব্র মধ্যমকে হাজির করা যেতে পারে। এই দুই রাগে মধ্যমের বহুত্ব আছে। মধ্যমকে আরোহ বা অবরোহ—কোন সময়েই আপনি লঙ্ঘন করতে পারবেন না, তাহলে অন্য রাগের ছায়া আসবে। অথচ এই স্বরের ওপর ন্যাস করা যায় না।

অভ্যাসমূলক বহুত্ব॥ যে স্বরের প্রয়োগ বারবার করা হয় এবং রাগের প্রকৃতিকে সুপরিস্ফুট ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য যে স্বরকে অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা ও ন্যাস করা হয়, তাকেই বলা হয় অভ্যাসমূলক বহুত্ব। বলতে পারেন তাহলে বাদী সম্বাদী স্বরকেও তো অভ্যাসমূলক বহুত্ব বলা চলে! ঠিকই। বাদী সম্বাদী স্বরকেও অভ্যাসমূলক বহুত্ব বলতে পারেন কিন্তু এদুটি ছাড়াও এমন স্বর রাগে পাওয়া যায় যার প্রয়োগ বারবার করা হয় এবং তার ওপর দাঁড়ানো যায়। কাজেই বাদী সম্বাদীকেও যেমন, অন্য স্বরকেও তেমনি অভ্যাসমূলক বহুত্ব বলা হবে। যেমন হমীর (বা হম্বীর) রাগের ধ। এটি বাদী এবং অভ্যাসমূলক ভাবে বেশি প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু বাগেশ্রীর ধ ও পরজের নি তো বাদী স্বর নয়! তবু তাকে অভ্যাসমূলক বহুত্বের সংজ্ঞা দেওয়া হয়।

॥ সংন্যাস ও বিন্যাস ॥

অপন্যাসেরই দুটি প্রকারকে বলা হয় সংন্যাস ও বিন্যাস। প্রাচীনকালে গান-বাজনার সময় যে স্বরের ওপর রাগ শেষ করা হত সেই স্বরকে যেমন বলা হত ন্যাস (বর্তমানে যে অন্য অর্থে ন্যাস শব্দটি ব্যবহৃত হয় তা আগেই বলা হয়ে গেচে) তেমনি যে স্বরের ওপর রাগের প্রতিটি বিভাগ শেষ করা হত, সেই স্বরকে বলা হত অপন্যাস স্বর। সংন্যাস ও বিন্যাস হল এই অপন্যাস স্বরেরই দুটি পৃথক প্রকার।

সংন্যাস॥ যে স্বরের ওপর গানের প্রথম ভাগটি বা প্রথম ভাগের চরণগুলি শেষ করা হত, তাকে বলা হত সংন্যাস স্বর। যেমন মনে করুন গানের প্রথম ভাগ হল স্থায়ী। স্থায়ী ভাগে হয়ত চারটি চরণ (line) আছে। এই চরণগুলিকে উপবিভাগও বলা যেতে পারে। প্রতিটি চরণ বা স্থায়ী ভাগের শেষ চরণ যে স্বরের ওপর শেষ করা হবে, সেই স্বরটিই হল সংন্যাস স্বর।

বিন্যাস ॥ গানের প্রতিটি বিভাগের (স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ) প্রথম চরণটি যে স্বরের ওপর শেষ করা হত সেই স্বরটিকে বলা হত বিন্যাস স্বর।

॥ মন্দ্র ও তার ॥

রাগ পরিবেশন কালে তাকে মন্দ্র বা তার সপ্তকে নিয়ে যাওয়ার সময় মন্দ্র ও তার স্থানের যে স্বর পর্যন্ত রাগকে নিয়ে যাওয়া হত, সেই স্বরকে নিশ্চিত করা হত মন্দ্র ও তার নাম দিয়ে। প্রাচীন কালে মন্দ্র ও তার স্থানে ব্যবহৃত ও অব্যবহৃত স্বরের প্রয়োগ সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া থাকত।

॥ আবির্ভাব ও তিরোভাব ॥

আলপ্তি গানের প্রসঙ্গে আপনারা রাগের আবির্ভাব ও তিরোভাব নামে দুটি নতুন শব্দ পেয়েছিলেন।—বলা হয়েছিল, এই ক্রিয়া দ্বারা রাগে বৈচিত্র্য সম্পাদন করা হয়। সেই ক্রিয়াটি কি, তা এইবার বলচি।—

আপনারা ক্রিয়াত্মক সঙ্গীত শিক্ষা করার সময় দেখেচেন যে, একটি রাগের কোন অংশের স্বর সমষ্টি অন্য আরেকটি রাগের কোন অংশের স্বর সমষ্টির সঙ্গে প্রায় একই রকম মিলে যায়। যেমন মনে করুন, ম প নি র্স ণি ধ প ম গ রে। এই স্বর সমষ্টি দেশ ও জয়জয়ন্তী উভয় রাগেই প্রযুক্ত হয়। কাজেই জয়জয়ন্তী গাইবার বা বাজাবার সময় যখন আপনি উক্ত স্বর সমষ্টির প্রয়োগ করবেন তখন সাময়িক ভাবে মনে হবে ওটি দেশ রাগ। কিন্তু ঐ স্বর সমষ্টির সঙ্গে যেই আপনি রে জ্ঞ রে সা ধ্ নি্ রে—এই স্বর সমষ্টি যুক্ত করবেন অমনি জয়জয়ন্তীর আসল রূপটি পরিস্ফুট হয়ে উঠবে সকলের সামনে। এই ভাবে অল্প কিছুক্ষণের জন্য মূল রাগকে প্রচ্ছন্ন রেখে অন্য একটি রাগের ছায়াপাত ঘটিয়ে যখন রাগের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়, সেই ক্রিয়াকে বলা হয় আবির্ভাব-তিরোভাব।

সাহিত্য, নাটক, সিনেমা ইত্যাদিতেও এই ভাবে পাঠক ও দর্শককে কিছুক্ষণের জন্য সন্দেহের দোলায় দোলায়িত করে রাখার কৌশল অবলম্বন করা হয়। যিনি যত নৈপুণ্যের সঙ্গে এই ক্রিয়াটি কাজে লাগাতে পারেন, তাঁর মুন্সিয়ানা ততখানি স্বীকৃতি পায়—তিনি তত বেশি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

অপরাধমূলক (crime) উপন্যাস, নাটক, চলচ্চিত্র প্রভৃতিতে এই 'সাস্‌পেন্স' অপরিহার্য। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও শ্রোতাদের মনে এই ভাবে কিছুক্ষণের জন্য বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেন শিল্পীরা—রাগের আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিয়ে। এতে শিল্পী ও শ্রোতা—উভয়েই খুব আনন্দ পান। কিন্তু এই ক্রিয়াটি খুব মুন্সিয়ানার সঙ্গে করতে হয়।

বিভিন্ন রাগ—বিশেষ করে সমপ্রকৃতির রাগগুলির ওপর বিশেষ দখল না থাকলে, রাগকে নিয়ে এরূপ খেলা করা যায় না—রাগ ভ্রষ্ট হয়ে যাবার ভয় থাকে। এই ক্রিয়ারও পরিমিতি আছে যা অতিক্রম করলেই রসহানি ঘটে। এই ব্যাপারে স্বভাবতই আমার শ্রদ্ধেয় গুরুদেব ভারত বিখ্যাত শিল্পী শ্রীযুক্ত ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের নাম মনে আসে। তিনি একটি রাগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্বরের প্রয়োগে ভিন্ন ভিন্ন রাগের ছায়াপাত ঘটিয়ে যে রসসৃষ্টি করেন, এবং এমন চাতুর্যের সঙ্গে মূল রাগে ফিরে আসেন—যা শ্রোতৃবৃন্দের মনে এক অপূর্ব শিহরণ জাগায়। কিন্তু এই ব্যাপারগুলির সূক্ষ্ম রস উপভোগ করতে হলে শ্রোতাদেরও সঙ্গীতে কিছু জ্ঞান থাকা দরকার। তা না হলে রসের উন্নত স্তরের নাগাল পাওয়া শক্ত।...

এখন বুঝুন, কোনটিকে আবির্ভাব এবং কোনটিকে তিরোভাব বলা হয়।

জয়জয়ন্তীতে যখন দেশ রাগের ছায়াপাত হবে তখন সেই ক্রিয়াকে বলা হবে তিরোভাব। কারণ মূল রাগের তিরোভাব ঘটিয়ে অন্য রাগকে সেখানে আনা হয়েচে। তিরোভাব মানে হল অদৃশ্য হওয়া। আবার যখন দেশ রাগের স্বর সমষ্টির সঙ্গে জয়জয়ন্তীর রাগবাচক স্বর সমষ্টি প্রয়োগ করে মূল রাগে ফিরে আসা হয়, তখন তাকে বলা হয় আবির্ভাব। কারণ মূল রাগ তখন প্রকাশিত হয়েচে। আবির্ভাব মানে হল প্রকাশিত হওয়া।

ঠিক এই ভাবে যে কোন সমপ্রকৃতির রাগের মধ্যেই আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটানো যায়। আজকাল খেয়াল ও ঠুমরীতেই বেশীর ভাগ এই বিষয়টির প্রয়োগ হয়ে থাকে।

এই ক্রিয়াটি আপনার গুরুদেবের কাছ থেকে আরো প্রত্যক্ষ ভাবে জেনে নেবেন। পৃষ্ঠান্তরে—রাগ-পরিচিতি অধ্যায়ে—এর অনেকগুলি ক্রিয়াত্মক প্রয়োগ দেখানো হয়েচে।
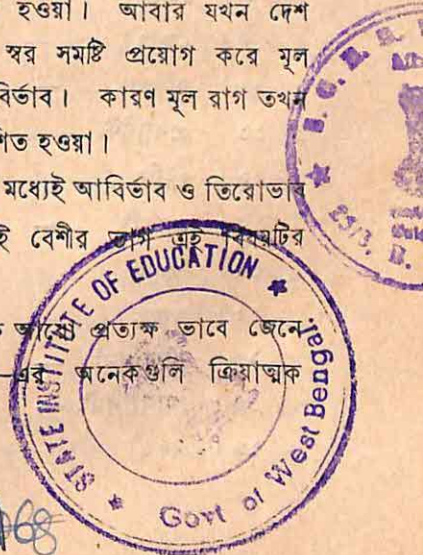
॥ গ্রাম ও মূর্চ্ছনা ॥

গ্রাম ॥ প্রাচীন সঙ্গীতে, বাইশটি শ্রুতির ওপর সাতটি শুদ্ধ স্বরকে স্থাপিত করে সেই সাত স্বরের ক্রমিক সমষ্টিকে বলা হত গ্রাম। সঙ্গীত পারিজাত গ্রন্থে তিনটি গ্রামের উল্লেখ আছে—ষড়্জ গ্রাম, মধ্যম গ্রাম ও গান্ধার গ্রাম। কিন্তু প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রে শুধু ষড়্জ ও মধ্যম গ্রামের উল্লেখ আছে; গান্ধার গ্রামের কোন উল্লেখ সেখানে নেই। আবার ভরতের পুত্র দত্তিলকৃত "দত্তিলম্" গ্রন্থে গান্ধার গ্রামের উল্লেখ দেখা যায়।···কি ভাবে স্বর স্থাপনা করে গ্রাম তিনটি রচিত হয়েছিল দেখুন।—

॥ গ্রামভেদে শ্রুতি ও স্বরের বিভক্তিকরণ ॥

শ্রুতির নাম	ষড়্জ গ্রাম		মধ্যম গ্রাম		গান্ধার গ্রাম	
১। তীব্রা	—	—	—	—	—	নি
২। কুমুদ্বতী						
৩। মন্দা						
৪। ছন্দোবতী	—	সা	—	সা	—	সা
৫। দয়াবতী						
৬। রঞ্জনী	—	—	—	—	—	রে
৭। রক্তিকা	—	রে	—	রে	—	—
৮। রৌদ্রী						
৯। ক্রোধী	—	গ	—	গ	—	—
১০। বজ্রিকা	—	—	—	—	—	গ
১১। প্রসারিণী						
১২। প্রীতি						
১৩। মার্জনী	—	ম	—	ম	—	ম
১৪। ক্ষিতি						
১৫। রক্তা						
১৬। সন্দিপিনী	—	—	—	প	—	প
১৭। আলাপিনী	—	প	—	—	—	—
১৮। মদন্তী						

শ্রুতির নাম	ষড়্জ গ্রাম		মধ্যম গ্রাম		গান্ধার গ্রাম	
১৯। রোহিনী	—	—	—	—	—	ধ
২০। রম্যা	—	ধ	—	ধ	—	—
২১। উগ্রা						
২২। ক্ষোভিনী	—	নি	—	নি	—	—

উপরোক্ত ভাবে বাইশটি শ্রুতির ওপর সাতটি শুদ্ধ স্বরকে স্থাপিত করে তিনটি ভিন্ন গ্রাম তৈরী করা হয়েচে।

ষড়্জ ও মধ্যম গ্রামের মধ্যে তফাৎ শুধু পঞ্চমের স্থান নিয়ে। ষড়্জ গ্রামের পঞ্চমকে রাখা হয়েছে ১৭ সংখ্যক শ্রুতির (আলাপিনী) ওপর আর মধ্যম গ্রামের পঞ্চম বসেছে ১৬ সংখ্যক শ্রুতির (সন্দিপিনী) ওপর। তাছাড়া আর কোন তফাৎ নেই। কিন্তু গান্ধার গ্রামস্থ স্বরের অবস্থান উক্ত দুই গ্রামের একেবারে বিপরীত। গান্ধার গ্রামের ষড়্জ ও মধ্যম স্বর দুটির অবস্থানই শুধু আগের গ্রাম দুটির সঙ্গে মেলে। অর্থাৎ তিনটি গ্রামেরই ষড়্জ স্বরটি স্থাপিত হয়েছে ৪ সংখ্যক (ছন্দোবতী) শ্রুতির ওপর এবং মধ্যম স্থাপিত হয়েছে ১৩ সংখ্যক (মার্জনী) শ্রুতির ওপর।

এই তিনটি গ্রামের নাম ষড়্জ, মধ্যম ও গান্ধার রাখার তাৎপর্য সম্বন্ধে বলা হয় যে, প্রত্যেকটি গ্রাম আরম্ভ করা হত যথাক্রমে ষড়্জ, মধ্যম ও গান্ধার স্বর থেকে।

কিন্তু গান্ধার গ্রামের ক্ষেত্রে এই নিয়ম সম্বন্ধে বিলক্ষণ মতভেদ আছে। আগেই বলেচি, নাট্যশাস্ত্রে এই গ্রামের কোন উল্লেখ নেই। পণ্ডিতেরা মনে করেন, গন্ধর্বেরা এই গ্রামে গাইতেন এবং এটি আরম্ভ করা হ'ত নিষাদ থেকে। সেই হিসেবে একে নিষাদ গ্রামই বলা উচিত। কিন্তু যেহেতু শুধু গন্ধর্বদের মধ্যে এই গ্রাম প্রচলিত ছিল সেই হেতু আগে একে গান্ধর্ব গ্রাম বলা হত। পরবর্তীকালের গান্ধার শব্দটি নাকি সেই গন্ধর্বেরই অপভ্রংশ।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে লক্ষ্য করার মত। আমরা অনেক আগে শ্রুতি ও স্বরের বিভক্তিকরণ সম্বন্ধে আলোচনা করার সময়ে জেনেছিলাম যে, সা, ম ও প স্বরের চারটি, রে ও ধ স্বরের তিনটি এবং গ ও নি স্বরের দুটি করে শ্রুতি ধরা হয়। এই নিয়মটি প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসচে। এই বহু প্রচলিত মতটি "সঙ্গীত রত্নাকর" গ্রন্থেও আছে। কিন্তু এখানে—গ্রামের

ব্যাপারে তার কিছু ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। একটু মন দিয়ে দেখলেই ব্যাপারটা আপনাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে।

ষড়্‌জ গ্রামে যে ভাবে শ্রুতির ওপর স্বর বসান হয়েচে, সেই নিয়মটি "রত্নাকর"-এর বহু প্রচলিত "চতুশ্চতুশ্চতুশ্চৈব ষড়্‌জমধ্যমপঞ্চমাঃ। দ্বৈ দ্বৈ নিষাদগান্ধারৌ ত্রিস্ত্রীঋষভধৈবতৌ॥"—নিয়মের সঙ্গে মিললেও মধ্যম গ্রামের সঙ্গে তার অমিল দেখা যায় পঞ্চম ও ধৈবত স্বর স্থাপনার ক্ষেত্রে। মধ্যম গ্রামে দেখান হয়েচে পঞ্চম স্বরের ৩টি ও ধৈবতের ৪টি শ্রুতি।

॥ বিভিন্ন সময়ে তথা বিভিন্ন গ্রামের প্রতিটি স্বরের শ্রুতি-সংখ্যা ॥

স্বরের নাম	প্রাচীন, মধ্য ও বর্তমান কাল	ষড়্‌জ গ্রাম	মধ্যম গ্রাম	গান্ধার গ্রাম
সা—	৪ শ্রুতি	৪ শ্রুতি	৪ শ্রুতি	৩ শ্রুতি
রে—	৩ "	৩ "	৩ "	২ "
গ—	২ "	২ "	২ "	৪ "
ম—	৪ "	৪ "	৪ "	৩ "
প—	৪ "	৪ "	৩ "	৩ "
ধ—	৩ "	৩ "	৪ "	৩ "
নি—	২ "	২ "	২ "	৪ "

আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন, মধ্যম গ্রাম যদি মধ্যম স্বর থেকে আরম্ভ করার নিয়ম থাকে, তাহলে তো মধ্যমকে সা ধরে নিয়ে গাওয়া হত! সেই হিসেবে স্বরগুলির শ্রুতি-সংখ্যা কি প্রাচীন মতের সঙ্গে মিলবে? প্রশ্নটি খুবই চমৎকার। এখন আসুন, হিসেব করে দেখা যাক—সেভাবে মিল হয় কি না!

মনে করুন, মধ্যম গ্রামের মধ্যমকে সা করে নিলাম। তাহলে সা হল ৪ শ্রুতি। পঞ্চমকে রে ধরলে, রে হবে ৩ শ্রুতি; ধৈবতকে গ ধরলে, গ হবে ৪ শ্রুতি; নিষাদকে ম ধরলে, ম হবে ২ শ্রুতি; ষড়্‌জ হয়ে যাবে এবার প, তাহলে প হবে ৪ শ্রুতি; ঋষভ হবে ধ, তাহলে ধ হবে ৩ শ্রুতি এবং গান্ধারকে নি ধরলে, নি হবে ২ শ্রুতি।

তাহলে আগের নিয়ম অনুযায়ী এখানে সা ও প-এর সঙ্গে মিল আছে; রে ও ধ-এর সঙ্গে মিল আছে এবং নি-এর সঙ্গেও কোন অমিল নেই কিন্তু ম ও

গ-এর শ্রুতি সংখ্যার সঙ্গে মিল কোথায়? গান্ধার গ্রামের সঙ্গেও এমনি অমিল দেখা যায়।

তাহলে দেখা যাচ্চে, শুধু ষড়্‌জ গ্রামের সঙ্গেই বর্তমান সময়ের শ্রুতি-সংখ্যার মিল আছে, অন্য গ্রামের প্রচলন বর্তমানে একেবারেই লুপ্ত হয়ে গেচে এবং বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রাচীন অনেক কিছুকেই বুঝতে গেলে বিলক্ষণ গোলমালে পড়তে হবে।

মূর্চ্ছনা ॥ গ্রামস্থ সাতটি স্বরের আরোহ-অবরোহের ক্রমকে বলা হয় মূর্চ্ছনা। প্রতি গ্রাম থেকে সাতটি করে মূর্চ্ছনা হতে পারে। কেননা, প্রতি গ্রামে সাতটি করে স্বর আছে। এই সাতটি স্বরের এক-একটি স্বর থেকে যদি প্রত্যেকবার ক্রমানুসারে আরোহ-অবরোহ করা হয়, তাহলেই সাতটি মূর্চ্ছনা তৈরী হবে। সেই হিসেবে তিনটি গ্রাম থেকে হয় মোট একুশটি মূর্চ্ছনা। কী নিয়মে একটি গ্রাম থেকে সাতটি মূর্চ্ছনা তৈরী হয়েচে দেখা যাক।

ষড়্‌জ গ্রামের মূর্চ্ছনা ॥ এই গ্রামের প্রথম মূর্চ্ছনা শুরু হয় মধ্য স্থানের (সপ্তকের) সা থেকে। তারপর ক্রমশ মন্দ্র নি, মন্দ্র ধ, মন্দ্র প, মন্দ্র ম, মন্দ্র গ ও মন্দ্র রে থেকে পরবর্তী মূর্চ্ছনাগুলি রচিত হবে। যেমন—

(১) সা রে গ ম প ধ নি | নি ধ প ম গ রে সা

(২) নি্ সা রে গ ম প ধ | ধ প ম গ রে সা নি্

(৩) ধ্ নি্ সা রে গ ম প | প ম গ রে সা নি্ ধ্

(৪) প্ ধ্ নি্ সা রে গ ম | ম গ রে সা নি্ ধ্ প্

(৫) ম্ প্ ধ্ নি্ সা রে গ | গ রে সা নি্ ধ্ প্ ম্

(৬) গ্ ম্ প্ ধ্ নি্ সা রে | রে সা নি্ ধ্ প্ ম্ গ্

(৭) রে্ গ্ ম্ প্ ধ্ নি্ সা | সা নি্ ধ্ প্ ম্ গ্ রে্

আমরা যদি প্রত্যেকবার খর্‌জ (ষড়্‌জ) পরিবর্তন করে আরোহাবরোহ করি, অর্থাৎ এক-একবার এক-একটি স্বরকে সা ধরে নিয়ে ক্রমশঃ এগুতে থাকি, তাহলেই বিভিন্ন রকম মূর্চ্ছনার সৃষ্টি হবে।

শ্রুতি ও স্বরের যেমন আলাদা-আলাদা নাম আছে, মূর্চ্ছনাগুলিরও তেমনি পৃথক পৃথক নাম আছে। এই গ্রামের উপরোক্ত সাতটি মূর্চ্ছনার নাম হল

যথাক্রমে উত্তরমন্দ্রা, রজনী, উত্তরায়তা, শুদ্ধ ষাড়্জী, মৎসরীকৃতা, অশ্বাক্রান্তা ও অভিরুদ্‌গতা।

মধ্যম গ্রামের মূর্চ্ছনা॥ এই গ্রামের প্রথম মূর্চ্ছনা শুরু হবে মধ্য স্থানের ম থেকে। তার পরেরগুলি হবে ঠিক আগের নিয়ম অনুযায়ী। নিচে প্রত্যেকটি মূর্চ্ছনার নাম ও স্বর সমষ্টি দেওয়া হল।—

(১) সৌবিরী মূর্চ্ছনা॥ ম প ধ নি র্সা র্রে র্গ | র্গ র্রে র্সা নি ধ প ম
(২) হরিণাশ্বা „ ॥ গ ম প ধ নি র্সা র্রে | র্রে র্সা নি ধ প ম গ
(৩) কলোপনতা „ ॥ রে গ ম প ধ নি র্সা | র্সা নি ধ প ম গ রে
(৪) শুদ্ধা মধ্যা „ ॥ সা রে গ ম প ধ নি | নি ধ গ ম প রে সা
(৫) মার্গী „ ॥ নি্ সা রে গ ম প ধ | ধ প ম গ রে সা নি্
(৬) পৌরবী „ ॥ ধ্ নি্ সা রে গ ম প | প ম গ রে সা নি্ ধ্
(৭) হৃষ্যকা „ ॥ প্ ধ্ নি্ সা রে গ ম | ম গ রে সা নি্ ধ্ প

গান্ধার গ্রামের মূর্চ্ছনা॥ গান্ধার গ্রামের প্রথম মূর্চ্ছনা আরম্ভ হয় মধ্য নিষাদ থেকে। কারণ আগেই বলেচি যে, এই গ্রামও আরম্ভ হয় নিষাদ থেকে। এবার দেখুন এই গ্রামের সাতটি মূর্চ্ছনা ও তাদের নাম।—

(১) নন্দা মূর্চ্ছনা॥ নি র্সা র্রে র্গ র্ম র্প র্ধ | র্ধ র্প র্ম র্গ র্রে র্সা নি
(২) বিশালা „ ॥ ধ নি র্সা র্রে র্গ র্ম র্প | র্প র্ম র্গ র্রে র্সা নি ধ
(৩) সুমুখী „ ॥ প ধ নি র্সা র্রে র্গ র্ম | র্ম র্গ র্রে র্সা নি ধ প
(৪) বিচিত্রা „ ॥ ম প ধ নি র্সা র্রে র্গ | র্গ র্রে র্সা নি ধ প ম
(৫) রোহিনী „ ॥ গ ম প ধ নি র্সা র্রে | র্রে র্সা নি ধ প ম গ
(৬) সুখা „ ॥ রে গ ম প ধ নি র্সা | র্সা নি ধ প ম গ রে
(৭) আলাপা „ ॥ সা রে গ ম প ধ নি | নি ধ প ম গ রে সা

এই হল প্রাচীন একুশটি মূর্চ্ছনার পরিচয়। বর্তমান কালে মূর্চ্ছনা নামটি মুছে গেলেও এর প্রয়োজনীয়তা মেটানো হচ্চে মেল বা ঠাট নাম দিয়ে। ঠাট থেকে যেমন রাগের জন্ম, মূর্চ্ছনা থেকে তেমনি জন্ম হত জাতির। মূর্চ্ছনার এরূপ অর্থভেদ এর আগেও হয়েচে। মধ্যযুগে—কোন রাগের স্বর বিস্তারের সময়,

যে প্রথম তানটি, বর্জিত স্বর ইত্যাদিকে পরিত্যাগ করে গ্রহ স্বর থেকে আরম্ভ করা হত, তাকে বলা হত মূর্চ্ছনা। কর্ণাটকী সঙ্গীতে রাগের আরোহ-অবরোহকে আজকাল মূর্চ্ছনা বলা হয়।

॥ মূর্চ্ছনা ও আধুনিক ঠাট ॥

একটু আগেই বলা হয়েচে যে বর্তমান কালে মূর্চ্ছনা পরিভাষাটি আর ব্যবহার করা হয় না। তার বদলে ঠাট কথাটিই প্রচলিত হয়ে গেচে। দুটির অর্থ প্রায় একই। আজকাল যেমন কোন্ রাগে কী স্বর ব্যবহৃত হয় তা বোঝাবার জন্য ঠাটের উল্লেখ করা হয়, আগের দিনে তেমনি কোন্ রাগে কী স্বর লাগে তা বোঝাবার জন্য উল্লেখ করা হত মূর্চ্ছনার নাম। যেমন, মনে করুন আপনাকে বলা হল দুর্গা রাগটি বিলাবল ঠাট থেকে উৎপন্ন হয়েচে। আপনি সঙ্গে সঙ্গে বুঝলেন যে দুর্গা রাগে সব শুদ্ধ স্বর ব্যবহৃত হয়। কারণ, বিলাবল ঠাটের সব স্বরগুলিই শুদ্ধ। তেমনি, আগের দিনে বলা হত অমুক রাগটি উত্তরমন্দ্রা মূর্চ্ছনা থেকে উৎপন্ন, তাহলে তখুনি আপনি বুঝতে পারবেন যে অমুক রাগটিতে সব শুদ্ধ স্বর লাগানো হয়। কারণ, উত্তরমন্দ্রার মূর্চ্ছনার (যড়্জ গ্রামের প্রথম মূর্চ্ছনা) স্বরগুলি সবই শুদ্ধ। এই হল প্রাচীন মূর্চ্ছনার সঙ্গে আধুনিক ঠাটের সম্পর্ক।

আমি একথাও বলেচি যে, বর্তমানে শুধু যড়্জ গ্রামই বেঁচে আছে। অন্য দুটির অস্তিত্ব লুপ্তপ্রায়। তাই যড়্জ গ্রামের সাতটি মূর্চ্ছনার সঙ্গে আধুনিক কোন্ কোন্ ঠাটের মিল আছে একবার দেখা যাক। প্রথমে সপ্তকের ১২টি স্বর পর পর সাজিয়ে নিন। তারপর একে একে মূর্চ্ছনাগুলিকে সাজান।

	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	সা	ঋ	রে	জ্ঞ	গ	ম	হ্ম	প	দ	ধ	ণি	নি
১। উত্তরমন্দ্রা মূর্চ্ছনা ॥	সা		রে		গ	ম		প		ধ		নি
২। রজনী „ ॥	নি্		সা		রে	জ্ঞ		ম		প		ধ
৩। উত্তরায়তা „ ॥	দ্		ণি্		সা	ঋ		জ্ঞ		ম		প
৪। শুদ্ধ যাড়্জী „ ॥	প্		ধ্		নি্	সা		রে		গ		হ্ম
৫। মৎসরীকৃতা „ ॥	ম্		প্		ধ্	ণি্		সা		রে		গ
৬। অশ্বাক্রান্তা „ ॥	জ্ঞ্		ম্		প্	দ্		ণি্		সা		রে
৭। অভিরুদ্গতা „ ॥	ঋ্		জ্ঞ্		ম্	প		দ্		ণি		সা

ওপরের তালিকাটি দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারচেন যে, ১ম থেকে ৬ষ্ঠ মূর্চ্ছনা পর্যন্ত স্বরগুলি আমাদের হিন্দুস্থানী পদ্ধতির যথাক্রমে বিলাবল, কাফী, ভৈরবী, কল্যাণ, খমাজ ও আসাবরী ঠাটের সঙ্গে হুবহু মিল আছে কিন্তু ৭ম মূর্চ্ছনার সঙ্গে বর্তমানে প্রচলিত ১০টি ঠাটের কোনটির মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ, এই মূর্চ্ছনার যে স্থানে পঞ্চম স্বরটিকে বসান হয়েচে, নিয়ম মাফিক সেটি হল তীব্র ম-এর স্থান।

॥ শ্রুতি ও স্বরের বিভক্তিকরণে বিভিন্ন কালের সঙ্গীতজ্ঞানীদের মতামতের তুলনা ॥

শ্রুতি ও স্বর সম্বন্ধীয় বিষয়টির মত ভারতীয় সঙ্গীতে বোধহয় আর কোন জটিল বিষয় নেই। সেই প্রাচীন ভরতমুনির সময় থেকে আরম্ভ করে আজকের সঙ্গীতকোবিদদের মধ্যেও এ নিয়ে আলোচনা ও মতভেদের অন্ত নেই। কাজেই শিক্ষার্থীদের পক্ষেও এ বিষয়টি স্বাভাবিক ভাবেই জটিল মনে হবে। আপাততঃ ঐ সব জটিলতার মধ্যে না গিয়ে, মোটামুটি ভাবে বিষয়টি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

সুবিধের জন্য অন্যান্য পণ্ডিতদের নীতি অনুসরণ করে আমরাও প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময়কে মোট তিন ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি।

ইতিপূর্বে "শ্রুতি ও স্বরের বিভক্তিকরণ" সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় (পূর্বভাগ দ্রষ্টব্য) দেখানো হয়েছিল যে প্রাচীন ও মধ্যকালীন পণ্ডিতেরা যে নির্দিষ্ট শ্রুতির ওপর বারোটি স্বর স্থাপন করেছিলেন, আধুনিক পণ্ডিতেরা তার মধ্যে কিছু অদল-বদল করেচেন। একটি তালিকাও সে সময় দেওয়া হয়েছিল। প্রাচীন ও মধ্য কালে কোন্ শ্রুতির ওপর কোন্ স্বর স্থাপিত ছিল এবং আধুনিক কালে বাইশ শ্রুতির ওপর কী ভাবে শুদ্ধ ও বিকৃত মিলিয়ে বারোটি স্বরকে বিভক্ত করা হয়েচে, তাই দেখানো হয়েছিল সেই তালিকায়। এবার সে সম্বন্ধে আরেকটু আলোচনা করা যাক।

প্রাচীন কাল ॥ প্রাচীন কালের সময় ধরা হয় সাধারণতঃ পঞ্চম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে প্রধানতঃ দুজন গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ করা যায়। একজন হলেন "নাট্যশাস্ত্র" রচয়িতা ভরত মুনি (৫ম শতাব্দী), অপরজন "সঙ্গীত রত্নাকর" প্রণেতা আচার্য শার্ঙ্গদেব (১৩শ শতাব্দী)।

এঁরা দুজনেই মোট বাইশটি শ্রুতি মানতেন এবং এই বাইশটি শ্রুতির ওপর নিম্নোক্ত ভাবে স্বর স্থাপনা করেছিলেন।—

৪র্থ	শ্রুতির	(ছন্দোবতী)	ওপর	ষড়্জ
৭ম	„	(রক্তিকা)	„	ঋষভ
৯ম	„	(ক্রোধা বা ক্রোধী)	„	গান্ধার
১৩শ	„	(মার্জনী)	„	মধ্যম
১৭শ	„	(আলাপিনী)	„	পঞ্চম
২০শ	„	(রম্যা)	„	ধৈবত
২২শ	„	(ক্ষোভিনী)	„	নিষাদ

অর্থাৎ সা, ম ও প স্বরের চারটি, রে ও ধ স্বরের তিনটি এবং গ ও নি স্বরের দুটি করে শ্রুতি তাঁরা মানতেন। এ সম্বন্ধে শার্ঙ্গদেব কৃত "রত্নাকরের" শ্লোকটি বিশেষ উল্লেখ্য :—

চতুশ্চতুশ্চতুশ্চৈব ষড়্জমধ্যমপঞ্চমাঃ।
দ্বে দ্বে নিষাদগান্ধারৌ ত্রিস্ত্রিঋষভধৈবতৌ॥

এঁদের দুজনেরই মতে শ্রুতির ব্যবধান—যাকে বলা হয় "প্রমাণ শ্রুত্যন্তর" বা "প্রমাণ শ্রুতি"—সমান ছিল। তাছাড়া বর্তমানের কাফী ঠাটকে এঁরা শুদ্ধ ঠাট রূপে বর্ণনা করেচেন।

মধ্য কাল॥ চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই সময়কে ধরা হয়। এই সময়ের মধ্যে যাঁরা শ্রুতি-স্বর বিষয়ক আলোচনা করেচেন তাঁদের মধ্যে "রাগতরঙ্গিনী"র লেখক কবি লোচন (১৫শ শতাব্দীর ১ম দিকে), "সঙ্গীত পারিজাত"-এর পঃ অহোবল (১৭শ শতাব্দীর ১ম দিকে), "হৃদয়কৌতুক" ও "হৃদয় প্রকাশ" গ্রন্থ রচয়িতা হৃদয়নারায়ণ দেব (১৭শ শতাব্দীর শেষ ভাগ) ও পণ্ডিত শ্রীনিবাস (১৮শ শতাব্দীর পূর্বভাগ) যিনি "রাগতত্ত্ব-বিবোধ" গ্রন্থ রচনা করেচেন—এঁরাই হলেন প্রধান। এঁরা সকলেই শ্রুতির সংখ্যা ও স্বর-স্থাপনা সম্বন্ধে প্রাচীনদের সঙ্গে একমত। অর্থাৎ এঁরাও বাইশশ্রুতির মতকেই গ্রহণ করেছেন এবং প্রাচীন নিয়ম অনুসারেই ৪র্থ, ৭ম, ৯ম, ১৩শ, ১৭শ, ২০শ ও ২২শ শ্রুতির ওপর স্থাপনা করেচেন যথাক্রমে সা রে গ ম প ধ ও নি শুদ্ধ স্বর সাতটিকে।

কিন্তু শ্রুতির ব্যবধান (interval) সম্বন্ধে এঁদের মত ছিল ভিন্ন। এঁরা

আগের মত প্রতি শ্রুতির ব্যবধানকে সমান মনে করতেন না। যতদূর জানা যায়, পঃ অহোবলই প্রথমে বীণা-তন্ত্রীর দৈর্ঘ্যের সাহায্যে স্বর-স্থান নির্ধারণ করেন এবং স্বরের আন্দোলন সংখ্যাও নিরূপিত করেন। শ্রুত্যন্তরকে অর্থাৎ শ্রুতির ব্যবধানকে ইনি অসমান বলে মন্তব্য করেছেন।

আধুনিক কাল॥ উনবিংশ শতাব্দী থেকে আধুনিক কালের শুরু। পঃ বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখণ্ডেকেই এ যুগের শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রকার মনে করা হয়। "লক্ষ্যসংগীত", "অভিনব রাগমঞ্জরী", "ক্রমিক পুস্তকমালিকা", "হিন্দুস্থানী সঙ্গীতপদ্ধতি" প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেছেন ইনি। যদিও এঁর মতবাদের সঙ্গে আধুনিক কালের অনেকেরই অনেক বিষয়ে মতভেদ আছে, তবু প্রধানতঃ তাঁর গ্রন্থের পটভূমিকাতেই পরবর্তী প্রায় সকল গ্রন্থকারেরা তাঁদের গ্রন্থাদি রচনা করেছেন।...শ্রুতি ও স্বর-সংখ্যা নিয়ে প্রাচীন ও মধ্যকালীন পণ্ডিতদের সঙ্গে ইনিও দ্বিমত নন। অর্থাৎ বাইশটি শ্রুতির ওপর মোট বারোটি স্বরের বিভাজন ইনিও মেনে নিয়েছেন। কিন্তু ঐ শ্রুতিগুলির ওপর স্বর স্থাপনার ব্যাপারে ইনি ভিন্নমত পোষণ করেন। ইনি ২২টি শ্রুতির ওপর ৭টি শুদ্ধ স্বরকে বিভক্ত করেছেন নিম্নোক্ত রীতিতে।—

১ম	শ্রুতির	(তীব্রা)	ওপর	সা
৫ম	„	(দয়াবতী)	„	রে
৮ম	„	(রৌদ্রী)	„	গ
১০ম	„	(বজ্রিকা)	„	ম
১৪শ	„	(ক্ষিতি)	„	প
১৮শ	„	(মদন্তী)	„	ধ
২১শ	„	(উগ্রা)	„	নি

স্বর-স্থানের ব্যাপারে পূর্বাচার্যদের সঙ্গে এঁর মতের অমিল থাকলেও "রত্নাকর"-এর চতুশ্চতুশ্চতুশ্চৈব...ইত্যাদি মতের ইনি পরিপোষক। অর্থাৎ স্বরের শ্রুত্যন্তর ব্যাপারে ইনি রত্নাকর মতাবলম্বী। সা, ম ও প স্বরের ৪টি করে, রে ও ধ স্বরের ৩টি করে এবং গ ও নি স্বরের ২টি করে শ্রুতি সম্বন্ধে ইনি দ্বিমত নন। প্রাচীন শুদ্ধ ঠাট কাফীর বদলে ইনি বিলাবলকে শুদ্ধ ঠাট রূপে প্রচার করেছেন।

শ্রুতি ও স্বরের বিভক্তিকরণ সম্বন্ধে এই হল মোটামুটিভাবে তিন কালের পণ্ডিতদের মতামত। আরো উচু ক্লাসে উঠে বিভিন্ন গুণীদের বিস্তারিত

আলোচনা পাঠ করলে এ সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু জানতে পারবেন আপনারা।

॥ স্বরের আন্দোলন সংখ্যা ॥

নিচু ক্লাসে আমরা জেনেছিলাম যে নাদ যত উঁচু হবে, তারের আন্দোলন সংখ্যা তত বেশি হবে আর নাদ যত নিচু হবে, তারের আন্দোলন সংখ্যা হবে তত কম। আমরা এ-ও জানি যে নাদের সংখ্যা অসংখ্য। এই অসংখ্য নাদের মধ্যে সব নাদই মানুষ শুনতে পায় না। খুব নিচু শব্দ যেমন আমরা শুনতে পাই না, তেমনি খুব উঁচু শব্দও আমাদের কান গ্রহণ করতে পারে না। বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করে দেখেচেন যে, সব চেয়ে যে নিচু শব্দ আমরা শুনতে পাই, তা এক সেকেণ্ডে ১৬ বার আন্দোলিত হয়। আর সব চাইতে উঁচু শব্দের আন্দোলন হয় সেকেণ্ডে ৩৮০০০ বার। আবার অনেকে মনে করেন, প্রতি সেকেণ্ডে যে নাদ মানে শব্দ ২০ বার আন্দোলিত হয়, মানুষ সেই নাদই শুনতে পায়, তার কম হলে পারে না। কিন্তু প্রতি সেকেণ্ডে ১৬ থেকে ৪০০০ হাজার বার আন্দোলনযুক্ত যে নাদ, সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সেই নাদগুলিই কাজে লাগে।

তারের দৈর্ঘ্যের সঙ্গেও নাদের আন্দোলনের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। তাই কোন স্বরের আন্দোলন সংখ্যা জানতে হলে যেমন তারের দৈর্ঘ্য হিসেব করে বার করা সহজ হয়, তেমনি তারের দৈর্ঘ্য থেকে বার করা যায় স্বরের আন্দোলন সংখ্যা। তারের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধীয় বিস্তৃত আলোচনা পরে করা হবে। আপাততঃ তারের দৈর্ঘ্যের সঙ্গে স্বরের আন্দোলন সংখ্যার রহস্যটা বুঝে নেওয়া যাক।

॥ তারের দৈর্ঘ্য ও আন্দোলন সংখ্যার রহস্য ॥

তারের দৈর্ঘ্যের (length) সঙ্গে তা'র আন্দোলনের সম্পর্কটা বেশ মজার। যেমন, তারের দৈর্ঘ্য যদি বেশি হয়, তাহ'লে আন্দোলন হবে কম, আর দৈর্ঘ্য কম হ'লে আন্দোলন হবে বেশি। কারণটা আগেই বলা হয়ে গেচে। আমরা আগেই জেনেচি যে তারের আন্দোলন যত বেশি হবে, নাদ হবে তত উঁচু। নাদ উঁচু হওয়া মানেই আন্দোলনের সংখ্যা বেশি হওয়া—আর আন্দোলন বেশি হওয়া মানেই তারের দৈর্ঘ্য কম হওয়া। ঠিক তেমনি নাদ যদি নিচু হয়,

আন্দোলন হবে কম, তারের দৈর্ঘ্য হবে বেশি। এই রহস্যটা কিন্তু ভালো ভাবে মনে রাখতে হবে।—আবার বলচি ঃ—

নাদ নিচু=স্বরের আন্দোলন কম=তারের দৈর্ঘ্য বেশি।

নাদ উঁচু=আন্দোলন বেশি=তারের দৈর্ঘ্য কম।

তাহলে যদি কোন স্বরের আন্দোলন সংখ্যা দেওয়া থাকে, তা থেকে সেই তারের দৈর্ঘ্য বার করা যেমন সহজ, তেমনি কোন তারের দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকলে, তা থেকে স্বরের আন্দোলন বার করাও সহজ হয়ে যায়। অতএব আগে সাতটি শুদ্ধ স্বরের আন্দোলন সংখ্যা জেনে নেওয়া দরকার। নিচে যে আন্দোলন সংখ্যা দেওয়া হচ্চে, সেটি হচ্চে মধ্যকালীন সঙ্গীতকোবিদ শ্রীনিবাসকৃত। পরবর্তী-কালে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের মতানুসারে ভিন্ন আন্দোলন সংখ্যা দেখিয়েছেন।

॥ স্বরের নাম ॥		॥ আন্দোলন সংখ্যা ॥
১। ষড়্‌জ	—	২৪০
২। ঋষভ	—	২৭০
৩। গান্ধার	—	২৮৮
৪। মধ্যম	—	৩২০
৫। পঞ্চম	—	৩৬০
৬। ধৈবত	—	৪০৫
৭। নিষাদ	—	৪৩২

আন্দোলন-সংখ্যা জানার সঙ্গে সঙ্গে ষড়্‌জ স্বরের তারের দৈর্ঘ্যটিও আমাদের জানা দরকার। মধ্য ষড়্‌জের দৈর্ঘ্য পণ্ডিতেরা ধরে নিয়েচেন ৩৬"। অর্থাৎ মধ্য ষড়্‌জের তার যদি ৩৬" ইঞ্চি লম্বা হয়, তাহলে ষড়্‌জের আন্দোলন সংখ্যা হবে ২৪০। এই হিসেবকে আশ্রয় ক'রেই অন্যান্য স্বরের আন্দোলন ও দৈর্ঘ্য বার করতে হবে। কেমন ক'রে দেখুন।—

মনে করুন, ঋষভের আন্দোলন সংখ্যা যদি ২৭০ হয়, তাহ'লে তা'র দৈর্ঘ্য কত জানতে হলে, প্রথমে ২৪০ (সা-এর আন্দোলন) দিয়ে ২৭০ (ঋষভের আন্দোলন) সংখ্যাকে ভাগ করতে হবে। তারপর সেই ভাগফল দিয়ে আবার ভাগ করতে হবে ৩৬-কে (ষড়্‌জের দৈর্ঘ্য)। তাহ'লেই ঋষভের দৈর্ঘ্য পাওয়া যাবে। যেমন,—

$\frac{২৭০}{২৪০}=১\frac{৩}{২৪}=\frac{২৭}{২৪}$ এই সংখ্যাটিকে বলা হয় ষড়্‌জ ও ঋষভের গুণান্তরবা

স্বরান্তর। গুণান্তর মানে হ'ল দুটি স্বরের গুণগত তফাৎ। আর স্বরান্তর মানে হ'ল দুটি স্বরের মধ্যবর্তী স্থানের তফাৎ। উক্ত নিয়মে অঙ্ক কষে যে গুণান্তর পাওয়া গেল, সেই গুণান্তরটি দিয়ে এবার ষড়্জের দৈর্ঘ্য ৩৬"-কে ভাগ দিন। যেমন—

$৩৬ \div \frac{২৭}{২৪} = ৩৬ \times \frac{২৪}{২৭} = \frac{৩৬ \times ২৪}{২৭} = ৩২$

তাহলে ঋষভ-তন্ত্রীটির দৈর্ঘ্য হ'ল ৩২" ইঞ্চি।

আরেকটির হিসেব দেখুন। তাহ'লে বুঝতে আরো সুবিধে হবে। গান্ধারের আন্দোলন যদি ২৮৮ হয়, তাহলে তা'র তারের দৈর্ঘ্য কত?

গান্ধারের আন্দোলন সংখ্যা ২৮৮-কে ষড়্জের আন্দোলন সংখ্যা ২৪০ দিয়ে ভাগ করুন। তারপর সেই ভাগফল দিয়ে ৩৬"-কে ভাগ দিন।

$\frac{২৮৮}{২৪০} = \frac{৬}{৫}$ (সা ও গ-এর গুণান্তর)

$\therefore ৩৬ \div \frac{৬}{৫} = ৩৬ \times \frac{৫}{৬} = \frac{৩৬ \times ৫}{৬} = ৩০$

∴ গান্ধার স্বরের তারের দৈর্ঘ্য হ'ল ৩০" ইঞ্চি।

এই ভাবেই আপনারা সব স্বরের দৈর্ঘ্য বার করতে পারবেন।

মধ্যমের আন্দোলন সংখ্যা যদি ৩২০ হয়, তাহ'লে তারের দৈর্ঘ্য হবে—

$\frac{৩২৫}{২০০} = \frac{৪}{৩}$ (সা ও ম-এর গুণান্তর)

$\therefore ৩৬ \div \frac{৪}{৩} = ৩৬ \times \frac{৩}{৪} = \frac{৩৬ \times ৩}{৪} = ২৭$

∴ মধ্যম স্বরের তারের দৈর্ঘ্য হবে ২৭" ইঞ্চি।

পঞ্চমের আন্দোলন সংখ্যা যদি ৩৬০ হয়, তা'র তারের দৈর্ঘ্য হবে :—

$\frac{৩৬০}{২৪০} = \frac{৩}{২}$ (সা ও প-এর গুণান্তর)

$\therefore ৩৬ \div \frac{৩}{২} = ৩৬ \times \frac{২}{৩} = \frac{৩৬ \times ২}{৩} = ২৪$

∴ পঞ্চমের তারের দৈর্ঘ্য হবে ২৪" ইঞ্চি।

ধৈবতের তারের দৈর্ঘ্য কত হবে যদি তা'র আন্দোলন সংখ্যা হয় ৪০৫ ?

$\frac{৪০৫}{২৪০} = \frac{২৭}{১৬}$ (সা ও ধ-এর গুণান্তর)

$\therefore ৩৬ \div \frac{২৭}{১৬} = ৩৬ \times \frac{১৬}{২৭} = \frac{৩৬ \times ১৬}{২৭} = \frac{৬৪}{৩} = ২১\frac{১}{৩}$

অতএব ধৈবতের আন্দোলন সংখ্যা যদি ৪০৫ হয়, তাহ'লে তা'র তারের দৈর্ঘ্য হবে $২১\frac{১}{৩}$"।

নিষাদের আন্দোলন সংখ্যাও ওপরের তালিকায় দেওয়া আছে। এবার সেই আন্দোলন সংখ্যার সাহায্যে নিষাদের তারের দৈর্ঘ্য বার করুন তো?—

প্রথমে নিষাদের আন্দোলন সংখ্যাকে ষড়্জের আন্দোলন সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হবে।

$\frac{৪৩২}{২৪০} = \frac{৯}{৫}$

∴ সা ও নি-র গুণান্তর হ'ল $\frac{৯}{৫}$

অতএব সা-এর দৈর্ঘ্যকে এবার সা ও নি-র গুণান্তর দিয়ে ভাগ করুন।

$৩৬ \div \frac{৯}{৫} = ৩৬ \times \frac{৫}{৯} = \frac{৩৬ \times ৫}{৯} = ২০$

∴ নিষাদের তারের দৈর্ঘ্য হ'ল ২০" ইঞ্চি।

আশা করি, আন্দোলন সংখ্যা থেকে কী ক'রে তারের দৈর্ঘ্য বার করতে হবে সেটা আপনাদের বোঝাতে পেরেচি।

॥ তারের দৈর্ঘ্য থেকে স্বরের আন্দোলন সংখ্যা নিরূপণ করা ॥

স্বরের আন্দোলন সংখ্যা দেওয়া থাকলে কী ভাবে তারের দৈর্ঘ্য বার করতে হবে, তা আমরা জেনে নিয়েচি। এবার ঠিক তার বিপরীত ব্যাপারটাও বুঝে নেওয়া যাক। মানে, তারের দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকলে তা'র সাহায্যে স্বরের আন্দোলন সংখ্যা বার করার নিয়মটা বুঝে নেওয়া।

এক্ষেত্রেও প্রথমে স্বরের গুণান্তর বার করতে হবে। তারপর সেই গুণান্তরের সংখ্যাটির সঙ্গে সা-এর আন্দোলন সংখ্যাকে গুণ করলেই স্বরের আন্দোলন সংখ্যা বেরিয়ে আসবে।

তফাৎটা বুঝেচেন নিশ্চয়ই! আন্দোলন সংখ্যার সাহায্যে দৈর্ঘ্য বার করার সময় গুণান্তর দিয়ে সা-এর দৈর্ঘ্যকে ভাগ করতে হয়েছিল। এখন গুণান্তরের সঙ্গে সা-এর আন্দোলন সংখ্যাকে গুণ করতে হবে। যেমন,—

ঋষভের দৈর্ঘ্য যদি ৩২" ইঞ্চি হয়, তাহলে তা'র আন্দোলন সংখ্যা কত?

প্রথমে ষড়্জের দৈর্ঘ্যকে ঋষভের দৈর্ঘ্য দিয়ে ভাগ ক'রে ঋষভের গুণান্তর বার করুন। যেমন—

$\frac{৩৬}{৩২} = \frac{৯}{৮}$ এটি হ'ল ঋষভের গুণান্তর।

এবার এই গুণান্তরকে সা-এর আন্দোলন সংখ্যা দিয়ে গুণ করুন—

$২৪০ \times \frac{৯}{৮} = \frac{২৪০ \times ৯}{৮} = ২৭০$

অতএব ঋষভের আন্দোলন সংখ্যা হ'ল ২৭০

আগে যেমন সুবিধের জন্য শ্রীনিবাসকৃত শুদ্ধ স্বরের আন্দোলন সংখ্যার তালিকা দেওয়া হয়েছিল, এবারে তেমনি সাতটি শুদ্ধ স্বরের দৈর্ঘ্য দেওয়া হচ্ছে। এই তালিকাটিও শ্রীনিবাসের মতানুসারে দেওয়া হ'ল। এই তালিকার সাহায্যে আপনারা প্রতিটি স্বরের আন্দোলন সংখ্যা বার ক'রে নিন।

॥ স্বরের নাম ॥		। তারের দৈর্ঘ্য ॥
১। ষড়্জ	—	৩৬"
২। ঋষভ	—	৩২"
৩। গান্ধার	—	৩০"
৪। মধ্যম	—	২৭"
৫। পঞ্চম	—	২৪"
৬। ধৈবত	—	২১$\frac{১}{৩}$"
৭। নিষাদ	—	২০"

এবার গান্ধারের দৈর্ঘ্য থেকে তা'র আন্দোলন সংখ্যা বার করুন।—

$\frac{৩৬}{৩০}=\frac{৬}{৫}$, $\therefore$ $২৪০\times\frac{৬}{৫}=\frac{২৪০\times৬}{৫}=২৮৮$

$\therefore$ গান্ধারের আন্দোলন সংখ্যা হ'ল ২৮৮।

এই নিয়মে ম, প, ধ ও নি স্বরের আন্দোলন সংখ্যা বার করা যাবে। ধ-এর দৈর্ঘ্যটা ভগ্নাংশ হওয়ায় হয়ত আপনাদের একটু অসুবিধা হতে পারে। তাই আমি নিজেই হিসেব ক'রে তার আন্দোলন সংখ্যাটা বার ক'রে দিচ্ছি।

$$৩৬\div২১\frac{১}{৩}=৩৬\div\frac{৬৪}{৩}=৩৬\times\frac{৩}{৬৪}=\frac{৩৬\times৩}{৬৪}=\frac{২৭}{১৬}$$

$\therefore$ $২৪০\times\frac{২৭}{১৬}=\frac{২৪০\times২৭}{১৬}=৪০৫$

$\therefore$ ধ-এর আন্দোলন সংখ্যা হ'ল ৪০৫।

॥ তারের দৈর্ঘ্য ও স্বরের অবস্থান ॥

প্রাচীন যুগের সঙ্গীত-জ্ঞানীরা শ্রুতির ভাগ অনুসারে স্বরের স্থান নির্দেশ করেছিলেন। মধ্যযুগের পণ্ডিত অহোবল আবার নতুন পদ্ধতিতে স্বর-স্থান নির্ধারণ করেন। তিনি একটি বীণার ৩৬ ইঞ্চি তন্ত্রীকে (তারকে) বিভিন্ন ভাগে মেপে স্বরের স্থান নিশ্চিত করেন। এ সম্বন্ধে যাঁরা আরো জানতে ইচ্ছুক,

তাঁরা যদি "সঙ্গীত পারিজাত" গ্রন্থটি পাঠ করেন, অহোবলের স্বর স্থাপনার ব্যাপারটা বিস্তারিত ভাবে জানতে পারবেন।

অহোবলের পর এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আরো বিস্তারিত আলোচনা করেন পণ্ডিত-প্রবর শ্রীনিবাস—তাঁর 'রাগতত্ব বিবোধ' গ্রন্থে। কিভাবে ৩৬ ইঞ্চি তারের ওপর এক সপ্তকের বারোটি স্বরকে স্থাপিত করা হয়েচে এবার সে সম্বন্ধে বলচি। তবে একটি কথা এখানে মনে রাখতে হবে। পঃ অহোবল বা শ্রীনিবাস যে শুদ্ধ ঠাটের আধারে স্বর-স্থাপনা করেছিলেন, সেটি কিন্তু অধুনা প্রচলিত শুদ্ধ ঠাট বিলাবল নয়। আগের দিনে বর্তমানের কাফি ঠাটকেই শুদ্ধ ঠাট বলা হ'ত। অর্থাৎ তাঁরা যাকে শুদ্ধ গ ও নি বলেচেন, তা হ'ল বর্তমানের কোমল গ ও কোমল নি। বর্তমানের শুদ্ধ গ ও শুদ্ধ নি-কে তখন বলা হ'ত তীব্র গ ও নি।

বীণার নিচের দিকটাকে (মানে ব্রিজের দিকটা) বলা হয় **পূর্ব মেরু** আর ওপর দিকটাকে (যে দিকটা থাকে তার-গহনের দিকে) বলা হয় **অন্ত্য মেরু**। কারণ তার পরানোর সময় প্রথমে ব্রিজের নিচের দিকে লাউয়ের খোলের শেষ প্রান্তের মোগরা বা পত্তী থেকেই তার পরানো হয়। তারপর তন্ত্রীটিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় ওপরে—তার-গহনের দিকে। পূর্ব মেরু থেকে অন্ত্য মেরু পর্যন্ত সম্পূর্ণ তন্ত্রীটির মাপ হ'ল ৩৬" ইঞ্চি। যেমন—

অন্ত্য মেরু।————————— ৩৬" তার —————————। পূর্ব মেরু

এই ৩৬ ইঞ্চি দীর্ঘ মুক্ত তন্ত্রীটিতে যদি টঙ্কার (আঘাত) দেওয়া হয়, তাহ'লে যে নাদ ধ্বনিত হবে, সেটি হবে মধ্য সপ্তকের সা। অর্থাৎ মধ্য সপ্তকের সা-এর তন্ত্রীটি হ'ল ৩৬" দীর্ঘ।

এই তন্ত্রীর ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় টিপ দিয়ে যদি টঙ্কার দেওয়া হয়, তাহ'লে ধ্বনিত হবে তার সপ্তকের সা। অর্থাৎ তার ষড়্জের যে তন্ত্রী, তা'র দৈর্ঘ্য হ'ল ১৮" ইঞ্চি (৩৬ ÷ ২ = ১৮)।

এখন যদি মধ্য সা ও তার সা পর্যন্ত ১৮" দীর্ঘ তন্ত্রীটির ঠিক মধ্য স্থলে টিপ দিয়ে আঘাত করেন, তাহলে মধ্য সপ্তকের মধ্যম স্বরটি ঝঙ্কৃত হবে। অতএব মধ্যমের তন্ত্রীর মাপ হ'ল ২৭" ইঞ্চি। কেমন করে? ১৮" ইঞ্চিকে ২ ভাগ

করলে প্রতি ভাগ হবে (১৮÷২=৯) ৯" ইঞ্চি করে। পূর্ব মেরু থেকে তার সা-এর দৈর্ঘ্য যদি ১৮" হয়, তাহ'লে ১৮"+৯"=২৭" ইঞ্চি।
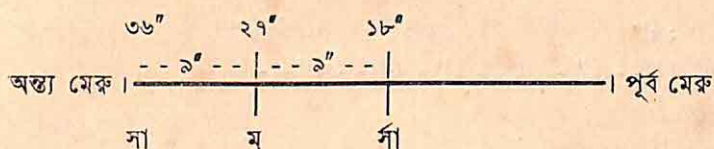
যখনই তন্ত্রী বা স্বরের দৈর্ঘ্য আপনি বার করতে চাইবেন, তখনই পূর্ব মেরুর দিক থেকে মাপটা হিসেব করতে হবে। কারণ তন্ত্রীর গোড়ার দিকটা হ'ল পূর্ব মেরুর দিকে।

মধ্য সা থেকে তার সা পর্যন্ত ১৮" ইঞ্চির তন্ত্রীটিকে সমান তিন ভাগে ভাগ করুন (১৮÷৩=৬" ইঞ্চি), প্রতিটি ভাগ হবে ৬" ইঞ্চি করে। এবার তার সা-এর ১৮" ইঞ্চির সঙ্গে ডান দিক থেকে প্রথম ভাগটিকে যোগ করলে হবে ২৪" (১৮"+৬"=২৪"); দ্বিতীয় ভাগকে যোগ দিলে হবে (১৮+৬+৬=৩০) ৩০" এবং শেষ ভাগটিকে যুক্ত করলে হবে (১৮+৬+৬+৬=৩৬) ৩৬" ইঞ্চি। মধ্য সপ্তকের সা, গ ও প স্বর-তন্ত্রীর দৈর্ঘ্য হ'ল যথাক্রমে ৩৬", ৩০" ও ২৪" ইঞ্চি। রেখা চিত্রটি দেখুন—

এবার মধ্য সা ও প পর্যন্ত তন্ত্রীকে সমান তিন ভাগে ভাগ করুন। এক-একটি ভাগ হবে ৪" ইঞ্চি করে (১২÷৩=৪)। এখন প থেকে ২য় ভাগ পর্যন্ত দৈর্ঘ্য হবে ৩২" (২৪+৪+৪=৩২)। যথা—

৩৬" ৩২" ২৪"

- - ৪" - - | - - ৪" - - | - - ৪" - - |

অন্ত্য মেরু।

সা রে প
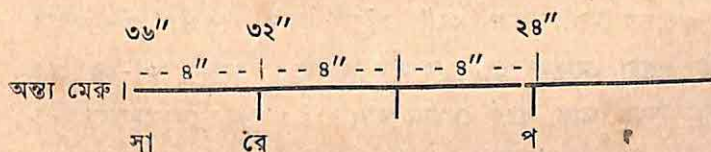
মধ্য প থেকে তার সা-এর দৈর্ঘ্যকে (৬") যদি সমান ৩ ভাগ করা হয়, তাহলে প্রত্যেকটি ভাগ হবে ২" করে (৬÷৩=২)। এখন তার সা থেকে

১ম ভাগটিকে যোগ করলে হবে ২০"। নিষাদের অবস্থান হল এই ২০ ইঞ্চির ওপর (১৮+২=২০)।
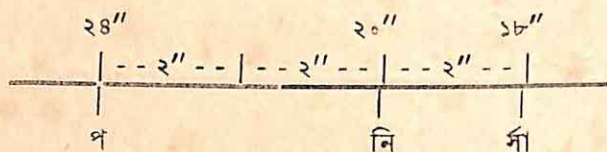
মধ্য সা থেকে তার সা পর্যন্ত যে সাতটি প্রাকৃত স্বর আছে, ধৈবত ছাড়া আর সবগুলিরই দৈর্ঘ্য বার করা গেল পঃ অহোবল বা শ্রীনিবাসের মত অনুসারে। ধৈবতের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে উক্ত পণ্ডিতেরা বলেচেন, প ও তার সা-এর মধ্যবর্তী অংশে ধ বসচে (পারিজাত ৩১৬ সংখ্যক সূত্র দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ প থেকে র্সা পর্যন্ত তন্ত্রীর দৈর্ঘ্য হল মোট ৬ ইঞ্চি। এই ৬ ইঞ্চিকে ২ ভাগ করলে প্রতি ভাগ হবে ৩" করে। অতএব (১৮+৩=২১) ধৈবতের দৈর্ঘ্য হবে ২১"। কিন্তু এই ২১ ইঞ্চিতে যদি ধৈবতের স্বর বাঁধা হয়, তাহলে তা শুদ্ধ ধ থেকে কিছু উঁচু মনে হয়। তাহলে কি 'মধ্যবর্তী অংশ' মানে ঠিক মাঝামাঝি জায়গা বোঝাচ্ছে না ?

শ্রীনিবাস বলেচেন, ষড়্‌জ-পঞ্চম ভাব অনুসারে ধৈবতের স্থান নির্ধারিত হবে। তা'র মানে রে স্বরের দেড়গুণ উঁচু হ'ল ধৈবত। সেই হিসেবে ধ-এর অবস্থান হবে ২১$\frac{১}{৩}$ ইঞ্চির ওপর (৩২ ÷ ১$\frac{১}{২}$ = ৩২$\frac{২}{৩}$ = $\frac{৩২ \times ২}{৩}$ = $\frac{৬৪}{৩}$ = ২১$\frac{১}{৩}$)।

'ষড়্‌জ-পঞ্চম ভাব' কাকে বলে এটা বুঝলেই এই হিসেবটা সরল হয়ে যাবে। কাজেই এখন এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা যাক।

॥ ষড়্‌জ-পঞ্চম ভাব ॥

ধৈবত-তন্ত্রীর দৈর্ঘ্য বার করার সময় যখন বলা হ'ল ঋষভের দেড়গুণ উঁচু ধৈবত তখন ঋষভের দৈর্ঘ্যের সঙ্গে (৩২") ১$\frac{১}{২}$কে গুণ না করে ভাগ দেওয়া হ'ল কেন ?—এই প্রশ্নটা বোধহয় অনেকের মনে এসেচে। কারণ, ৩২-এর দেড় গুণ হয় ৪৮। অথচ ভাগ করে দেখান হ'ল ২১$\frac{১}{৩}$। এটা তো দেড়গুণ নিচু হ'ল ?

আমি বলেচি, রে স্বর থেকে ধ স্বরের নাদ দেড়গুণ উঁচু। আর তার আগে জেনে এসেচি, নাদ যদি উঁচু হয়, তা'র তন্ত্রীর দৈর্ঘ্য হবে কম। অর্থাৎ নাদ

উচু=দৈর্ঘ্য কম=আন্দোলন বেশি। তাহলে ঋষভের ধ্বনি যখন ধৈবত অপেক্ষা কম, তখনই বুঝতে হবে যে, ঋষভতন্ত্রীর দৈর্ঘ্য ধৈবততন্ত্রী থেকে বেশি আর আন্দোলন সংখ্যা ধৈবতের চাইতে কম। কাজেই যখন আমরা বীণার তন্ত্রীর দৈর্ঘ্য অনুসারে স্বরের অবস্থান লক্ষ্য করছিলাম তখন আমরা ঋষভের দৈর্ঘ্য থেকে দেড় ভাগ দিয়ে ধৈবতের দৈর্ঘ্য বার করেছিলাম। ব্যাপারটা বোধহয় এবার বুঝতে পেরেচেন আপনারা। ষড়্জ-পঞ্চম ভাব মানে হচ্ছে, সা থেকে প দেড়গুণ উঁচু স্থানে অবস্থিত।

একটি স্বর থেকে যখন আরেকটি স্বরের অবস্থান দেড়গুণ-উঁচুতে থাকে, তখন সেই স্বর জোড়াকে বলা হয় ষড়্জ-পঞ্চম ভাবযুক্ত। কারণ সা থেকে প দেড়গুণ উঁচুতে অবস্থিত। তাছাড়া যে কোন স্বরের পরবর্তী ৫ম স্বরটি হচ্চে ঐ ১ম স্বরটির সঙ্গে ষড়্জ-পঞ্চম ভাব যুক্ত অর্থাৎ দেড় গুণ উঁচু। এই ভাবে এক সপ্তকের মধ্যে চার জোড়া স্বর ষড়্জ-পঞ্চম ভাবযুক্ত হয়। যেমন, সা-প, রে-ধ, গ-নি ও ম-সা। কিন্তু মনে রাখবেন যে সা থেকে যেমন প-এর ধ্বনি দেড়গুণ উঁচু, তেমনি সা থেকে প-এর তন্ত্রীর দৈর্ঘ্য হবে দেড়গুণ নিচু, এবং সা থেকে প-এর আন্দোলন সংখ্যা হবে বেশি। এই ভাবেই ষড়্জ-পঞ্চম ভাবযুক্ত প্রত্যেকটি জোড়ার হিসেব করা আছে।

॥ পঃ শ্রীনিবাসকৃত বিকৃত স্বরের স্থান ॥

বীণা-তন্ত্রীর দৈর্ঘ্য অনুসারে শ্রীনিবাস যেভাবে সপ্তকের শুদ্ধ স্বর-স্থানের নির্দেশ দিয়েছিলেন, পাঁচটি বিকৃত স্বরের স্থানও তিনি সেই ভাবে দেখিয়েচেন। যেমন—

কোমল ঋষভ ॥ মধ্য সপ্তকের সা থেকে শুদ্ধ রে পর্যন্ত ৪" ইঞ্চি দীর্ঘ তন্ত্রীটিকে তিনি সমান তিন ভাগে ভাগ করেচেন। প্রত্যেকটি ভাগ হ'ল $\frac{৪}{৩}$" ইঞ্চি। তারপর ঋষভের দিক থেকে যে প্রথম $\frac{৪}{৩}$" ইঞ্চির ভাগ, তার সঙ্গে ঋষভের ৩২" ইঞ্চিকে যোগ করলে হবে ৩৩$\frac{১}{৩}$" ইঞ্চি। অতএব কোমল ঋষভের (ঋ) দৈর্ঘ্য হবে ৩৩$\frac{১}{৩}$"। রেখাচিত্র দেখুন—

```
         ৩৬"                    ৩৩⅓"             ৩২"
          | - - ৪/৩" - - | - - ৪/৩" - - | - - ৪/৩" - - |
অন্ত্য মেরু ---+-------------------------+----------------+---
          |                           |                |
         সা                          ঋ               রে
```
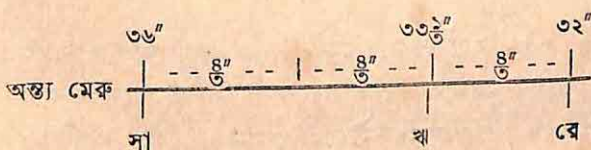
অঙ্কটা এইভাবে কষতে হবে।—

$৩৬ - ৩২ = ৪,\quad ৪ \div ৩ = \frac{৪}{৩}\quad \therefore ৩২ + \frac{৪}{৩} = \frac{১০০}{৩} = ৩৩\frac{১}{৩}$।

$\therefore$ কোমল ঋষভের দৈর্ঘ্য হবে $৩৩\frac{১}{৩}''$ ইঞ্চি।

তীব্র গান্ধার ॥ আপনারা নিশ্চয়ই ভুলে যান নি যে, মধ্যকালীন জ্ঞানীরা বর্তমানের কোমল গান্ধারকেই শুদ্ধ গান্ধার বলতেন। সেই হিসেবে তাঁদের বিকৃত গান্ধার ছিল আধুনিক কালের শুদ্ধ গান্ধার এবং তাকে বলা হত তীব্র গান্ধার। এই স্বরটির দৈর্ঘ্য ছিল $২৮\frac{২}{৩}''$ ইঞ্চি। কেমন করে?—

ধৈবত থেকে মধ্য সা-এর যে দৈর্ঘ্য ($১৪\frac{২}{৩}''$), তার ঠিক মধ্যস্থলে—মানে $২৮\frac{২}{৩}''$ স্থানে হ'ল তীব্র গান্ধারের অবস্থান। হিসেবটা এইভাবে করতে হবে। প্রথমে সা এবং ধা-এর মধ্যবর্তী তন্ত্রীর দৈর্ঘ্য বার করে নিন। $৩৬ - ২১\frac{১}{৩} = ৩৬ - \frac{৬৪}{৩} = \frac{১০৮-৬৪}{৩} = \frac{৪৪}{৩} = ১৪\frac{২}{৩}$ $\therefore$ মধ্য সা ও ধ-এর মধ্যবর্তী তন্ত্রীর দৈর্ঘ্য হ'ল $১৪\frac{২}{৩}''$ ইঞ্চি।

এবার একে সমান দু' ভাগ করুন।

$১৪\frac{২}{৩} \div ২ = \frac{৪৪}{৩} \div ২ = \frac{৪৪}{৩} \times \frac{১}{২} = \frac{২২}{৩} = ৭\frac{১}{৩}$

$\therefore$ প্রতি মাপের ভাগ হ'ল $৭\frac{১}{৩}''$ ইঞ্চি।

এবার ধ-এর দৈর্ঘ্যের সঙ্গে $৭\frac{১}{৩}''$ যোগ করুন।

$২১\frac{১}{৩} + ৭\frac{১}{৩} = \frac{৬৪}{৩} + \frac{২২}{৩} = \frac{৮৬}{৩} = ২৮\frac{২}{৩}$

$\therefore$ তীব্র গান্ধারের দৈর্ঘ্য হবে $২৮\frac{২}{৩}''$ ইঞ্চি।
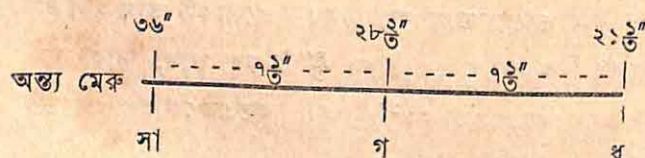
কোমল ধৈবত ॥ শুদ্ধ ধৈবতের মাপ যেমন ষড়্জ-পঞ্চম ভাব অনুসারে বার করা হয়েছিল, কোমল ধৈবতের বেলাতেও সেই নিয়মই অনুসরণ করা হয়েচে। অর্থাৎ কোমল রে থেকে দেড়গুণ উঁচুতে কোমল ধৈবত অবস্থিত।

তাহলে বলুন তো কোমল ঋষভের তন্ত্রীটির দৈর্ঘ্য যদি ৩৩$\frac{১}{৩}$" ইঞ্চি হয়, তাহলে কোমল ধৈবর্তের তন্ত্রীটির দৈর্ঘ্য কত ?

$৩৩\frac{১}{৩} \div ১\frac{১}{২} = \frac{১০০}{৩} \div \frac{৩}{২} = \frac{১০০}{৩} \times \frac{২}{৩} = \frac{১০০ \times ২}{৯} = \frac{২০০}{৯} = ২২\frac{২}{৯}$ ।

∴ কোমল ধৈবত-তন্ত্রীর দৈর্ঘ্য হবে ২২$\frac{২}{৯}$" ইঞ্চি।

তীব্র নিষাদ॥ বর্তমানের যেটি কোমল নি, সেইটিই যে শ্রীনিবাস পণ্ডিতের শুদ্ধ নি ছিল, তা আবার মনে করিয়ে দিতে হবে না বোধহয়। সেই হিসেবে বর্তমানের শুদ্ধ নিষাদকেই তাঁরা বলতেন তীব্র নিষাদ। এর দৈর্ঘ্য নিম্নরূপে বার করা হয়েচে।

মধ্য সপ্তকের শুদ্ধ ধ থেকে তার সপ্তকের সা পর্যন্ত তন্ত্রীর দৈর্ঘ্য হল মোট ৩$\frac{১}{৩}$" ইঞ্চি ($২১\frac{১}{৩} - ১৮ = \frac{৬৪-৫৪}{৩} = \frac{১০}{৩} = ৩\frac{১}{৩}$")। এখন এই ৩$\frac{১}{৩}$ ইঞ্চি তন্ত্রীটিকে সমান তিন ভাগ করুন। প্রত্যেকটি ভাগ হবে ১$\frac{১}{৯}$" ইঞ্চি ($৩\frac{১}{৩} \div ৩ = \frac{১০}{৩} \times \frac{১}{৩} = \frac{১০}{৯} = ১\frac{১}{৯}$)। এবার তার সা-এর দৈর্ঘ্য ১৮" সঙ্গে ডান দিক থেকে যে প্রথম ভাগটি, তাকে যোগ করে দিলে যে সংখ্যাটি পাবেন, সেইটিই হবে তীব্র নিষাদ-তন্ত্রীর দৈর্ঘ্য। $১৮ + \frac{১০}{৯} = \frac{১৬২+১০}{৯} = \frac{১৭২}{৯} = ১৯\frac{১}{৯}$ ।

∴ তীব্র নিষাদ-তন্ত্রীর দৈর্ঘ্য হবে ১৯$\frac{১}{৯}$" ইঞ্চি।
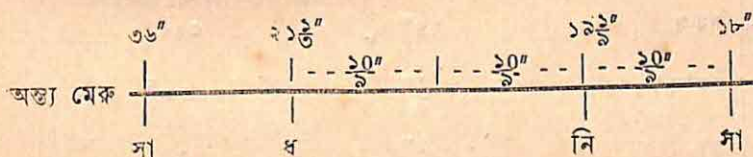
তীব্রতর মধ্যম॥ তীব্র গ ও তার সপ্তকের সা-এর মধ্যবর্তী তন্ত্রীকে সমান তিন ভাগ ক'রে, তার ষড়্জের দিক থেকে প্রথম দুটি ভাগকে তার সা-এর দৈর্ঘ্যের সঙ্গে যোগ করলে তীব্রতর মধ্যম তন্ত্রীর দৈর্ঘ্য জানা যাবে। যেমন,—
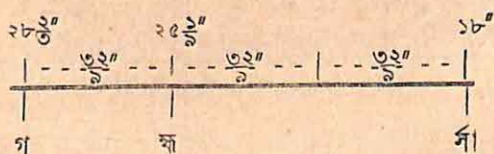
২৮$\frac{২}{৩}$"   ২৫$\frac{১}{৯}$"   ১৮"

| - - $\frac{৩২}{৯}$" - - | - - $\frac{৩২}{৯}$" - - | - - $\frac{৩২}{৯}$" - - |

গ   হ্ম   র্সা

$২৮\frac{২}{৩} - ১৮ = \frac{৮৬}{৩} - ১৮ = \frac{৮৬-৫৪}{৩} = \frac{৩২}{৩} = ১০\frac{৩২}{৯}$"

∴ $১০\frac{২}{৩} \div ৩ = \frac{৩২}{৩} \times \frac{১}{৩} = \frac{৩২}{৯}$

∴ $১৮ + \frac{৩২}{৯} + \frac{৩২}{৯} = ১৮ + \frac{৬৪}{৯} = \frac{১৬২+৬৪}{৯} = \frac{২২৬}{৯} = ২৫\frac{১}{৯}$

∴ তীব্রতর মধ্যমের দৈর্ঘ্য ২৫$\frac{১}{৯}$" ইঞ্চি।

॥ এক নজরে শ্রীনিবাসের শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর-তন্ত্রীর দৈর্ঘ্য ও আন্দোলন সংখ্যা ॥

সংখ্যা	স্বরের নাম	স্বর-তন্ত্রীর দৈর্ঘ্য	স্বরের আন্দোলন সংখ্যা
১	ষড়্জ	৩৬″ ইঞ্চি	২৪০
২	কোমল ঋষভ	৩৩$\frac{১}{৩}$″ „	২৫৯$\frac{১}{৫}$
৩	শুদ্ধ ঋষভ	৩২″ „	২৭০
৪	শুদ্ধ গান্ধার	৩০″ „	২৮৮
৫	তীব্র গান্ধার	২৮$\frac{২}{৩}$″ „	৩০১$\frac{১৭}{৪৩}$
৬	শুদ্ধ মধ্যম	২৭″ „	৩২০
৭	তীব্রতর মধ্যম	২৫$\frac{১}{৯}$″ „	৩২৪$\frac{৮}{১১৩}$
৮	পঞ্চম	২৪″ „	৩৬০
৯	কোমল ধৈবত	২২$\frac{১}{৯}$″ „	৩৮৮$\frac{৪}{৫}$
১০	শুদ্ধ ধৈবত	২১$\frac{১}{৩}$″ „	৪০৫
১১	শুদ্ধ নিষাদ	২০″ „	৪৩২
১২	তীব্র নিষাদ	১৯$\frac{১}{৯}$″ „	৪৫২$\frac{৪}{৪৩}$
১৩	তার সপ্তকের ষড়্জ	১৮″ „	৪৮০

॥ আধুনিক কালের শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর-স্থান ॥

মধ্যকালের সঙ্গীতজ্ঞানী বলতে যেমন পঃ অহোবল ও পঃ শ্রীনিবাসের নাম উল্লেখ করা হয়, আধুনিক কালের পণ্ডিত বলতে তেমনি বোঝান হয় পঃ ভাতখণ্ডেকে। শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরের আন্দোলন ও দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে দুই কালের পণ্ডিতেরা প্রায় একই মত পোষণ করেন। তফাৎ দেখা যায় শুধু কোমল রে, কোমল ধ ও তীব্র ম-এর বেলায়। আর গ ও নি সম্বন্ধে যে মতভেদ উভয়ের মধ্যে আছে, যেমন মধ্যকালে যে গ ও নি-কে বলা হ'ত শুদ্ধ, তাকেই এখন বলা হয় কোমল এবং তখন যা ছিল বিকৃত গ ও নি, এখন তা হয়েচে শুদ্ধ স্বর—আসলে সেটা শুধু নামের, আন্দোলন সংখ্যা ও দৈর্ঘ্যের মধ্যে কোন তফাৎ নেই।

ভাতখণ্ডেজী তাঁর 'অভিনব রাগমঞ্জরী' গ্রন্থে এই তিনটি স্বরের যে হিসেব দিয়েচেন, তা হ'ল নিম্নরূপ।—

কোমল ঋষভ ॥ মধ্য সপ্তকের সা ও শুদ্ধ ঋষভের ঠিক মধ্যস্থলে হ'ল কোমল ঋষভের স্থান অর্থাৎ ৩৪" ইঞ্চিতে। যেমন—মধ্য সা-এর দৈর্ঘ্য ৩৬" এবং শুদ্ধ রে হ'ল ৩২" ইঞ্চি। তাহলে ৩৬ – ৩২ = ৪"। ৪ ইঞ্চিকে ২ ভাগ করলে প্রতি ভাগ হবে ২" করে (৪ ÷ ২ = ২)। এবার শুদ্ধ ঋষভের দৈর্ঘ্যের সঙ্গে ২ যোগ করলেই কোমল ঋষভের দৈর্ঘ্য বেরিয়ে যাবে। ৩২ + ২ = ৩৪ ইঞ্চি।

কিন্তু শ্রীনিবাসের কোমল ঋষভ ছিল $৩৩\frac{১}{৩}$ ইঞ্চিতে।

কোমল ধৈবত ॥ এই স্বরের স্থান হ'ল ভাতখণ্ডেজীর মতে $২২\frac{২}{৩}$" ইঞ্চির ওপর। ইনিও পঃ শ্রীনিবাসের মতই ষড়্জ-পঞ্চম ভাব অনুসারে কোমল ধ-এর স্থান নির্দ্ধারণ করেচেন। কিন্তু যেহেতু ভাতখণ্ডেজীর কোমল রে হ'ল ৩৪ ইঞ্চির ওপর, সেইহেতু তার দেড়গুণ উঁচুতে, মানে—

$$৩৪ \div ১\frac{১}{২} = ৩৪ \div \frac{৩}{২} = \frac{৩৪ \times ২}{৩} = \frac{৬৮}{৩} = ২২\frac{২}{৩}।$$

∴ কোমল ধৈবত হ'ল $২২\frac{২}{৩}$ ইঞ্চির ওপরে অবস্থিত। শ্রীনিবাস এটিকে দেখিয়েছিলেন $২২\frac{২}{৯}$ ইঞ্চিতে।

তীব্র মধ্যম ॥ শুদ্ধ ম ও প-এর ঠিক মধ্যিখানে তীব্র ম-এর স্থান দেখিয়েচেন পঃ ভাতখণ্ডে। শুদ্ধ ম-এর দৈর্ঘ্য ২৭" এবং প-এর দৈর্ঘ্য ২৪" মনে আছে তো? তাহ'লে ২৭ − ২৪ = ৩।

$$\therefore ৩ \div ২ = \frac{৩}{২} = ১\frac{১}{২} \qquad \therefore ২৪ + ১\frac{১}{২} = ২৫\frac{১}{২}$$

∴ তীব্র মধ্যমের অবস্থান হ'ল ২৫$\frac{১}{২}$ ইঞ্চির ওপর।

শ্রীনিবাসের তীব্র মধ্যমের দৈর্ঘ্য ছিল ২৫$\frac{১}{৯}$ ইঞ্চি।

উপরোক্ত তিনটি স্বর ছাড়া আর সব স্বরগুলিরই আন্দোলন সংখ্যা ও দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে উভয় কালের পণ্ডিতেরা একমত।

কিন্তু এতো শুধু তন্ত্রীর দৈর্ঘ্য বার করা হ'ল, ভাতখণ্ডেজীর স্বরের আন্দোলন সংখ্যা তো বার করা হয় নি? মাফ করবেন, এটা কিন্তু আমি কষে দেখাব না। কারণ আগেই আমি আপনাদের শিখিয়ে দিয়েচি যে, কোন স্বরের দৈর্ঘ্য বা আন্দোলন সংখ্যা দেওয়া থাকলে, তার সাহায্যে কী ভাবে আন্দোলন সংখ্যা বা দৈর্ঘ্য অঙ্ক কষে বার করতে হবে। সেই নিয়মে আপনি নিজে অঙ্ক কষে উপরোক্ত তিনটি স্বরের আন্দোলন সংখ্যা বার করে আপনার শিক্ষক মশাইকে দেখিয়ে নিন।

আচ্ছা বেশ, আমি শুধু ঐ স্বর তিনটির আন্দোলন সংখ্যা লিখে দিচ্চি, কিন্তু অঙ্ক কষে সংখ্যাটা মিলিয়ে নেবার ভার দিলাম আপনাদের ওপর।

কোমল রে ॥ দৈর্ঘ্য ৩৪" ॥ আন্দোলন সংখ্যা ২৫৪$\frac{২}{১৭}$
কোমল ধ ॥ „ ২২$\frac{২}{৩}$" ॥ „ „ ৩৮১$\frac{৩}{১৭}$
তীব্র ম ॥ „ ২৫$\frac{১}{২}$" ॥ „ „ ৩৩৮$\frac{১৪}{১৭}$

॥ ভরতের শ্রুত্যন্তর ও সারণা চতুষ্টয়ী ॥

সঙ্গীত শাস্ত্রের সব চাইতে জটিল এবং তর্কপূর্ণ বিষয় হ'ল ভরতের শ্রুত্যন্তর। প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত এই বিষয়টি নিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলচে। কিন্তু এখনো চূড়ান্ত ভাবে এ সম্বন্ধে সর্বসম্মত কোনো মত প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

সমস্যাটির মূল বিষয় হ'ল, ভরতের শ্রুতি-বিভাগ সমান ছিল কিংবা অসমান! এ পর্যন্ত এ সম্বন্ধে দুটি ভিন্ন মত দেখা যাচ্চে। এক মতে ভরতের শ্রুত্যন্তর

(অর্থাৎ শ্রুতির ব্যবধান) সমান ছিল, ভিন্ন মতে ভরতের শ্রুত্যন্তর ছিল তিন রকমের অর্থাৎ অসমান। দুই পক্ষের ব্যক্তিরাই প্রখ্যাত পণ্ডিত। সাধারণ শিক্ষার্থীদের পক্ষে কোন পক্ষের সমাধানকেই অমান্য বা অবজ্ঞা করা সম্ভব নয়। অধিকন্তু, জটিলতার জন্য বেশির ভাগ শিক্ষার্থীই বিষয়টি নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজী নন। তাঁরা মনে করেন, যতদিন এর সর্ববাদী সম্মত মীমাংসা না হচ্চে, ততদিন বিষয়টিকে এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। কিন্তু শিক্ষার্থীদের এরূপ মনোভাব বাঞ্ছনীয় নয়। এতে করে তাঁদের শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হয়। কাজেই বুদ্ধি দিয়ে—বিচার করে—কোনটি যুক্তিপূর্ণ মতবাদ, তা বোঝবার চেষ্টা করা উচিত বলেই আমি মনে করি।...

এবার আসুন, আমরা দেখি, ভরত কী উপায়ে শ্রুত্যন্তর মেপে ছিলেন এবং সারণা চতুষ্টয় বস্তুটিই বা কি !—

ভরতমুনি (৫ম শতাব্দী) শ্রুত্যন্তর মাপার জন্য দুটি বীণা যন্ত্রের সাহায্য নিয়েছিলেন। দুটি বীণাতেই বাইশটি (মতান্তরে সাতটি) পৃথক তন্ত্রী বা তার পরাণো হ'ল এবং দুটি বীণাতেই স্বর বাঁধা হ'ল প্রাচীন কালের ষড়্‌জ-গ্রাম অনুসারে। অর্থাৎ সা রে গ ম প ধ ও নি স্বর সাতটিকে যথাক্রমে ৪, ৭, ৯, ১৩, ১৭, ২০ ও ২২শ সংখ্যক শ্রুতির ওপর বাঁধা হ'ল। আপনাদের বোধ হয় মনে আছে, প্রাচীন কালের শুদ্ধ স্বর-স্থান এই রকমই ছিল (সঙ্গীত পরিচিতি ॥ পূর্বভাগ ॥ প্রথম সংস্করণ ॥ পৃষ্ঠা ১২ দেখুন)। অতঃপর একটি বীণাকে তিনি এই স্বর বাঁধা অবস্থাতেই সরিয়ে রেখে দিলেন। এবং অপর বীণাটিকে নিয়ে আরম্ভ করলেন তাঁর পরীক্ষা। প্রথম বীণাটিকে বলা হ'ল 'অচল বীণা'। কারণ এর তন্ত্রীগুলি একই ভাবে বাঁধা থাকবে, তার মধ্যে কোন নড়-চড় হবে না। দ্বিতীয় বীণাটির নাম দিলেন 'চল বীণা'। এই বীণায় বাঁধা তন্ত্রীগুলির পরিবর্তন ঘটিয়েই তিনি শ্রুতির ব্যবধান মেপে দেখবেন। অর্থাৎ এই বীণার তারগুলি নড়া-চড়া করবে।

সারণা শব্দটির আভিধানিক অর্থ হ'ল চালনা। আমার মনে হয়, এখানেও একই অর্থে সারণা শব্দটির ব্যবহার করা হয়েচে। কারণ বাইশটি শ্রুতির মধ্যে স্বরগুলিকে চার রকম ভাবে চালনা করেই স্বর-স্থান নির্ণয় করা হয়েচে। সেই জন্যই এই প্রক্রিয়াকে বলা হয়েচে সারণা চতুষ্টয়ী। এখন দেখা যাক, চারটি সারণা তিনি কী ভাবে করলেন।—

প্রথম সারণায় তিনি শুধু পঞ্চম স্বরটিকে স্থানভ্রষ্ট করে, ১৭শ শ্রুতির বদলে নিয়ে এলেন ১৬শ শ্রুতির ওপরে। অর্থাৎ মূল ষড়্জ গ্রামে স্বরগুলি যেভাবে অবস্থিত, প্রথম সারণার স্বরগুলির সঙ্গে তা'র তফাৎ হয়ে যাচ্চে শুধু পঞ্চমের। ষড়্জ গ্রামের পঞ্চম থেকে প্রথম সারণার পঞ্চম হ'ল এক শ্রুতি কম।

"গ্রাম ও মূর্চ্ছনা" পড়বার সময় আমরা দেখেছিলাম, ষড়্জ গ্রাম ও মধ্যম গ্রামের মধ্যে তফাৎ ছিল শুধু পঞ্চমের। সেখানেও ষড়্জ গ্রামের পঞ্চম থেকে মধ্যম গ্রামের পঞ্চম ছিল মাত্র এক শ্রুতি কম। তাহ'লে প্রথম সারণাটি এখন হয়ে গেল মধ্যম গ্রামের সমান।

তারপর ভরত পঞ্চম স্বরটির মত অন্যান্য স্বরগুলিকেও এক শ্রুতি কম করে দিলেন। এবার প্রথম সারণার চেহারাটা হয়ে গেল—৩য় শ্রুতিতে—সা, ৬ষ্ঠ শ্রুতিতে—রে, ৮ম শ্রুতিতে—গ, ১২ শ্রুতিতে—ম, ১৬শ শ্রুতিতে—প, ১৯শ শ্রুতিতে—ধ ও ২১শ শ্রুতিতে নি। (পর পৃষ্ঠার নক্সাটি দেখুন)।

দ্বিতীয় সারণায় আবার তিনি প্রথম সারণা অপেক্ষা প্রত্যেকটি স্বরকে ১ শ্রুতি ক'রে নাবিয়ে দিলেন। অর্থাৎ সা এল ২য় শ্রুতিতে, রে—৫ম শ্রুতিতে, গ—৭ম, ম—১১শ, প—১৫শ, ধ—১৮শ ও নি—২০শ শ্রুতির ওপর। দেখা যাচ্চে. দ্বিতীয় সারণার গান্ধার ও নিষাদ বসেচে এসে যথাক্রমে ষড়্জ গ্রামের ঋষভ ও ধৈবতের স্থানে। অর্থাৎ দ্বিতীয় সারণার গ ও নি স্বরের মূল্যমান ষড়্জ গ্রামের রে ও ধ-এর সমান। (প্রদত্ত নক্সাটি দ্রষ্টব্য)।

তৃতীয় সারণার স্বরগুলিকে, দ্বিতীয় সারণা থেকে আরো এক-এক শ্রুতি নাবিয়ে দেওয়া হ'ল। এবার দেখা যাচ্চে, ষড়্জ গ্রামের সা ও প-এর স্থানে বিরাজ করচে তৃতীয় সারণার রে ও ধ। অর্থাৎ ষড়্জ গ্রামের সা ও প এবং তৃতীয় সারণার রে ও ধ একই মানের। (নক্সাটি দেখুন)।

চতুর্থ সারণায় তিনি স্বরগুলিকে তৃতীয় সারণা অপেক্ষা আরো এক শ্রুতি কমিয়ে দিলেন। এবার সা রে গ ম প ধ ও নি স্বরগুলি অবস্থিত হ'ল যথাক্রমে ২২, ৩, ৫, ৯, ১৩, ১৬ ও ১৮ শ্রুতির ওপর। এবার আমরা দেখতে পাচ্চি, ষড়্জ গ্রামের (বা অচল বীণার) গ ও ম স্বরের ওপর এসে বসেচে চতুর্থ সারণার ম ও প স্বর দুটি। অর্থাৎ ষড়্জ গ্রামের গ ও ম-এর মূল্যমান চতুর্থ সারণার ম ও প-এর অনুরূপ। এক নজরে দেখার সুবিধের জন্য সারণা চতুষ্টয়ের স্বর বিভাজনের একটি নক্সা দেওয়া হ'ল।—

॥ সারণা চতুষ্টয়ের নক্সা ॥

শ্রুতি সংখ্যা	অচল বীণার স্বর-স্থাপনা	চল বীণার স্বর-স্থাপনা	চল বীণার সারণা চতুষ্টয়			
			১ম সারণা	২য় সারণা	৩য় সারণা	৪র্থ সারণা
২২ ...	নি ...	নি ...	... ...	... ...	... ...	সা
১ ...	... ...	... ...	... ...	... ...	সা ...	...
২ ...	... ...	... ...	... ...	সা ...	... ...	...
৩ ...	... ...	... ...	সা ...	... ...	... ...	রে
৪ ...	সা ...	সা ...	... ...	... ...	রে ...	...
৫ ...	... ...	... ...	... ...	রে ...	.. ...	গ
৬ ...	... ...	... ...	রে ...	... ...	গ ...	...
৭ ...	রে ...	রে ...	... ...	গ ...	... ...	...
৮ ...	... ...	... ...	গ ...	... ...	... ...	...
৯ ...	গ ...	গ ...	... ...	... ...	... ...	ম
১০ ...	... ...	... ...	... ...	... ...	ম ...	...
১১ ...	... ...	... ...	... ...	ম ...	... ...	...
১২ ...	... ...	... ...	ম ...	... ...	... ...	...
১৩ ...	ম ...	ম ...	... ...	... ...	... ...	প
১৪ ...	... ...	... ...	... ...	... ...	প ...	...
১৫ ..	... ...	... ...	... ...	প ...	... ...	...
১৬ ...	... ...	... ...	প ...	... ...	... ...	ধ
১৭ ...	প ...	প ...	... ...	... ...	ধ ...	...
১৮ ...	... ...	... ...	... ...	ধ ...	... ...	নি
১৯ ...	... ...	... ...	ধ ...	... ...	নি ...	
২০ ...	ধ ...	ধ ...	... ...	নি ...		
২১ ...	... ...	... ...	নি ...			
২২ ...	নি ...	নি ...				

এই শ্রুতি-স্বর বিভাজনকে ভিত্তি করেই পণ্ডিতেরা নানা ক্যালক্লাস ঘটিত ক্যালকুলেশন ক'রে কেউ বলচেন ভরতের শ্রুতি-ব্যবধান সমান ছিল, কেউ বলচেন অসমান ছিল। আরো উঁচু ক্লাসে (এম. ম্যুজ.) গেলে এ সম্বন্ধে আরো নতুন তথ্য জানা যাবে।

——

॥ জাতি গান ॥

আমরা আগেই জেনে এসেচি (পূর্ব ভাগ ॥ সঙ্গীতের ইতিবৃত্ত দ্রষ্টব্য) যে, প্রাচীন কালে 'রাগ' বলে কোন শব্দ ছিল না। ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রেও (৪০০—৫০০ খৃঃ) 'রাগ' বলে কোন কিছুর উল্লেখ নেই। রাগ-নাম দিয়ে গাইবার রীতি প্রচলিত হয়েচে পরে। এই শব্দটির উল্লেখ প্রথমে পাওয়া যায় মতঙ্গমুনির "বৃহদ্দেশী" গ্রন্থে (৬০০ খৃঃ)। কিন্তু ইনি যে গ্রাম-রাগের কথা বলেচেন, সে রাগ কিন্তু আজকের মত ছিল না।

রাগ গাইবার রীতি প্রচলিত হবার আগে জাতি গানের প্রচলন ছিল। জাতির উৎপত্তি হয়েছিল মূর্ছনা থেকে। মূর্ছনার পরিচয় আমরা আগেই পেয়েচি। মনে রাখতে হবে, এই জাতির অর্থ কিন্তু বর্তমান ঔড়ব-ষাড়ব প্রভৃতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

নাট্যশাস্ত্রে মোট আঠার রকম জাতির উল্লেখ আছে। তার মধ্যে সাতটি ছিল শুদ্ধ জাতি এবং এগারটি বিকৃত জাতি। শুদ্ধ জাতির লক্ষণে গ্রহ, অংশ, ন্যাস, অপন্যাস, ষাড়বত্ব, ঔড়বত্ব, অল্পত্ব, বহুত্ব, মন্দ্র ও তার প্রভৃতির উল্লেখ আছে। এগুলির অতিরিক্ত শুদ্ধ জাতিকে সব সময় সম্পূর্ণ থাকতে হবে এবং তার-স্থানে ন্যাস করা চলবে না।

সাতটি শুদ্ধ জাতির নাম ছিলঃ ষাড়্জী, আর্ষভী, ধৈবতী, নিষাদী, গান্ধারী, মধ্যমা ও পঞ্চমী। এর মধ্যে প্রথম চারটি হ'ল ষড়্জ গ্রাম জাত, বাকী তিনটি উদ্ভুত মধ্যম গ্রাম থেকে।

এগারটি বিকৃত জাতির উদ্ভব হয়েছিল ষড়্জ ও মধ্যম গ্রামের জাতিগুলির সংমিশ্রণে।

সাতটি শুদ্ধ জাতি থেকে আবার মোট .৫৩টি বিকৃত জাতি রচিত হয়েছিল। এই বিকৃত জাতিগুলি কিন্তু উপরোক্ত ১৮টি বিকৃত জাতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ১৫৩টি বিকৃত জাতিকে বলা হত "শুদ্ধ-বিকৃত" জাতি। ষাড়্জী নামক শুদ্ধজাতি থেকে ১৫টি এবং অন্যান্য প্রত্যেকটি জাতি থেকে ২৩টি "শুদ্ধ-বিকৃত" জাতির জন্ম হয়েছিল। অর্থাৎ ১×১৫=১৫ এবং ৬×২৩=১৩৮ মোট ১৫+১৩৮=১৫৩টি।

॥ রত্নাকরের দশবিধি ॥

প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞানী শার্ঙ্গদেব তাঁর বিখ্যাত "সঙ্গীত রত্নাকর" গ্রন্থে মার্গ ও দেশী সঙ্গীতের দশটি বিভাগের উল্লেখ করেচেন। এই বিভাগ দশটির মধ্যে মার্গ সঙ্গীতের ছিল ছয়টি এবং দেশী সঙ্গীতের ছিল মোট চারটি বিভাগ।

মার্গ সঙ্গীতের ছয়টি বিভাগের নাম ছিল ঃ গ্রাম রাগ, জাতি রাগ, উপরাগ, ভাষা রাগ, বিভাষা রাগ ও অন্তরভাষা রাগ এবং দেশী সঙ্গীতের চারটি ভাগ হ'ল ঃ রাগাঙ্গ, ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ ও উপাঙ্গ রাগ। এই বিভাগগুলির সঠিক বর্ণনা আজ করা কঠিন। তবে সাধারণ্যে প্রচলিত মত অনুসারে নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাগুলি দেওয়া হ'ল।—

আমরা আগেই জেনে এসেচি যে, প্রাচীন কালে "রাগ" বলে কিছু ছিল না। "রাগ" শব্দের উল্লেখ আমরা প্রথমে পেয়েছিলাম ৬০০ খৃষ্টাব্দে—মতঙ্গ মুনির "বৃহদ্দেশী" গ্রন্থে। "রাগ"-রীতি প্রচলিত হবার আগে গাওয়া হ'ত "জাতি গান"। জাতি গানের জন্ম হয়েছিল মূর্চ্ছনা থেকে আর জাতি গান থেকেই পরবর্তীকালে জন্মলাভ করেছিল "গ্রাম রাগ"।

মার্গ সঙ্গীতের পদগুলিতে যে বিভিন্ন রীতিতে স্বর যোজনা করা হ'ত, তারই পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য অনুসারে শার্ঙ্গদেব গ্রাম রাগ, উপরাগ, ভাষা রাগ, বিভাষা রাগ ও অন্তরভাষা রাগে সেগুলিকে বিভক্ত করেছিলেন। "রত্নাকর" গ্রন্থে বলা হয়েচে, শুদ্ধা, ভিন্না, গৌড়ী, সাধারণী ও বেসরা—এই পাঁচ রকম গীতের অন্তর্ভুক্ত মোট ত্রিশ প্রকারের রাগ ছিল। তাছাড়া রাগ ছিল ২০টি, উপরাগ ৬, ভাষারাগ ৯৬, বিভাষা রাগ ২০ ও অন্তর ভাষা রাগের প্রকার ছিল ৪টি।

দেশী সঙ্গীতের বিভাগগুলির বৈশিষ্ট্য ছিল নিম্নরূপ।—

সমস্ত নিয়ম পালন ক'রে শুদ্ধভাবে যে রাগ গাওয়া হ'ত, তাকে বলা হ'ত রাগাঙ্গ রাগ।

রাগাঙ্গের কোন রাগের স্বর পরিবর্তন করে গাইলে সেগুলি পড়ত উপাঙ্গ রাগের মধ্যে।

স্থান ভেদে যে সব গানের মধ্যে ভাষার পরিবর্তন ঘটত এবং গীতশৈলীর মধ্যেও থাকত কিছু ভিন্নতা—অথচ শাস্ত্রীয় নিয়মগুলি লঙ্ঘিত হ'ত না, সেই গানগুলি পড়ত ভাষাঙ্গ রাগ-এর পর্যায়ে।

ক্রিয়াঙ্গ রাগের অন্তর্ভুক্ত হ'ত সেই গানগুলি, যার মধ্যে সমস্ত নিয়ম পালন করা হলেও, রাগে ব্যবহৃত হয় না এমন কোনো স্বরও প্রয়োগ করা হ'ত শ্রুতি মাধুর্যের জন্য।

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলির সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। তবে বহুল প্রচারিত মতই এখানে অনুসৃত হয়েছে।

॥ রাগ-রাগিণী পদ্ধতি ॥

উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের রাগগুলিকে আজ যে পদ্ধতিতে বর্গীকরণ (বিভক্তি-করণ) করা হয়েচে, আগের কালের ভাগগুলি সেভাবে ছিল না। যাঁরা গান-বাজনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন, তাঁরাও 'ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী' কথাটি জানেন। কিন্তু আজকাল আর রাগিণী বলে কিছু নেই, সবই পুংলিঙ্গ হয়ে গেচে। এই বিবর্তনের ইতিহাস এবার আলোচনা করব।

সঙ্গীতের ইতিবৃত্ত পড়ার সময় আপনারা জেনেছিলেন যে 'রাগ' শব্দটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় মতঙ্গ মুনির (৬০০ খ্রীষ্টাব্দে) "বৃহদ্দেশী" গ্রন্থে। তার আগে রাগ গাওয়া হ'ত না। আর মতঙ্গ মুনি বর্ণিত রাগও আজকের রাগের মত ছিল না। কাজেই আমরা যে রাগ-রাগিণীর বর্গীকরণ সম্বন্ধে জানতে চাইচি, তা প্রাচীন কালের হলেও আদি কালের বস্তু নয়।

প্রাচীন কালে প্রায় এক হাজার রাগ-রাগিণী প্রচলিত ছিল। পরিচয়ের সুবিধের জন্য, এগুলিকে মূলতঃ ৬টি রাগ ও ৩৬টি রাগিণীতে ভাগ করে নেওয়া হয়েছিল। আর বাকিগুলিকে পুত্র রাগ, পুত্রবধূ রাগিণী প্রভৃতি নামে চিহ্নিত করা হ'ত। এই ভাগের মধ্যে যে মতভেদ ছিল, তারই মধ্যে আবার চারটি মাত্র পৃথক মত সর্বাধিক প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। (১) সোমেশ্বর বা শিব মত। (২) ব্রহ্মা মত। (৩) ভরত মত। (৪) হনুমান মত। এঁরা প্রত্যেকেই ছ'টি করে রাগ মেনেচেন। আর এই রাগগুলির রচনা করা হয়েছিল আমাদের দেশের প্রাকৃতিক ঋতুর উপযোগী ক'রে। যেমন—দীপক (গ্রীষ্ম), মেঘ (বর্ষা), ভৈরব (শরৎ), মালকোষ (হেমন্ত), শ্রী (শীত) ও হিণ্ডোল (বসন্ত)।

উক্ত ছয়টি রাগ-নাম সম্বন্ধেও উপরোক্ত পণ্ডিতেরা একমত ছিলেন না। নিচে প্রত্যেক মতের রাগ-নাম দেওয়া হচ্ছে :—

॥ সোমেশ্বর বা শিবমত ॥

(১) শ্রী. (২) বসন্ত, (৩) পঞ্চম, (৪) মেঘ, (৫) ভৈরব, (৬) নটনারায়ণ।

॥ ভরত-মত ॥

(১) দীপক, (২) মেঘ, (৩) ভৈরব, (৪) মালকোষ, (৫) শ্রী, (৬) হিণ্ডোল।

ব্রহ্মা ও হনুমান মত যথাক্রমে সোমেশ্বর ও ভরতেরই অনুরূপ। কিন্তু রাগিণীর নামগুলি সম্বন্ধে এঁরা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী। এই পদ্ধতি বহুকাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

এরপর ১৭শ শতাব্দীতে পঃ সোমনাথ রাগগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। এই ভাগের নাম হ'ল '১) শুদ্ধ, (২) ছায়ালগ ও (৩) সংকীর্ণ।

(১) যে রাগগুলি সম্পূর্ণ ভাবে শাস্ত্রসম্মত নিয়ম-কানুন অবলম্বন ক'রে রাগের বিশুদ্ধতা বজায় রেখে পরিবেশিত হত, তাকে বলা হ'ত **শুদ্ধ রাগ**।

(২) যে রাগগুলিতে অন্য কোন রাগের সামান্য ছায়া স্পর্শ করত, সেই রাগগুলি ছিল **ছায়ালগ** পর্যায়ের।

(৩) **সংকীর্ণ** রাগ বলা হ'ত সেই রাগগুলিকে, অধিকতর রঞ্জকতার জন্য যার মধ্যে শুদ্ধ ও ছায়ালগের সংমিশ্রণ ঘটানো হ'ত।

এই বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় পঃ সোমনাথকৃত 'রাগবিবোধ' গ্রন্থে।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে পাটনার এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান মুহম্মদ রজা সাহেব তাঁর "নগমাতে আসফী" গ্রন্থে উপরোক্ত মতের অযৌক্তিকতা দেখান। তিনি বলেন, উক্ত মতগুলি অবৈজ্ঞানিক। রাগ ও রাগিণীগুলির মধ্যে স্বরের কোন সমতা দেখা যায় না। অতঃপর তিনি নতুন ভাবে ছ'টি রাগ ও প্রত্যেক রাগের ছ'টি ক'রে রাগিণী—মোট ৬ রাগ, ৩৬ রাগিণী করে বিভক্ত করেন।

কিন্তু এঁরা সকলেই রাগের স্বরূপকে আধার করে এই বর্গীকরণ করেছিলেন। কোথাও রাগের স্বরসাম্য অনুসারে বর্গীকরণ করা হয় নি। আধুনিক কালে পঃ বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে প্রথম এই পদ্ধতির পরিবর্তন করেন। তিনি বলেন, প্রাচীনকালে প্রচলিত রাগগুলির সঙ্গে বর্তমানের রাগগুলির নামের মিল ছাড়া আর কিছুরই মিল নেই। কাজেই পূর্বের নিয়মকে এখনো আঁকড়ে রাখার কোন মানে হয় না। তাই তিনি ঠাট-রাগ পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। দক্ষিণ ভারতের বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞানী পঃ ব্যঙ্কটমখীর ৭২ ঠাটকে অনুসরণ করে

তিনি এই পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। বর্তমানে সারা উত্তর ভারতে তাঁরই অনুসৃত মোট দশটি ঠাট প্রতিষ্ঠা লাভ করেচে। এই দশটি ঠাটের স্বরসাম্য ও স্বরূপসাম্য অনুসারেই হিন্দুস্থানী পদ্ধতির সমস্ত রাগগুলিকে এই ঠাটপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েচে। সেই ১০টি ঠাটের নাম আপনারা আগেই জেনে এসেচেন। যেমন, বিলাবল, কল্যাণ, খমাজ, কাফী, আসাবরী, ভৈরবী, ভৈরব টোড়ী, পূর্বী ও মারোয়া। অবশ্য এ কালের অনেক গুণীরই এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

উপরোক্ত তিনটি ভাগ ছাড়া কিছুকাল পূর্বে বোম্বাইয়ের স্বর্গীয় নারায়ণ মোরেশ্বর খরে কর্তৃক আরেকবার রাগাঙ্গ পদ্ধতিতে আরেক ভাবে রাগগুলির বর্গীকরণ হয়েছিল। ইনি স্বর্গীয় পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর পলুস্করের ছাত্র ছিলেন। এই রাগাঙ্গ পদ্ধতিতে তিনি প্রধানত রাগের স্বরূপ ও চলনের প্রতি লক্ষ্য রেখে তিরিশটি মুখ্য রাগের অন্তর্গত অন্য সব রাগগুলিকে বিভক্ত করেছিলেন। কিন্তু এ পদ্ধতি তেমন প্রচলিত হতে পারে নি। এ যুগে ভাতখণ্ডেজীর ঠাট পদ্ধতিই সর্বাধিক স্বীকৃতি পেয়েচে।

॥ ধ্রুপদ গানের চারটি বাণী ॥

ধ্রুপদ গীত-শৈলীর পরিচয় প্রসঙ্গে (সঙ্গীত পরিচিতি—পূর্বভাগ দ্রষ্টব্য) বলেছিলাম, ধ্রুপদ-গায়কেরা চারটি বিভিন্ন বাণীতে ধ্রুপদ গান পরিবেশন করতেন। এই চারটি বাণীর নাম ছিল ডাগুরবাণী, খাণ্ডারবাণী, গওরার (বা গওহর বা গোবরহার) বাণী ও নওহর বাণী। ধ্রুপদ গানের সৃষ্টি পর্ব নিয়ে যেমন নানা মতভেদ আছে, এই বাণী চারটির আবিষ্কর্তা বা প্রবর্তক সম্বন্ধেও তেমনি মতভেদের অন্ত নেই।

কোন মতে বলা হয়, আকবর বাদশাহের দরবারে যে বিভিন্ন স্থানের গুণী কলাবন্তেরা (ধ্রুপদ গায়কেরা) বিরাজ করতেন, তাঁদের মধ্যে গোয়ালিয়রবাসী গায়কশ্রেষ্ঠ তানসেন, তস্য জামাতা খাণ্ডার গ্রামনিবাসী প্রসিদ্ধ বীণকার সমোখন সিংহ (পরে নওবদ খাঁ), ডাগুর গ্রামনিবাসী গুণীবর বৃজচন্দ্, নওহার গ্রামনিবাসী গুণী শ্রীচন্দ্-এর নিবাস স্থানের নামানুসারে উক্ত চার বাণীর নামকরণ করা হয়েচে। "মাদনুল-মওসিকী" নামক (উর্দু) গ্রন্থ রচয়িতা হকীম মোহম্মদ এই মতালম্বী। তিনি আরো বলেন যে, তানসেন যেহেতু ইসলাম ধর্ম

গ্রহণের পূর্বে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, সেইহেতু তাঁর প্রবর্তিত বাণীর নামকরণ হয়েছিল গওরার বা গোবরহার। এই কথাটা যেন কেমন একটু বেস্থরা মনে হয়। এ সম্বন্ধে প্রথম কথা এই যে, তানসেন গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন না। দ্বিতীয়, অন্যান্য বাণীর বেলায় যেমন গুণীদের নিবাস স্থানের নাম অনুসারে বাণীর নাম হয়েছিল, তানসেনের বেলায় গোয়ালিয়রের সম্বন্ধযুক্ত নামের পরিবর্তে তাঁর ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শ্রেণী অনুসারে নামকরণ হল কেন? যদি বলা হত গোয়ালিয়র থেকে গওরার, তাহলে বরং যুক্তিপূর্ণ হত।

আরেক মতে গওরার বাণীর প্রবর্তক ছিলেন নায়ক কুম্ভনদাসের বংশের কেউ। তানসেনের বাণীকে এঁরা বলেন 'সেনীবাণী'। খাণ্ডার বাণীর প্রবর্তক সম্বন্ধে এঁরা পূর্ববর্তীদের সঙ্গে একমত হলেও ডাগুর ও নওহার বাণী সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করেন। এঁরা বলেন, ডাগুর ও নওহার বাণীর প্রবর্তক ছিলেন যথাক্রমে হরিদাস ডাগুর এবং স্থজান দাস (স্থজান খাঁ)।

আবার কোন কোন ভিন্ন মতাবলম্বীদের ধারণা, প্রাচীন কালে যখন প্রবন্ধ গীতির প্রচলন ছিল, সে সময় শুদ্ধা, ভিন্না, বেসরা, গৌড়ী ও সাধারণী নামে যে পাঁচটি বিভিন্ন গীতি-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, পরবর্তী কালে—ধ্রুপদ গীতির আমলে —ঐ পাঁচটি পদ্ধতি থেকেই স্পষ্ট হয়েচে উক্ত বাণী চতুষ্টয়। এই মতের স্বপক্ষে যে যুক্তি দেখান হয়, তা নেহাৎ তাচ্ছিল্য করার মত নয়।—

ডাগুর বাণীর সঙ্গে প্রাচীন শুদ্ধা পদ্ধতির মিল ছিল। প্রাচীন শুদ্ধা গীতি পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, স্বরগুলি ছিল সরল অনাড়ম্বর এবং স্থললিত। এর মধ্যে ছিল না কোনরূপ অলঙ্কার, মীড়, গমক, কণ প্রভৃতি সাঙ্গীতিক পরিভাষার মারপ্যাচ। ডাগুরবাণীর ধ্রুপদ সম্বন্ধেও বলা হয় যে, এই বাণীর প্রধান বৈশিষ্ট্য সরলতা।

খাণ্ডার বাণীর সঙ্গে মিল পাওয়া যায় প্রাচীন গৌড়ী পদ্ধতির। যে গীতি-পদ্ধতিতে স্বরগুলিকে তিনটি সপ্তকেই স্থচারু রূপে তথা অখণ্ড ভাবে ব্যবহার করা হত, তাকেই বলা হত গৌড়ী পদ্ধতি।

গওরার বাণী ছিল ধীর শান্ত প্রকৃতির। লয়কারীর নামে কতগুলি লম্ফ-ঝম্ফ এতে ছিল না। এর সঙ্গে অনেকে ভিন্না গীতি পদ্ধতির সামঞ্জস্য আছে বলে মনে করেন। ভিন্না পদ্ধতিতে অবশ্য উল্লম্ফনাদি আছে, যা গওরার বাণীতে নেই।

নওহর বাণীর সঙ্গে মিল ছিল বেসরা পদ্ধতির। বেসরার বৈশিষ্ট্য ছিল

বৈচিত্র্যযুক্ত করে স্বরগুলিকে দ্রুতলয়ে আরোহণ-অবরোহণ করা। অনেকে বলেন, নওহর বাণীর মধ্যে নাহর—মানে সিংহের গতির অনুকরণ করা হত। এক স্বর থেকে পরবর্তী কোন স্বরে যাওয়ার সময় মাঝের দু-তিনটি স্বরকে লঙ্ঘন করে যাওয়াই ছিল এর বৈশিষ্ট্য। এরূপও বলেন অনেকে যে নওহর বাণীতে নব রসের সমন্বয় করা হত বলে এই বাণীকে নওহর বাণী বলা হ'ত।

এই হ'ল চারটি বাণীর মোটামুটি পরিচয়।—আজকাল যে ধ্রুপদ গাওয়া হয় তার মধ্যে প্রায়ই উক্ত বাণীগুলির বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত থাকে, তবে আত্মাভিমান বজায় রাখার জন্য অনেকেই বাণীগুলির নাম উল্লেখ করে থাকেন বটে।

॥ কণ্ঠ সঙ্গীতে বিভিন্ন ঘরানা ও তার বিকাশ ॥

"ঘরানা" শব্দটি প্রচলিত হয়েচে তানসেন-পরবর্তী যুগে। এই শব্দটির অর্থ অনুধাবন করতে গিয়ে দেখা গেচে যে, কোন বিশিষ্ট গায়ক যখন রাগ সঙ্গীত পরিবেশনের সময় রাগের শাস্ত্রীয় নিয়মাদি পালন করেও তাঁর গায়কীতে নিজস্ব ব্যক্তিত্ব, পাণ্ডিত্য, রসোপলব্ধী প্রভৃতির বিশেষ স্বাক্ষর রেখে যান, তখন তাঁর সেই প্রতিভা-সঞ্জাত নতুন শৈলীর (style) গায়কীকে তাঁর ঘরানা বলে চিহ্নিত করা হয়। আর বংশ এবং শিষ্য পরম্পরায় এই ঘরানার প্রচার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। মনে করুন দুজন শিল্পী মালকোষ রাগে খেয়াল গাইলেন। কিন্তু পরিবেশন পদ্ধতি, মানে গাইবার 'স্টাইল' বা গায়কী, দু'জনার দু'রকম। সমঝদার শ্রোতারা বললেন, একজন কিরানা ঘরানার এবং অপরজন পাতিয়ালা ঘরানার শিল্পী। এই ভাবে, গায়ন শৈলীর এই বিভিন্নতার জন্য শুধু খেয়ালই নয়,—ধ্রুপদ ও ঠুমরীর ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ঘরানার সৃষ্টি হয়েচে। আমরা একে একে এই ঘরানাগুলি ও তাদের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করব।

ধ্রুপদ গানের ঘরানা সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হয়েচে। এই শৈলীর গান যে চার রকম রীতিতে গাওয়া হত, তাকে অবশ্য ঘরানা বলা হত না। কারণ, আগের কালে "ঘরানা" শব্দটির প্রচলন ছিল না। সে সময় বলা হত বাণী। কিন্তু আসল ব্যাপারটা সেই একই অর্থাৎ ঘরানা বলতে যা বোঝায়—

তাই। এবার আমরা খেয়াল গানের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘরানা সম্বন্ধে আলোচনা করব।

১॥ গোয়ালিয়র ঘরানা॥ স্বর্গীয় উস্তাদ নথন খাঁ পীরবক্স-এর সময় থেকে নাকি এই ঘরানার উদ্ভব হয়।

নথন পীরবক্স ছিলেন লক্ষ্ণৌ-এর অধিবাসী। তাঁর পিতার নাম ছিল মক্ষন (মাখন) খাঁ। ইনিও সে সময়ে গায়ক হিসাবে লক্ষ্ণৌতে বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। আর সেই সময় শক্কর (চিনি) খাঁ নামে লক্ষ্ণৌ-এর আরেক শিল্পীর সঙ্গে তাঁর বিশেষ রকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা হ'ত। ফলে যেমন হয়ে থাকে, পরস্পরবিরোধী দুটি দলের মধ্যে ক্রমেই শত্রুতাও বাড়তে লাগল আর এই শত্রুতা পরিশেষে এমন এক পর্যায়ে উঠল, যার ফলে পীরবক্সের পুত্র কাদেরবক্স নিহত হলেন শক্কর খাঁ-এর দলের হাতে। পীরবক্স এই শোক সামলাতে না পেরে, তাঁর পৌত্র পিতৃহীন হস্সু খাঁ ও হদ্দু খাঁকে নিয়ে লক্ষ্ণৌ ত্যাগ করে চলে যান গোয়ালিয়রে। গোয়ালিয়র সে সময়ে ছিল সারা ভারতের একটি প্রধান সঙ্গীত-তীর্থ। অতঃপর বাকী জীবনটা গোয়ালিয়র দরবারে কাটিয়ে, ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বভাগে তিনি দেহত্যাগ করেন। এই জন্যই তাঁর ঘরানাকে গোয়ালিয়র ঘরানা বলে চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তীকালে এই হস্সু ও হদ্দু খাঁ ভ্রাতৃদ্বয় নিজেদের প্রতিভাবলে তদানিন্তন ভারতের উচ্চশ্রেণীর গায়করূপে যশ ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং নিজেদের ঘরানার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এই ঘরানার গানের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এঁরা ধ্রুপদ অঙ্গের খেয়াল গাইতেন এবং "বহ্‌লওয়া" নামক এক বিশিষ্ট রীতিতে স্বর বিস্তার করতেন। গমক-যুক্ত উদাত্ত মধুর কণ্ঠে গীত পরিবেশনে এই ঘরানার দক্ষতা ছিল অসামান্য। তাছাড়া অবরোহ গতির জটিল তান, সপাট তান ও সুন্দর সুন্দর লয়কারীতে বোলতানের প্রয়োগও এই ঘরানার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল।

এই ঘরানার প্রতিনিধি হিসাবে নাম করা যায়—শঙ্কর রাও পণ্ডিত ও তাঁর পুত্র কৃষ্ণরাও পণ্ডিত, পঃ বিষ্ণুদিগম্বর পলুস্কর, রাজা ভইয়া পুছওয়ালে, উস্তাদ মুস্তাক হুসেন খাঁ (রামপুর) প্রভৃতি। এঁদের পরবর্তী বংশধরেরা এই ঘরানার বৈশিষ্ট্য কতখানি রাখতে পেরেচেন, তা গুণী সমাজই বিচার করবেন।

২॥ আগরা ঘরানা॥ এই ঘরানার উল্লেখ করতে গেলে প্রথমেই

আমাদের মনে আসে খাঁ সাহেব উস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ এবং উস্তাদ বিলায়ৎ হুসেন খাঁর নাম। বিলায়ৎ হুসেন খাঁর পিতা নত্থন খাঁ সাহেবও (১৮৪০-১৯০০ খৃঃ) ছিলেন এই ঘরানার একটি উজ্জ্বল রত্ন।

অনেকে বলেন, এই ঘরানার প্রথম প্রবর্তক ছিলেন হাজি সুজান খাঁ সাহেব। তারপর এর বহুল প্রচার করেন গগ্‌গে খোদাবক্স—যিনি আগে গোয়ালিয়রে নত্থন পীরবক্সের কাছে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়ে পরে চলে আসেন আগরায় এবং গোয়ালিয়র ঘরানার সঙ্গে নিজ শৈলীর সংমিশ্রণে আগরা ঘরানার শৈলীকে সমৃদ্ধ করেন। সেই জন্য আগরা ঘরানার মধ্যে গোয়ালিয়র ঘরানার অনেকখানি প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। খোদাবক্স সাহেবের ভাইপো শেরখাঁ ছিলেন নত্থন খাঁর (নত্থন পীরবক্স নয় কিন্তু) পিতা। এঁদের পূর্ব পুরুষ নাকি রাজপুত ছিলেন।

এই ঘরানার শিল্পীরাও ধ্রুপদ অঙ্গের খেয়াল গাইতেন এবং মধুর উদাত্ত কণ্ঠে গান আরম্ভ করার আগে নোম্ তোম্ বাণী দ্বারা আলাপ করতেন। তাছাড়া তান-বোলতানেও পৃথক বৈশিষ্ট্য ছিল। এঁরা খেয়ালের মতই বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে ধ্রুপদ ধামারও গাইতেন এবং তালের ওপর বিশেষ অধিকার রাখতেন।

৩॥ **পাতিয়ালা ঘরানা** ॥ বর্তমানে এই ঘরানার প্রতিনিধিত্ব করচেন উস্তাদ বড়ে গুলামঅলি খাঁ। তিনি শিক্ষা নিয়েছিলেন তাঁর কাকা কালে খাঁ সাহেবের কাছে— যিনি ছিলেন এই ঘরানার প্রবর্তক—বড়ে মিঞা কালু খাঁর শিষ্য। গুলামঅলি খাঁ সাহেবের পিতৃদেব অলীবক্স সাহেবও শিখেছিলেন এই বড়ে মিঞা কালু খাঁর কাছেই।

বড়ে মিঞার দুই পুত্র অলৈয়া (অলিবক্স) ও ফত্তু (ফতেআলী) জয়পুরের খ্যাতনাম্নী গায়িকা গোরখী বাঈ ও বৈরাম খাঁ এবং দিল্লীর তানরস খাঁ সাহেবের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন। এই ভাবে দুটি বিভিন্ন ঘরানার (জয়পুর ও দিল্লী) সংমিশ্রণে এই দুই ভাই পাতিয়ালা ঘরানার জন্ম দেন বলেও প্রবাদ প্রচলিত আছে।

এই ঘরানার খেয়ালগুলির রচনা খুব সংক্ষিপ্ত ও লঘুপ্রকৃতির হয়। আলংকারিক, বক্র, ফিরত প্রভৃতি তানগুলিকে দ্রুত লয়কারীতে প্রয়োগ করা এই ঘরানার বৈশিষ্ট্য। এই ঘরানার ঠুমরীর মধ্যে টপ্পার প্রভাব বেশি দেখা যায়। যাকে আজকাল বলা হয় পাঞ্জাবী ঠুমরী।

৪॥ **আল্লাদিয়া খাঁর ঘরানা**॥ সঙ্গীত জগতের প্রত্যেকেরই আল্লাদিয়া খাঁ সাহেবের (১৮৫৫-১৯৪৬ খৃঃ) নাম জানা আছে। শোনা যায় খাঁ সাহেবের পূর্ব পুরুষ হিন্দু ছিলেন। ভারত সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আমলে এই বংশের কেউ মুসলমান হয়ে যান।

বরোদা রাজ দরবারে থাকাকালীন মহারাষ্ট্রীয় সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীতপ্রেমীদের সঙ্গে এঁর পরিচয় ঘটে। অতঃপর ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ থেকে তিনি মহারাষ্ট্রেই থেকে যান এবং স্থানীয় অনেকে তাঁর কাছে তালিম নিতে থাকেন। তাঁর শিষ্য শিষ্যাদের মধ্যে শ্রীমতী কেশরবাঈ কেরকার, মোঘুবাঈ কুর্দীকর, শঙ্কর রাও সরনায়ক, গোবিন্দ রাও টেম্বে, খাঁ সাহেবের পুত্র ভূর্জী খাঁ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখ্য।

এঁদের খেয়াল গানগুলি খুব জটিল এবং গায়কী আয়ত্ব করা বেশ কষ্টসাধ্য। অপ্রচলিত রাগের প্রতি এঁদের আসক্তি বেশি। তানগুলি রাগের চলনের মত। আলাপের মধ্যে গাম্ভীর্য রক্ষা করা হয়। আর দেখা যায় অতি-তার সপ্তকে যাওয়ার প্রচেষ্টা। এঁদের ঘরানায় ঠুমরীর তেমন প্রচার নেই।

অনেকের মতে জয়পুর ঘরানা থেকেই পাতিয়ালা ও আল্লাদিয়া ঘরানার সৃষ্টি হয়েচে। জয়পুর ঘরানার প্রবর্তক মানা হয় শাহ্ সদারঙ্গ-এর প্রতিভাশালী পুত্র 'মনরঙ্গ'-কে (১৮শ শতাব্দীর মধ্য ভাগ ?)। মনরঙ্গ-এর আসল নাম ভূপত খাঁ। এঁকে অনেকে 'মহারঙ্গ'-ও বলেন। অদারঙ্গ (ফিরোজ খাঁ) নামেও সদারঙ্গের আরেক পুত্র ছিলেন। জয়পুর ঘরানার অস্তিত্ব এখন বিলুপ্ত হয়ে গেচে। তাই সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা নিরর্থক।

৫॥ **কিরানা ঘরানা**॥ এটিও একটি উল্লেখযোগ্য ঘরানা। এই ঘরানার সঙ্গে বিশেষ ভাবে জড়িত আছে খাঁ সাহেব উস্তাদ আব্দুল করীম খাঁর নাম। এই প্রতিভাধর শিল্পীর গান যিনি একবার শুনেচেন, তিনি তা কখনো ভুলতে পারবেন না। শোনা যায় মাত্র ছ'বছর বয়সে নাকি ইনি প্রথম প্রকাশ্য মহ্ফিলে সঙ্গীত পরিবেশন করেন এবং পনের বছর বয়সেই বরোদা দরবারে গায়ক রূপে নিযুক্ত হন।

এই ঘরানার প্রবর্তক কে ছিলেন সঠিক জানা যায় না। তবে কোন কোন মতে, বিখ্যাত বীণকার বন্দে আলী খাঁ সাহেবের সময় (১৮৩০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময় এঁর জন্ম) থেকে এই ঘরানার সূত্রপাত হয়েচে। বর্তমানে এই ঘরানার প্রতিনিধিত্ব করচেন : শ্রীমতী হীরাবাঈ বরোদেকর, শ্রীমতী

গঙ্গুবাঈ হাঙ্গল, শ্রীমতী সরস্বতী বাঈ রানে, শ্রীমতী রোশন আরা বেগম, বহরে বুয়া, উস্তাদ অমীর খাঁ প্রভৃতি। এই ঘরানার আরো দুজন শিল্পী ইতিপূর্বে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন ; তাঁদের নাম সওয়াই গন্ধর্ব (রামভাউ কুন্দগোলকার) ও সুরেশবাবু মানে। এঁদের গানের মধ্যে আলাপের প্রাধান্য এবং এক একটি স্বরের বঢ়ত লক্ষণীয়। ভাবব্যঞ্জকতা ও মনোরঞ্জকতার দিকে এঁরা বিশেষ লক্ষ্য রাখেন।

এই হ'ল খেয়াল গানের ঘরানার মোটামুটি পরিচয়। তবে বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতিতে এই সব ঘরানার বৈশিষ্ট্য ক্রমেই লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

॥ উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে অহোবলের অবদান ॥

আমরা এর আগে (পৃঃ ২৯) জেনে এসেচি যে সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পণ্ডিতপ্রবর অহোবল তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'সঙ্গীত পারিজাত' রচনা করেছিলেন। এই অমূল্য গ্রন্থখানির জন্যই তিনি চিরকাল অমর হয়ে থাকবেন ভারতীয় সঙ্গীত সমাজে।

সঙ্গীতের সব চাইতে যে জটিল বিষয়, যার সমাধানের চেষ্টায় আজও জ্ঞানী পণ্ডিতেরা সকলে একমত হতে পারচেন না—তা হল শ্রুতি-স্বর বিভক্তিকরণ।

পণ্ডিত অহোবলের পূর্বে সকলেই এই স্বর ও শ্রুতির বিভাজন করেছিলেন বিশেষ বিশেষ শ্রুতির ওপর সপ্তকের বারোটি স্বরকে স্থাপনা করে। সে প্রক্রিয়া এই গ্রন্থেরই পূর্ব ভাগে বর্ণিত হয়েচে। পণ্ডিত অহোবল এ ব্যাপারে নতুন আলোকপাত করলেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি—যিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বীণার তারের দৈর্ঘ্য ও আন্দোলনের সাহায্যে নতুন ভাবে স্বর-স্থানের নির্দেশ দিলেন। তাঁর এই পদ্ধতির পরিচয়ও আপনাদের কাছে বিস্তারিত ভাবে জানানো হয়েচে (পৃঃ ৩১—৪২ পর্যন্ত)। অহোবলের এই আবিষ্কার পরবর্তী সঙ্গীত জ্ঞানীদের গবেষণায় প্রভূত সাহায্য করেচে।

॥ সঙ্গীত রচনার নিয়ম ॥

আজকাল অনেকেই গীতি-কবিতা রচনা ও তাতে সুর সংযোজনা করে গান গেয়ে থাকেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই হয়ত সঙ্গীত রচনার নিয়মগুলি জানেন না। সেগুলি জানা থাকলে এ ক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিভা স্ফুরণে কিছু সাহায্য

হবে। তাছাড়া পরীক্ষাতেও এই ধরণের প্রশ্ন আসে। এখানে সঙ্গীত রচনা বলতে কণ্ঠ সঙ্গীতকেই বোঝানো হয়েচে।

গীতি-কবিতা॥ সঙ্গীত রচনার প্রথম ধাপ হচ্চে গীতি-কবিতা রচনা। গানের কথা না পেলে কিসে স্বরারোপ করবেন? কাজেই সর্বাগ্রে একটি গীতি-কবিতার প্রয়োজন। গীতি-কবিতা রচনার সময় মনে রাখতে হবে, গানের কথা যেন সহজ, সরল ও ব্যঞ্জনাময় হয়। যুক্তাক্ষরের ব্যবহার না থাকাই বাঞ্ছনীয়। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে এ নিয়মের (অর্থাৎ যুক্ত অক্ষরের) ব্যতিক্রম ঘটে কিন্তু তা বিশেষ ক্ষেত্রের জন্য সীমিত থাকা দরকার। গীতিকারের ছন্দজ্ঞান থাকা অনিবার্য।

এই হল গীতি-কবিতা রচনার সাধারণ নিয়ম। কিন্তু রাগ (classical) সঙ্গীতের ক্ষেত্রে কথার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ, ধ্রুপদ গানে যেমন কথার বাহুল্য থাকে খেয়াল গানে সেরূপ হয় না। খেয়ালে রাগই প্রধান। কথা সেখানে কম এবং রাগ প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কাজেই গীতি-কবিতা রচনার সময় বিভিন্ন গীত শৈলীর বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রাখতে হবে।

স্বরারোপ॥ স্বরারোপ করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে গানের কথা, ভাব ও রসের দিকে। রসবোধ না থাকলে, হয়ত বীর রসাত্মক গানে করুণ রসাত্মক স্বর প্রয়োগ করা হবে। গানটি যদি রাগাশ্রিত হয়, তবে গানের ভাব ও রস অনুসারে রাগ নির্বাচিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে রাগের রস ও প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার। তাছাড়া রাগের পরিচয় জানাও অনিবার্য। সাহিত্যে নব রসের উল্লেখ আছে। যেমন, শৃঙ্গার, করুণ, রৌদ্র, বীর, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, শান্ত ও অদ্ভুত রস। কিন্তু গানের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ শৃঙ্গার, করুণ, বীর ও শান্ত রসের আধিক্য দেখা যায়।

তাল ও লয়॥ শুধু স্বর বা রাগই নয়, তাল এবং লয়-ও গানের ভাব প্রকাশে সাহায্য করে অনেকখানি। কাজেই গানের ছন্দ, ভাষা ও রসের দিকে লক্ষ্য রেখে যেমন রাগ নির্বাচন করতে হয়, তেমনি তাল ও লয়ের প্রতিও লক্ষ্য থাকা দরকার।

মোটামুটি ভাবে এই তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে সঙ্গীত রচনা করতে হয়।

॥ রাগে বিবাদী স্বরের প্রয়োগ ॥

শাস্ত্রে বাদী, সম্বাদী ও অনুবাদী স্বরকে যেমন রাজা, মন্ত্রী ও প্রজার সঙ্গে তুলনা করা হয়েচে, বিবাদী স্বরকে তেমনি তুলনা করা হয়েচে শত্রুর সঙ্গে। বিবাদী স্বরকে বর্জিত স্বরও বলা হয়। অর্থাৎ কোন রাগ-রচনায় যদি কোন বিশেষ একটি বা দুটি স্বর একেবারেই ব্যবহার না করা হয়, তাহলে তাকেই বিবাদী বা বর্জিত স্বর বলা হয়। বর্জিত স্বর ব্যবহার করলে রাগের বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়ে যাবে বলেই ঐ স্বরকে শত্রুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েচে। কিন্তু আমরা দেখেচি যে শত্রুকে বন্দী করে এনে, অনেক সময় তাকে দিয়ে অনেক কাজও করিয়ে নেওয়া হয়। ঠিক তেমনি, কুশলী শিল্পীরা অনেক সময়ে বিবাদী স্বরটিকে এমন কৌশলের সঙ্গে রাগের মধ্যে ব্যবহার করে থাকেন যে তাতে রাগরূপ তো নষ্ট হয়ই না—বরং রাগের সৌন্দর্য তাতে আরও বৃদ্ধিই পায়। কিন্তু খুব সাবধানী না হলে যেমন কাজের অবসরে বন্দীর শত্রুতাচরণ করার অবকাশ থাকে বলেই তার ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হয়, তেমনি "খুব কৌশলের সঙ্গে" না খাটাতে পারলে বিবাদী স্বরও বিপদ ঘটাতে পারে; আপনার রাগের সব রূপই সে নষ্ট করে দেবে, আপনি যদি একটু অসাবধানী হ'ন। তাহলে দেখা যাচ্চে যে, বিবাদী স্বরকে যদি যথাযথ প্রয়োগ করা যায়, তাতে কোন ক্ষতি নাই কিন্তু ব্যবহারকারীর যদি সে চাতুর্য প্রদর্শনের ক্ষমতা না থাকে, তাহলে বিবাদী স্বরকে বর্জন করাই শ্রেয়।

॥ বিষ্ণুদিগম্বর স্বরলিপি পদ্ধতি ॥

স্বরলিপি ও তার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ইতিপূর্বে (পূর্ব ভাগে) আলোচনা করেচি। সে সময় আকারমাত্রিক ও হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে ব্যবহৃত চিহ্নাদির ব্যাখ্যাও করা হয়েছিল। এখন পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর পলুস্কর রচিত পদ্ধতির চিহ্ন-পরিচয় দেওয়া হচ্চে। তবে হ্যাঁ, বিষ্ণুদিগম্বর পদ্ধতির যে চিহ্নাদির সঙ্গে আমরা এখন পরিচিত হতে যাচ্চি, সেটি কিন্তু তার পরিমার্জিত রূপ।

শুদ্ধ স্বর: সা রে গ ম প ধ নি।

কোমল স্বর: রে্ গ্ ধ্ নি্।

কড়ি বা তীব্র স্বর: ম বা ম্‌।

মন্দ্র বা উদারা সপ্তক : ̇সা ̇রে ̇গ ̇ম ̇প ̇ধ ̇নি।

মধ্য বা মুদারা সপ্তক : সা রে গ ম প ধ নি।

তার বা তারা সপ্তক : ।সা ।রে ।গ ।ম ।প ।ধ ।নি।

এক মাত্রায় একটি স্বর : সা অর্থাৎ সা এক মাত্রা।

অর্ধ মাত্রায় একটি স্বর : সা „ সা আধ মাত্রা।

সিকি মাত্রায় একটি স্বর : সা „ সা ¼ মাত্রা।

আট ভাগের এক ভাগে একটি স্বর : সা অর্থাৎ সা ⅛ মাত্রা।

চার মাত্রায় একটি স্বর : সা অর্থাৎ সা চার মাত্রা স্থায়ী হবে।
×

দু' মাত্রায় একটি স্বর : সা অর্থাৎ সা দু' মাত্রা স্থায়ী হবে।

একটি স্বরকে দেড় মাত্রা বোঝাতে হলে স্বরের নিচে ড্যাশ এবং পাশে একটি বিন্দু (dot) চিহ্ন দেওয়া হয়। (পাশ্চাত্ত্যের স্টাফ নোটেশনেও এই ভাবে dot দেওয়া হয়) যেমন—সা. মানে হ'ল সা দেড় মাত্রা।

ভাতখণ্ডে পদ্ধতিতে যেমন গানের কথার কোন অক্ষরকে একাধিক মাত্রা বোঝাতে হলে অবগ্রহ এবং স্বরকে একাধিক মাত্রার বোঝাতে হলে ড্যাশ্ চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়, আলোচ্য পদ্ধতিতে তেমনি কথার সঙ্গে শূন্য (আকার মাত্রিকের মত) এবং স্বরের সঙ্গে অবগ্রহ দেওয়া হয়। যেমন—ম গ ঽ ঽ
গা নে o o

স্পর্শ বা কণ্ স্বর আকারমাত্রিক বা হিন্দুস্থানী পদ্ধতির অনুরূপ। যেমন,
স রে
রে কিংবা সা।

বক্র বন্ধনীর ( ) মধ্যে কোন স্বর থাকলে, হিন্দুস্থানী পদ্ধতির মতই, তার আগের স্বর, সেই স্বর, পরের স্বর, আবার ঐ বন্ধনীর মধ্যস্থিত স্বরের সম্মেলন এক মাত্রার মধ্যে বুঝতে হবে। যেমন : (গ)=এক মাত্রায় রেগমগ অথবা মগরেগ।

মীড়ের চিহ্নও হিন্দুস্থানী পদ্ধতির অনুরূপ।

আকার মাত্রিক বা হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে যেমন তালের বিভাগ দাঁড়ি বা বার (Bar) চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়, বিষ্ণুদিগম্বর পদ্ধতিতে আগে তা দেওয়া হত না, আজকাল কোন কোন ক্ষেত্রে বিভাগের চিহ্ন দেওয়া হচ্চে।

সম্-এর চিহ্ন ১ (আকার মাত্রিকেও এইভাবে সম চিহ্ন দেওয়া হয়)। ফাঁক বা খালির চিহ্ন +, সম্ বা ফাঁক ছাড়া অন্য বিভাগের তালগুলিকে মাত্রার সংখ্যা দিয়ে বোঝানো হয়। যেমন—

১ + ৫ + ৯ ১১
ধা ধা | ধিন্ তা | কিট ধা | ধিন্ তা | তিট কত | গদি ঘেন

এখানে আরেকটি কথা বলে দিই। বিষ্ণুদিগম্বর পদ্ধতিতে ১৬ মাত্রার মধ্য লয়ের ত্রিতালকে ৮ মাত্রায় দেখানো হয়। এরূপ করার কারণ হল লয়ের পরিমাপ বোঝানো।

॥ গীতশৈলীর বিভিন্ন প্রকার ॥

[ত্রিবট ॥ চতুরঙ্গ ॥ বাউল ॥ ভাটিয়ালী ॥ কজলী ॥ চৈতী]

এই গ্রন্থের পূর্বভাগে স্বরমালিকা, লক্ষণ গীত, ধ্রুপদ, ধমার, খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরী, তরানা, গজল, গীত, ভজন ও লোকসংগীত সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েচে। এখানে অন্যান্য কয়েকটি শৈলীর পরিচয় দেওয়া হচ্চে।

॥ ত্রিবট বা তির্বট ॥

প্রধানতঃ পাখোয়াজের বোল বা বাণী দিয়ে যে গান রচিত, তাকে বলা হয় ত্রিবট বা তির্বট। অনেকটা তরানার মত হলেও এবং এর মধ্যে কোন কোন সময়ে তরানার বাণী মিশ্রিত থাকলেও দুটির গীতি-ভঙ্গিমার কিছু তফাৎ আছে। বর্তমানে ত্রিবটের রেওয়াজ (প্রথা) প্রায় নেই বললেই চলে। "চতুরঙ্গ" গানের মধ্যেও ত্রিবটের কিছুটা অংশ থাকে। পাখোয়াজের বোল দিয়ে কী ভাবে গান রচিত হয় তার একটু নমুনা দেখুন। এই নমুনাটি একটি "চতুরঙ্গ" গানের ত্রিবট অংশ থেকে উদ্ধৃত করা হ'ল।

ধা কিট তক ধুম | কিট তক ধি ত্তা | -ক্ ধি ত্তা -ক্ | ধি ত্তা কিড নগ |
নগ ধির কিট তক | তক ধী- কিড নগ | ত ঘ্রা -ন্ তক্ | ধা···ইত্যাদি।

॥ চতুরঙ্গ ॥

এই গীতের চারটি অবয়ব হয় এবং প্রত্যেকটি ভাগে চারটি বিভিন্ন অঙ্গের বস্তু সন্নিবেশিত থাকে। সেইজন্যই এর নাম হয়েচে চতুরঙ্গ। গানের কথা, তরানার বাণী, সরগম ও ত্রিবট—এই চারটি রঙ্গ আছে এতে। তরানা, ত্রিবট বা চতুরঙ্গ—এগুলি রচিত হয়েছিল সঙ্গীতে বৈচিত্র্য সম্পাদনের জন্য। আধুনিক কালের গান হওয়া সত্ত্বেও, এর প্রচলন বহুল পরিমাণে কমে এসেচে।

॥ বাউল ॥

বাংলা দেশের বহু বিখ্যাত ও জনপ্রিয় লোক-সংগীত হ'ল বাউল। বাউল হ'ল একটি সাধক সম্প্রদায়ের নাম। চতুর্দশ শতকের শেষ অথবা পঞ্চদশ শতকের প্রথম দিকে এই বাউল সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েচে। বাউলেরা যে গান গায় সেই গানই বাউল সংগীত বলে পরিচিত। বাউল শব্দের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে স্বর্গীয় পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন বলেচেন :

"একটি বিশেষ ধর্মের লোককে বাউল বলে। এই শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে নানা মত আছে। কেহ কেহ বলেন বাউল শব্দটি বায়ু শব্দের সহিত "আছে" এই অর্থ-দ্যোতক 'ল' প্রত্যয় যোগ করিয়া নিষ্পন্ন। এই বায়ু শব্দের অর্থ যোগ-শাস্ত্রের স্নায়বিক শক্তির সঞ্চার বোঝায়। যে সম্প্রদায় দেহে স্নায়বিক শক্তির সঞ্চার সাধন করিবার সাধন করেন তাঁহারা বাউল। আবার কেহ বলেন সংস্কৃত বাতুল শব্দের প্রাকৃত রূপ বাউল।

পূর্ব বঙ্গ বা বাংলার অন্যান্য কয়েকটি জায়গায় বাউল প্রচলিত থাকলেও এর বেশি প্রচার দেখা যায় পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে। এই গানের বৈশিষ্ট্য বুঝতে হলে, বাউল সম্প্রদায়ের সাধনমার্গের আধ্যাত্মিকতার কিছুটা পরিচয় জানা দরকার।

এই সম্প্রদায়ের সাধকেরা মনে করেন, মানুষের দেহটাই হল মন্দির বিশেষ। ভগবান এই দেহ-দেউল ছাড়া অন্য কোথাও যান না। তাই এঁরা কোন এক জায়গায় মন্দির প্রতিষ্ঠা করে আখড়া তৈরী করেন না। এঁদের জীবনযাত্রার প্রণালী অনেকটা যাযাবরদের মত স্থিতিহীন। এই ধর্মে কোন উচ্চ-নীচতার ভেদ নেই—নেই কোন জাতবিচার। দেহবাদী হলেও এঁরা গুরুবাদে

বিশ্বাসী। গুরুর উপদেশ এঁরা পালন করেন বিশেষ ভক্তি সহকারে। পর বা অনাত্মীয় শব্দ এঁদের অভিধানে নেই। সকলেই এঁদের আপনজন—বসুধৈব কুটুম্বকম্।

বাউল গানের ভাষা ও ভাব সরল হলেও বেশ একটু হেঁয়ালীপূর্ণ। এই হেঁয়ালীটাই এ গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ দেহতত্ত্বগুলি যেমন ভাবপ্রধান—তেমনি ছন্দপ্রধান। কোমরে ডুগি বেঁধে, হাতে একতারাটি নিয়ে, ভাব সমন্বিত নৃত্যের তালে তালে যখন কোন বাউল ভাবে বিভোর হয়ে এ গান পরিবেশন করেন, তখন আপনার মনও সেই ভাবের আবেগে দুলে উঠবে আপনা থেকে। আধুনিক কালের দু'-একজন বাউলের গান শুনেচি। তাঁদের মধ্যে বীরভূমের নবনী দাসের মন-মাতানো বাউলই আমাকে আকৃষ্ট করেচে সব চাইতে বেশি।

এই সম্প্রদায়ের কয়েকটি বিখ্যাত বাউলের নাম : লালন ফকীর, ফিকিরচাঁদ (বা কাঙাল হরিনাথ), শেখ মদন, সিরাজ সাঁই প্রভৃতি।

আজকাল ভেজালের যুগে বাউল এবং অন্যান্য লোকসংগীতের মধ্যেও ভেজাল অনুপ্রবেশ করতে শুরু হয়েচে এইটাই বড় দুঃখের কথা!

॥ ভাটিয়ালী ॥

বাংলাদেশ নদীমাতৃক। তাই সে এত সুজলা সুফলা। নদীতে যখন ভাটি পড়ে, সেই ভাটির টানে নৌকা ভাসিয়ে দিয়ে নৌকার নিরক্ষর গ্রাম্য মাঝি তার উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে ওঠে যে গান—সেই গানকেই বলা হয় ভাটিয়ালী। এ গান পূর্ব বঙ্গের মাঝি-মাল্লাদের গান। এই গানের সুর ও কথার মধ্যে একটা বিরহ-বিধুর ভাব আছে—আর আছে আত্মসমর্পণের জন্য আকুলতা। এ গান শুনলে মনটা যেন উদাস হয়ে যায়। বাংলার লোকসংগীতের এই শৈলীটিও দেশবাসীর খুব প্রিয়তর। বাউলের মত এর প্রচারও সুদূরপ্রসারী। সংগীত-প্রতিযোগিতার আসরেও যখন বাউল ও ভাটিয়ালী গানের জন্য একটি স্বতন্ত্র স্থান রাখতে দেখি, তখন এর জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না কারো মনে।

বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আরো বিভিন্ন রকমের লোকসংগীত প্রচলিত আছে। যেমন সারি, জারি, ভাওয়াইয়া, মালসী, তরজা, গম্ভীরা, ভাদু প্রভৃতি। এগুলির আলোচনা আজ আর এখানে করা সম্ভব হ'ল না।

॥ কজলী বা কজরী ॥

উত্তর প্রদেশের লোকগীতগুলির মধ্যে কজলী একটি বিশিষ্ট স্থান জুড়ে আছে। একে অনেকে কজরী-ও বলেন। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা-তৃতীয়া তিথির দিন এই অঞ্চলের মেয়েরা "কজলী ব্রত" উদ্‌যাপন করেন। নতুন শাড়ী পরে, অলংকারে সুসজ্জিতা হয়ে, হাতে-পায়ে মেহেদী রঙের ছোপ লাগিয়ে এঁরা কজলী দেবীর পূজো করেন এবং ভাইদের হাতে বেঁধে দেন 'জরঈ'। সারা রাত জেগে তাঁরা শৃঙ্গাররস-প্রধান কজলী গান গেয়ে উৎসবের আনন্দ উপভোগ করেন। বারাণসী ও মির্জাপুরই হল এই গীতশৈলীর প্রধান কেন্দ্র। কাশীতে ভাদ্রমাসে "লুলারক ছট" নামে আরেকটি পরব হয়। এই পর্ব উপলক্ষেও কজরী গীত হয় সমারোহের সঙ্গে। এই উৎসবের বৈশিষ্ট্য হল, এখানে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল শিল্পীরাই সমবেত হন এবং আনন্দ করেন।

কজলী গানের বিষয়বস্তু প্রধানত বিরহ ও মিলনের বিভিন্ন অবস্থা নিয়ে রচিত। ভক্তি রসাত্মক কিছু কজলী রচিত হলেও, শৃঙ্গার রসই এর প্রধান উপজীব্য। বাংলাদেশের কীর্তন গায়কেরা যেমন মূল একজন গায়ককে অনুসরণ ক'রে সকলে সম্মিলিত ভাবে দোয়ারকী করেন, কজলী পরিবেশনের রীতিও সেই রকম। কীর্তনীয়াদের মত এঁদেরও পৃথক পৃথক দল আছে এবং এই দল বা সম্প্রদায়ের নামেই এঁরা পরিচিত হন। সাধারণতঃ দলের 'মুখিয়ারা'ই (মোড়ল) স্থানীয় ভাষায় নতুন নতুন কজলী রচনা করেন এবং দলের সবাইকে শিখিয়ে দেন।

॥ চৈতী ॥

নামেই বোঝা যাচ্ছে এটি চৈত্রমাসের গান। কজলী যেমন উত্তর প্রদেশের, চৈতী তেমনি বিহার রাজ্যের লোকসংগীতগুলির অন্যতম। শুধু অন্যতমই নয়—বরং প্রধানতম। এই গীতগুলি শৃঙ্গার রসাত্মক হয়ে থাকে। শৃঙ্গার রসের দুটি পৃথক পর্যায় আছে—সংযোগ ও বিয়োগ। অর্থাৎ মিলন ও বিরহ। চৈতী বিরহ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। আঞ্চলিক ভাষায় এর কথা রচিত হয় এবং রাম-সীতার লীলা বর্ণনাই এর প্রধান উপজীব্য।

॥ কয়েকটি পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যা ॥

॥ গায়ক ও গায়কী ॥

সাধারণ অর্থে যিনি গান করেন তিনিই গায়ক। আসলে কিন্তু তা নয়। সত্যিকার **গায়ক** তাঁকেই বলা হয়, যিনি গুরুর কাছে যথারীতি শিক্ষা করার পর সেই গুরুমুখী বিদ্যার ওপর নিজস্ব প্রতিভা, ব্যক্তিত্ব, পাণ্ডিত্য, রসবোধ প্রভৃতি দ্বারা নতুন বৈশিষ্ট্য আরোপ করতে পারেন।

গায়কী হ'ল, গুরুর কাছে শেখা বিদ্যাকে নিজ বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল করে তোলা।

॥ নায়ক ও নায়কী ॥

নায়ক বলতে সাধারণ অর্থে আমরা বুঝি নেতা বা গল্প-নাটকের প্রধান ব্যক্তি। সঙ্গীতে কিন্তু আরেকটি বিশেষ অর্থে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েচে।

শাস্ত্রীয় ও ক্রিয়াত্মক সঙ্গীতে যিনি সমান দক্ষতা অর্জন করেচেন, যিনি সঙ্গীতে নতুন নতুন জিনিষ রচনা করায় দক্ষ, তাঁকেই **নায়ক** রূপে অভিহিত করা হয়।

গুরুর কাছে প্রাপ্ত বিষয়গুলিকে যথাযথভাবে প্রকাশ করাকে বলা হয় **নায়কী**।

॥ কলাবন্ত ॥

যে কলাকার অর্থাৎ শিল্পী সঙ্গীতে ক্রিয়াসিদ্ধ, তাঁকেই বলা হয় **কলাবন্ত**। এই কলাবন্ত থেকেই 'কালোয়াৎ' শব্দটির সৃষ্টি হয়েচে।

॥ বাগ্‌গেয়কার ॥

যিনি সমান দক্ষতার সঙ্গে গীত রচনা ও সুর সংযোজনা করতে পারেন অর্থাৎ সাহিত্য ও সঙ্গীতে যাঁর সমান অধিকার আছে, এক কথায় তাঁকেই বলা হয় **বাগ্‌গেয়কার**।

॥ পণ্ডিত ॥

সঙ্গীত ক্ষেত্রে তাঁকেই **পণ্ডিত** বলা হয়, যাঁর সঙ্গীতশাস্ত্রে উত্তম জ্ঞান আছে কিন্তু ক্রিয়াত্মক সঙ্গীতের জ্ঞান সাধারণ।

॥ গান্ধর্ব বা মার্গ সঙ্গীত ॥

কতকগুলি কড়া অনুশাসনে আবদ্ধ যে গান দ্বারা প্রধানতঃ ঈশ্বরোপাসনা করা হ'ত, সেই গানকে বলা হ'ত **মার্গ সঙ্গীত**। বলা হয়, গন্ধর্বেরা (দেব-গায়কেরা) এই গান গাইতেন। তাই এর আরেক নাম **গান্ধর্ব সঙ্গীত**। খুব কঠিন নিয়ম-কানুন থাকায় এবং এই সঙ্গীত শিক্ষার ব্যাপারে অধিকারী অনধিকারীর প্রশ্ন থাকায় ধীরে ধীরে এই গান বিলুপ্ত হয়ে গেচে। আজ আর এর স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু জানা কারো পক্ষে সম্ভব হয় নি এখনো।

বর্তমানে প্রচলিত ক্ল্যাসিকাল গান (ধ্রুপদ খেয়াল প্রভৃতি) মার্গ সঙ্গীতের পর্যায়ে পড়ে না।

॥ দেশী সঙ্গীত বা গান ॥

মার্গ সঙ্গীতের ঠিক বিপরীত হ'ল দেশী সঙ্গীত। মার্গ সঙ্গীত যেমন ঈশ্বরের তুষ্টির জন্য, **দেশী সঙ্গীত** তেমনি দেশবাসী জনসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য। এরও আইন-কানুন আছে। তবে স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে এই আইন-কানুনের মধ্যে কিছু পরিবর্তন করা চলত। এই পরিবর্তনের স্বাধীনতা থেকেই পরবর্তী কালে জন্মলাভ করেচে ধ্রুপদ, ধমার, খেয়াল প্রভৃতি নতুন নতুন গীতশৈলী। এগুলি কিন্তু সবই দেশী সঙ্গীতের অন্তর্গত। এই দেশী সঙ্গীতকে শুধু **'গান'**-ও বলা হত।

॥ বাদ্য ও তার প্রকার ॥

ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রগুলি যে **তত্** (তাঁত বা তারের যন্ত্র), **সুষির** (বায়ু দ্বারা বাদিত যন্ত্র), **আনদ্ধ, অবনদ্ধ** বা **বিতত্** (চর্মাচ্ছাদিত যন্ত্র) এবং **ঘন** (ধাতু বা কাঠের তৈরী যন্ত্র)—এই চার ভাগে বিভক্ত, তা আপনারা আগেই জেনে এসেচেন (পূর্ব ভাগ দ্রষ্টব্য)। সে সময় তত্ জাতীয় দুটি যন্ত্র—তানপুরা ও সিতারের (বা সেতার) পরিচয় দেওয়া হয়েছিল, এবার অন্যান্য কয়েকটি বাদ্য যন্ত্রের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করানো হচ্চে।

আমাদের সঙ্গীত শাস্ত্রে তন্ত্র বা তাঁতের যন্ত্র মাত্রকেই বলা হয় বীণা এবং প্রত্যেকের নাম পৃথক পৃথক হ'লেও, প্রত্যেকটি নামের শেষেই 'বীণা' শব্দটি জুড়ে দেওয়া হ'ত। যেমন—ময়ুরী বীণা, মহতী বীণা, সারস্বত বীণা, কিন্নরী বীণা, সপ্ততন্ত্রী বীণা, কচ্ছপী বীণা, ত্রিতন্ত্রী বীণা, শারদীয় বীণা, রুদ্র বীণা, সারঙ্গ বীণা প্রভৃতি। গঠন সৌকর্যে এবং বাদন শৈলীতে এর প্রত্যেকটিই আলাদা। এই প্রাচীন যন্ত্রগুলির মধ্যে কয়েকটি যন্ত্রের প্রচলন এখনো আছে কিন্তু সেগুলির সংস্কার করা হয়েচে বহুলাংশে। যেমন সিতার বা সেতার। এই যন্ত্রটির প্রাচীন রূপের নাম অনেকের মতে—ত্রিতন্ত্রী বা কচ্ছপী বীণা। সরোদের প্রাচীন নাম নাকি শারদীয় বীণা বা রুদ্র বীণা। সারঙ্গীর নাম ছিল সারঙ্গ বীণা বা পিণাকী বীণা। বেহালা বা ভায়োলিন নাকি পিণাকী বীণারই বংশজাত ইত্যাদি।

॥ সরোদ ॥

আরব দেশে রুবেব নামক একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন ঐ দেশের জনৈক গ্রামবাসী আবদুল্লা। সেইটিই নাকি পরে সরোদ নামে অভিহিত হয়েচে। অনেকে মনে করেন, সরোদ হ'ল রবাব বা প্রাচীন রুদ্রবীণেরই আধুনিক সংস্করণ। রবাব হ'ল পারস্যদেশের যন্ত্র। উস্তাদ হাফিজঅলি খাঁ সাহেবও নাকি বলেন যে, সরোদ হ'ল আফগানিস্তানের যন্ত্র এবং কাবুল থেকে এটি ভারতবর্ষে এসেচে। কাবুলে একে বলা হয় রবাব এবং সেখানে এর

আকৃতি আরো ছোট। খাঁ সাহেবের প্রপিতামহ বঙ্গস গুলাম বন্দগী খাঁ কাবুল থেকে হিন্দুস্তানে আসার সময় এটিকে নিয়ে আসেন। তারপর তিনি রীওয়াঁ এসে থাকতে আরম্ভ করলেন, সেই সময় মহারাজা বিশ্বনাথ সিংহ খাঁ সাহেবের পুত্রকে বীণার তালিম দেন এবং রবাবকে সরোদে রূপান্তরিত করেন। তিনিই পরে প্রখ্যাত সরোদিয়া উস্তাদ গুলামঅলী খাঁ নামে পরিচিত হন এবং নবাব ওয়াজিদঅলী শাহের দরবার তথা অন্য কয়েকটি রাজ্যেও খ্যাতি অর্জন করেন।···এই ভাবেই উস্তাদ সখাওয়ত হুসেন খাঁ-এর পূর্বপুরুষও কাবুল থেকে দিল্লী এসে বসবাসকালীন সরোদের প্রচার করেন। ("সঙ্গীত" জুন ১৯৬১ সালের সংখ্যায় প্রোঃ চন্দ্রকান্তলাল দাস লিখিত "হিন্দুস্তানী বাদ্য সরোদ")। এর খোল সেতার বা তানপুরার লাউয়ের মত ফাঁপা খোল দিয়ে তৈরী হয় না, কাঠ দিয়ে তৈরী হয় এবং তবলী চামড়া দিয়ে মোড়া থাকে। পট্টরীটি (দণ্ডের সামনের ভাগ) হয় ইস্পাতের চাদরের (steel plate)। যতদূর জানা যায়, উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত সরোদে স্টীলের তারের পরিবর্তে তাঁত ব্যবহার করা হ'ত। সে সময় পট্টরীটিও স্টীলের থাকত না। ঐ শতাব্দীর শেষ ভাগে ঐ দুটি বস্তুর ব্যবহার প্রচলিত হয়। সিতারের মত, সরোদে কোন পর্দা থাকে না। রবাবের মতই এটিও পর্দাবিহীন যন্ত্র। এতে প্রধানতঃ সাতটি তার থাকে এবং অনুরণনের জন্য থাকে আরো আট দশটি তার। এতে আলাপ, গৎ, তোড়া—সবই বাজানো যায়। তবে সিতার ও সরোদের বাজে পৃথক বৈশিষ্ট্য আছে।

॥ সারঙ্গী ॥

আগেই বলেচি, এই যন্ত্রটিকে কেউ বলেন সারঙ্গ বীণার রূপান্তর, কেউ মনে করেন, পিণাকী বীণারই এটি নবীন রূপ। কোন কোন মতে বলা হয় এটি রাবণের আবিষ্কৃত যন্ত্র। এর দেহটি তৈরী হয়েচে ফাঁপা কাঠ দিয়ে এবং খোলটি চামড়া দিয়ে ঢাকা। এর তন্ত্রী সংখ্যা প্রধানতঃ চারটি। এই চারটি তন্ত্রী কিন্তু স্টীল বা পিতলের নয়,—চামড়ার। এই চারটি ছাড়া [illegible] যে এগারটি তরব্-এর তার থাকে, সেগুলি পিতলের। পনেরটি তার ছাড়া এতে আরো তার থাকে, তবে এগুলির আমদানী হয়েচে পরে। প্রায় পাঁচশ' বছর থেকে গানের সঙ্গে সঙ্গতকারী যন্ত্র হিসেবে প্রচলিত হলেও এটি প্রাচীন গ্রাম্য যন্ত্র। বর্তমানে রাগ সঙ্গীতের আসরে এবং আকাশবাণী কেন্দ্র থেকে এটির
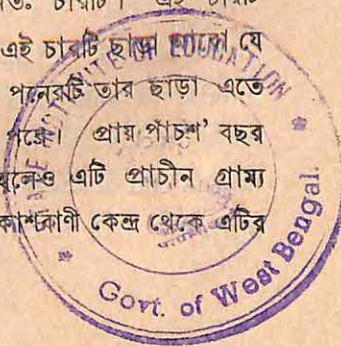
একক বাদনও শোনা যায়। এস্রাজ বা বেহালার মত এটিও ছড় (বা ছড়ি) দিয়ে বাজানো হয়।

॥ এস্রাজ ॥

এটিকে এস্রার-ও বলেন অনেকে। ছড়ি দিয়ে বাজানো যন্ত্র-পরিবারের মধ্যে এটি অন্যতম। সারঙ্গী ও সিতারের অদ্ভুত মিশ্রণে এটির সৃষ্টি হয়েচে। নিচের খোলের দিকটা অনেকটা সারিন্দার মত আর ওপর দিকটা সিতারের মত। এর প্রধান তার চারটি ইস্পাতের এবং তরব্-এর বার-তেরটি তার পিতলের। এই তারগুলি সিতারের নিয়মেই বাঁধা হয়। এর ষোলটি পর্দাও সিতারের মত পিতল বা জার্মান সিল্ভার দিয়ে তৈরী। সারঙ্গীর মত এটিও গানের সঙ্গে বাজানো হয় এবং একক ভাবেও বাজে। একে আশুরঞ্জনীও বলা হয়। তবে বর্তমানে এ নামের প্রচলন নেই। আজকাল এর সঙ্গে 'সাউণ্ড বক্স' (sound box) লাগিয়ে একে তারসানাই-ও বলা হয়। বড় আকারের এস্রাজকে বলা হয় দিলরুবা। এস্রাজের সঙ্গে দিলরুবার আরেকটু তফাৎ এই যে, এর খোলটি সারঙ্গীর মত।

॥ বেহালা ॥

এই যন্ত্রটির সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে বহু মতভেদ আছে। এক মতে এটি ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র এবং রাবণের পিণাকী বীণা বা আলাপিনী বীণা থেকে উৎপন্ন বাহুলীন যন্ত্রটিই পরে ভায়োলিন বা বেহালা নামে পরিচিতি লাভ করেচে। ভিন্ন মতে এটি আদৌ এদেশীয় নয়। বিষয়টিকে গবেষকদের হাতে ছেড়ে দিয়ে এর সাধারণ পরিচয় জেনেই আমাদের আপাততঃ খুশী থাকা ভালো। এখানে R. Illing প্রণীত "A Dictionary of Music" থেকে একটু উদ্ধৃতি তুলে দিচ্ছি, যা থেকে এর সম্বন্ধে কিছুটা পরিচয় আপনারা পাবেন।—"The violin and the viol appeared in their distinct forms about the middle of the 16th century, the latter achieving popularity more quickly. The violin, brought to perfection by Stradivari by the end of the 17th century." ভাবার্থ এই যে, ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ভায়োলিন এবং ভায়োল তার সঠিক রূপ পেয়েচে এবং খুব

দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠেচে। অতঃপর সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে, স্ট্র্যাডিভেরি কর্তৃক সে পেল পূর্ণ রূপ।

বেহালার স্বরের জন্য কোন পরদা বাঁধা থাকে না। তারের ওপর আঙ্গুলের টিপ দিয়ে স্বর বার করা হয়। 'ফিঙ্গার বোর্ডের' (Finger-board) ওপর তারগুলিকে আঙ্গুল দিয়ে চেপে স্বর বাজাতে হয়। এতে প্রধানতঃ চারটি তার থাকে। ক্বচিৎ কখনো সাতটি তারও দেখা যায়। আগে এই তারগুলি ছিল তাঁতের, আজকাল থাকে দুটি তাঁতের, একটি স্টীলের এবং একটি নিকেল অথবা জার্মান সিল্‌ভারের পাতলা তার দিয়ে মোড়া রেশমের তার। অবশ্য ব্যতিক্রমও আছে। যেমন, প্রথম তিনটি স্টীলের তার রূপো বা অ্যালুমিনিয়ম-এর পাতলা তার দিয়ে মোড়া থাকে। বাঁ দিক থেকে প্রথম তারটি অন্যান্য তারগুলি অপেক্ষা মোটা, অন্যগুলি ক্রমশঃ পাতলা হয়ে এসেচে।

॥ গীটার ॥

অতি-আধুনিক যুগে 'গীটার' যন্ত্রটি খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেচে। এটিও তত্ জাতীয় বাদ্য। অনেকেরই মতে এটি প্রাচ্যদেশের যন্ত্র। মুরেরা এটিকে নিয়ে যান স্পেনে। রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মতে ভারতের কচ্ছপী বীণাই পারস্য এবং আরবে গিয়ে রূপ পরিবর্তন ক'রে 'গীটার' নাম ধারণ করেচে। দ্বাদশ শতাব্দীতে এটি স্প্যানিশ-যন্ত্র হিসেবে পরিচিত ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে স্প্যানিশ গীটার জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সপ্তদশ শতাব্দীতেই এই যন্ত্রটির প্রতি দৃষ্টি পড়ে ফ্রান্স ও ইতালির অতঃপর অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ থেকে এটি ক্রমশঃ য়ুরোপের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আমাদের দেশে দু'রকম গীটারের প্রচলন দেখা যায়ঃ স্প্যানিশ ও হাওয়াইয়ান গীটার। স্প্যানি" গীটার বাঁ-হাতের আঙ্গুল এবং ডান হাতে স্ট্রাইকার দিয়ে বা শুধু আঙ্গুলের সাহায্যে এবং হাওয়াইয়ান গীটার স্টীলের একটি ছোট 'বার্' (Bar) দিয়ে বাজানো হয়। এই বার্‌টি থাকে বাঁ হাতে। আর ডান হাতের তিনটি আঙ্গুলে আংটির মত (মেজরাব ও জবার মত) বিভিন্ন রকমের জিনিষ পরে তাই দিয়ে তারে আঘাত ক'রে বাজানো হয়। এই আংটিগুলিকে বলা হয় 'পিক্' (Pick)। এই 'পিক্'গুলির মধ্যে বুড়ো আঙ্গুলের জন্য যে 'থাম্ব পিক্' (Thumb Pick)—সেটি সাধারণত সেলুলয়েড বা ব্যাকোলাইটের এবং তর্জনী ও মধ্যমার পিক্ দুটি নিকেলের হয়ে থাকে।

॥ বাঁশী বা বংশী ॥

এটি শুষির অর্থাৎ বায়ু দ্বারা বাদিত যন্ত্র। প্রথমে বাঁশের বাঁশীই তৈরী হ'ত, পরে কাঠ, পিতল ইত্যাদি দিয়েও তৈরী হয়েচে। বাঁশ দিয়ে তৈরী হ'ত বলেই বোধহয় এর নাম ছিল বেণু বা বাঁশী। বাঁশের আরেক নাম বেণু। আজকাল বাঁশীর কয়েকটি প্রকার দেখা যায়। যেমন,—

সোজা বাঁশী—এর গায়ে ছ'টি ফুটো (স্বর-ছিদ্র) থাকে এবং এই ফুটোর ওপর আঙ্গুলের চাপ দিয়ে নানা রকম স্বর বার করা হয়। ফুঁ দেওয়ার জায়গাটি হুইশ্ল-এর মত। সোজাসুজি ভাবে ধরে বাজানো হয় বলেই একে বলা হয় সোজা বা সরল বাঁশী।

আড় বাঁশী—এর গায়েও স্বর-ছিদ্র থাকে এবং ফুঁ দেওয়ার জায়গাটিতেও একটি ছিদ্র থাকে। আড়াআড়ি ভাবে ধরে বাজানো হয় বলে এর নাম আড় বাঁশী। একে মুরলীও বলা হয়। আগেরটির চাইতে এটি বাজানো কিছু কঠিন। এটি বাঁশের তৈরী।

টিপারা ফ্লুট—টিপারা ফ্লুট বাজাবার কায়দা উপরোক্ত দুটির মাঝামাঝি। এর স্বর-ছিদ্রও আগের দুটির মত কিন্তু এর ফুঁ দেওয়ার জন্য পৃথক কোন ছিদ্র নেই। নলের মত সোজা বাঁশীর ওপর দিককার খোলা মুখে ফুঁ দিয়েই বাজাতে হয়। অবশ্য ফুঁ দেওয়ার পদ্ধতি দ্বিতীয়টির অনুরূপ। এর বাদন কৌশল অপেক্ষাকৃত কঠিন। এর অপর নাম বেণু। এটিও বাঁশ দিয়ে তৈরী হয়। এটির আকার অন্যান্য বাঁশী অপেক্ষা দীর্ঘ। ত্রিপুরা অঞ্চলের বলে এর নাম টিপারা ফ্লুট।

॥ শানাই ॥

এটিও শুষির বাদ্য। এটিকেও বাঁশীরই একটি প্রকার বলা যেতে পারে। বাঁশীর মতোই লম্বা পাইপের মত এটি কাঠের তৈরী। চেহারা অনেকটা ধুতরো ফুলের মতো। ওপর দিকে—যেখানে মুখ দিয়ে বাজানো হয়, সেই দিকটায় দুটি রীড্ লাগানো থাকে। ঐ রীড্-এ ফুঁ দিয়ে এটি বাজাতে হয়। আর নিচের দিকে পেতলের চোঙার মত থাকে। এর গায়েও স্বর-ছিদ্র থাকে এবং আঙ্গুলের চাপে বাজাতে হয়। অন্যান্য বাঁশীগুলি যেমন একক (Solo) ভাবে বাজানো যায়, শানাই সেভাবে বাজে না। দুটি শানাই একসঙ্গে বাজে। একটিতে শুধু ষড়্জ স্বরটি বাজানো হয় এক টানা—অবিচ্ছেদ্য ভাবে;

আরেকটিতে গৎ বা গান ইত্যাদি বাজানো হয়। এর সঙ্গে সঙ্গত করার জন্য যে আনদ্ধ জাতীয় তাল-বাদ্য বাজানো হয় ছোট তবলা-বাঁয়ার মত, সে দুটিকে বলা হয় টিকারা। এই তিনজনার মিলিত গোষ্ঠিকে (team) বলা হয় রোশন বা রওশনচৌকী। আগের দিনে শানাই বাজত মাঙ্গলিক উৎসবাদিতে এবং রাজবাড়ী বা দেবমন্দিরের প্রধান তোরণের ওপর নহবৎখানায়। বারাণসী, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থস্থানগুলির নহবৎখানায় এখনো প্রহরে প্রহরে শানাইয়ের সুর শোনা যায়। বর্তমানে রাগ-সঙ্গীতের আসরেও এই কল্কে ফুলের আকৃতি বিশিষ্ট শানাই কল্কে পেয়েচে। এতে রাগ-রাগিনী বেশ ভালো ভাবেই বাজানো চলে। পারস্য দেশেও এর প্রচলন আছে।

॥ হারমোনিয়ম ॥

এটি সুষির জাতীয় বাদ্য অর্থাৎ হাওয়ার সাহায্যে বাজে।

হারমোনিয়ম যন্ত্রটি আবিষ্কার করার কৃতিত্ব যে ঠিক কা'র, তা বলা কঠিন। কোন কারিগরই এই যন্ত্রের আবিষ্কর্তা হিসেবে নিজেকে দাবী করতে পারেন না ("No one instrument-maker may fairly be claimed as the inventor of the harmonium."—Robert Illing)। তবে এরূপ জানা যায় যে, ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে আলেকজান্দার ডিবেইন (Alexander Debain) নামে এক ভদ্রলোক এই যন্ত্রটির 'পেটেণ্ট' (কৃতিস্বত্ব) করিয়ে নিয়েছিলেন ("Alexander Debain incorporated the work of his predecessors in his harmonium patented in paris in 1840, in which he advanced the design of the instrument further by using a number of sets of reeds under the control of stops, as on the organ."—R. Illing.)। অনেকের ধারণা, আলেকজান্দার ডিবেইন-ই হারমোনিয়মের আবিষ্কর্তা। কিন্তু তাঁদের সে ধারণা যে ঠিক নয়, উপরোক্ত উদ্ধৃতিই তার প্রমাণ।

আমাদের দেশে কণ্ঠসঙ্গীত শিক্ষার্থীদের উপযোগী যতগুলি সহযোগী যন্ত্র আছে, ব্যবহারের দিক থেকে, সব চাইতে সহজ যন্ত্র হ'ল হারমোনিয়ম। যন্ত্রটি এমন ভাবেই তৈরী, যাতে নতুন শিক্ষার্থীরাও অতি সহজেই এটির সাহায্যে গান শেখা আরম্ভ করতে পারেন। মেয়ে, পুরুষ, ছেলে, বুড়ো—যে কেউ

হারমোনিয়মের বাঁধা চাবিগুলির ওপর ডান হাতের আঙ্গুলের মৃদু চাপ দিয়ে, বাঁ হাতে 'বেলো'টিকে টানলেই সা রে গ ম বেজে উঠবে। স্বর বাঁধার জন্য তানপুরা, সারেঙ্গী, এস্রাজ, বেহালা, সেতার, সরোদ প্রভৃতি যন্ত্রের মত কান মলামলির কোন ঝামেলা নেই,—অন্য কোন যন্ত্রের সঙ্গে একে মেলাবার কোন বালাই নেই বরং এরই স্বরের সঙ্গে অন্যান্য যন্ত্রের স্বর মিলিয়ে নেওয়া হয়। যতক্ষণ ইচ্ছে একটি স্বরকে একটানা বাজানো হয়,—যে কোন বয়সের মেয়ে পুরুষ নিজ নিজ কণ্ঠের শক্তি অনুযায়ী হারমোনিয়মের যে কোন পর্দা থেকে সা শুরু করতে পারেন,—তা ছাড়া যেমন কণ্ঠ-সঙ্গীতের সহযোগী বাদ্য হিসেবে তেমনি একক বাদ্য এবং তবলা ও নাচের সঙ্গে লহরা বাজাবার পক্ষেও হারমোনিয়ম যন্ত্রটিই আজকাল সমাদরের সহিত স্বীকৃতি লাভ করেচে। এতগুলি গুণ থাকা সত্ত্বেও ক্ল্যাসিকাল গানের গুণীরা অনেকেই এই যন্ত্রের সাহায্যে কণ্ঠসাধনা করতে বারণ করেন কেন এবং আকাশবাণীর কেন্দ্র থেকেই বা একে বহিষ্কার করা হয়েচে কেন,—এ প্রশ্ন মনে আসাটা খুবই স্বাভাবিক। এই প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে হারমোনিয়ম সম্বন্ধে আরো দু'-একটি কথা জানা দরকার।—

হারমোনিয়ম যন্ত্রটি প্রথমে ডায়াটনিক স্কেল অনুসারে তৈরী করা হয়েছিল। বেশ সুন্দর, সুরেলা যন্ত্র। প্রত্যেকটি স্বর নিখুঁত-সুন্দর। কিন্তু একটা মারাত্মক অসুবিধা দেখা গেল এতে। যে চাবিটিকে সা স্বরের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হ'ল, সেই স্বরের সঙ্গে যদি গলা না মেলে, অর্থাৎ সেই সা অনুসারে যদি কারো গলা ওপরের সা পর্যন্ত তুলতে অসুবিধে হয়, তাহলে ঐ নির্দিষ্ট চাবিটির পরিবর্তে অন্য কোন চাবিকে সা বলে ধরা যাবে না। অন্য কোন চাবিকে সা ধরে নিলেই অন্য স্বরগুলো সব বেসুরো হয়ে যাবে। এখন যেমন হারমোনিয়মের যে কোন চাবিকেই আপনার সুবিধে মত সা ধরে নিয়ে বাজিয়ে বা গেয়ে গেলে কোন অসুবিধা হয় না, ডায়াটনিক স্কেলে বাঁধা হারমোনিয়মে সে সুবিধে ছিল না। তার কারণ, এই স্কেলে (ডায়াটনিক), সা থেকে রে এবং রে থেকে গা স্বরের মধ্যবর্তী ব্যবধান (স্বরান্তর) হ'ল যথাক্রমে এক টোন ও দেড় সেমিটোন। (পৃষ্ঠান্তরে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। কাজেই, রে স্বরটিকে যদি সা ধরে নেওয়া যায়, তাহ'লে গ হয়ে যাবে রে। আর সে অবস্থায় সা ও রে স্বর দুটির মধ্যে ব্যবধান হয়ে যাবে একটোনের বদলে দেড় সেমিটোনের। অতএব রে বেসুরো হবে।

পণ্ডিতেরা মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন। ভাবনার কথাই! যে যন্ত্র সকলের কাজে লাগে না, সেরূপ যন্ত্র তৈরী করলে সব দিক দিয়েই লোকসান!

শেষ পর্যন্ত উপায় বেরিয়ে গেল একটা। সমস্ত স্বরগুলির ব্যবধানই রাখা হ'ল এক সেমিটোন করে। অর্থাৎ সা থেকে কোমল রে, কোমল রে থেকে শুদ্ধ রে, শুদ্ধ রে থেকে কোমল গ, কোমল গ থেকে শুদ্ধ গ···এই ভাবে সা থেকে র্সা পর্যন্ত বারোটি স্বরেরই মধ্যবর্তী ব্যবধান নিশ্চিত করা হ'ল এক-এক সেমিটোন দিয়ে।

আপনারা বলবেন, এতেও তো স্বরগুলি বেস্থরোই হয়ে যাবে! ঠিক কথা কিন্তু এতে স্থবিধে হ'ল এই যে, এবার যে কোন চাবিকেই আপনি ইচ্ছে মত সা ক'রে নিতে পারেন। সব সময়েই সব স্বর ঐ এক সেমিটোনের ব্যবধানেই থাকবে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন, এই যে সামান্য বেস্থরাটুকু এখন কানে লাগচে, পরে অভ্যস্ত হয়ে গেলে ওটা আর কারো কানকে পীড়িত করবে না। অতএব এইটেই মেনে নেওয়া উচিত। এ অবস্থায় বৃহত্তর স্থবিধের খাতিরে এই ক্ষুদ্রতর অস্থবিধা নিয়ে লোকে আর মাথা ঘামাবে না।

ব্যাস্। শেষ পর্যন্ত তাই হ'ল। হারমোনিয়ম, পিয়ানো ইত্যাদি সবই ঐ নিয়মে তৈরী হতে লাগল। এই যে সমান স্বরান্তর যুক্ত স্কেল, একেই ইংরিজীতে বলা হয় ইকোয়ালী টেম্পার্ড স্কেল (equally tempered scale)। ভারতীয় ভাষায় সমবিভাগীয় স্কেল বলা হয়।

ভারতীয় রাগ-সঙ্গীতজ্ঞেরা কেন হারমোনিয়মে গলা সাধতে বা গান অভ্যাস করতে বারণ করেন, এবার নিশ্চয়ই তা বুঝেচেন। কারণ, প্রথমতঃ হারমোনিয়মের স্বরগুলো বেস্থরো, দ্বিতীয়তঃ এতে কোন মীড়ের কাজ হয় না, তৃতীয়তঃ বিভিন্ন রাগের স্বর-বৈশিষ্ট্যও এতে রক্ষিত হয় না। তাই সাধারণ ভাবে স্থরেলা মনে হলেও কিংবা রাগ সংগীতের আসরে গুণী শিল্পীরা একে সহযোগী যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করলেও, হারমোনিয়ম যন্ত্রটি যে বেস্থরা—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশের পণ্ডিতেরাই সে বিষয়ে একমত।

তবে আকাশবাণীর কেন্দ্রেও এটিকে সহযোগী বা একক বাদ্য যন্ত্র হিসেবে গ্রহণ না করার কোন যুক্তি আছে বলে আমি মনে করি না।

॥ তানপুরায় উৎপন্ন সহায়ক নাদ ॥

তানপুরা সম্বন্ধে ইতিপূর্বে (পূর্ব ভাগে) আপনাদের অনেক কথাই জানিয়েচি। এবার সে সম্বন্ধে আরেকটি নতুন তথ্য আপনারা জানবেন।

যখন তানপুরার তারে আঘাত করা হয়, তখন দেখা যায়, মূল স্বরটি ছাড়াও তা থেকে অন্য স্বরের ধ্বনি গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে। মূল স্বর ছাড়া যে অন্য নাদ, সেই নাদকে বলা হয় সহায়ক নাদ। ইংরিজীতে বলা হয় Overtone. বিজ্ঞানীরা বলেন কোন নাদই একা উৎপন্ন হয় না। তার সঙ্গে অন্য নাদও জন্মায়। সহায়ক মানে হল সাহায্যকারী। এখানেও সহায়ক শব্দটি ঐ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েচে। অন্য নাদগুলি মূল নাদকে সাহায্য করে বলেই ঐ নাদগুলিকে বলা হয় সহায়ক নাদ। নিজে থেকেই উৎপন্ন হয় বলে সহায়ক নাদকে স্বয়ম্ভু স্বরও বলা হয়।

বিশ্লেষণ করে দেখা গেচে, সহায়ক নাদগুলি সাধারণতঃ মূল নাদের দুগুণ থেকে ন'গুণ পর্যন্ত উঁচু হয়ে থাকে। এক থেকে নয় পর্যন্ত যে সংখ্যাগুলি, সেগুলি সবই একক। এককের পর আসে দুই-সংখ্যাযুক্ত দশক। দশকের সংখ্যাগুলি সবই একক সংখ্যার সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত। কাজেই একক সংখ্যার সহায়ক নাদ যদি অঙ্ক কষে বার করে নেওয়া যায়, তাহলে প্রয়োজন মত দশক সংখ্যার সহায়ক নাদগুলিও বার করা সহজ হয়ে যাবে। তবে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে সব নাদই একজাতীয় হয় না। আর জাতি (timbre) ভেদ অনুসারে নাদ থেকে উৎপন্ন সহায়ক নাদেরও তারতম্য ঘটে। তাছাড়া সংখ্যার যে অনুপাত, নাদের জাতির পার্থক্য অনুসারে সেই অনুপাতেরও তারতম্য ঘটে। আমরা এখানে শুধু তানপুরার তার থেকে উৎপন্ন সহায়ক নাদগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করব।—

তারপুরার চারটি তারকে সাধারণত দুই ভাবে সুরে বাঁধা হয়। (১) প্রথম তারটি মন্দ্র-পঞ্চম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তার মধ্য-ষড়্জ এবং শেষ তারটি বাঁধা হয় মন্দ্র-ষড়্জ সুরে। (২) প্রথম তারটি মন্দ্র-মধ্যম এবং অপরগুলি আগের নিয়ম অনুসারে। এখন আমাদের দেখতে হবে, কোন তার থেকে কি কি সহায়ক নাদ উৎপন্ন হয়।

মূল নাদ যদি মন্দ্র সপ্তকের ষড়্জ-কে ধরা হয়, আর তা'র আন্দোলন সংখ্যা যদি এক সেকেণ্ডে ১২০ বার হয়, তাহ'লে ঐ সংখ্যাটির সঙ্গে ক্রমানুসারে

নয় পর্যন্ত গুণ করে গেলেই ঐ নাদের (মন্দ্র-ষড়্জ) সহায়ক নাদগুলিকে পাওয়া যাবে। যেমন—

১২০ × ১ = ১২০ = মন্দ্র সপ্তকের ষড়্জ
১২০ × ২ = ২৪০ = মধ্য " ষড়্জ
১২০ × ৩ = ৩৬০ = মধ্য " পঞ্চম
১২০ × ৪ = ৪৮০ = তার " ষড়্জ
১২০ × ৫ = ৬০০ = তার " গান্ধার
১২০ × ৬ = ৭২০ = তার " পঞ্চম
১২০ × ৭ = ৮৪০ = তার " ধৈবত থেকে একটু উঁচু স্বর
১২০ × ৮ = ৯৬০ = অতি তার সপ্তকের ষড়্জ
১২০ × ৯ = ১০৮০ = অতি তার " ঋষভ

অতএব মন্দ্র-ষড়্জ থেকে উৎপন্ন হয় সা রে গ প এই চারটি সহায়ক নাদ। শুধু মন্দ্র ষড়্জই নয়, যে কোন সপ্তকের ষড়্জ থেকেই উৎপন্ন হবে সা রে গ প স্বর কয়টি।

এবার দেখুন পঞ্চম থেকে কোন কোন স্বর উৎপন্ন হচ্ছে।

মধ্যম-পঞ্চমের আন্দোলন সংখ্যা ৩৬০। অতএব মন্দ্র-পঞ্চমের আন্দোলন সংখ্যা হবে ৩৬০ ÷ ২ = ১৮০। তাহ'লে ঠিক আগের নিয়ম অনুসারে ১৮০ সংখ্যার সঙ্গে ২ থেকে ক্রমান্বয়ে ৯ পর্যন্ত গুণ করতে হবে। যেমন—

১৮০ × ১ = ১৮০ = মন্দ্র সপ্তকের পঞ্চম
১৮০ × ২ = ৩৬০ = মধ্য " পঞ্চম
১৮০ × ৩ = ৫৪০ = তার " ঋষভ
১৮০ × ৪ = ৭২০ = তার " পঞ্চম
১৮০ × ৫ = ৯০০ = তার " নিষাদ
১৮০ × ৬ = ১০৮০ = অতি তার সপ্তকের ঋষভ
১৮০ × ৭ = ১২৬০ = এই আন্দোলন সংখ্যাটি সপ্তকে ব্যবহৃত কোন স্বরের সঙ্গেই মেলে না।
১৮০ × ৮ = ১৪৪০ = অতি তার সপ্তকের পঞ্চম
১৮০ × ৯ = ১৬২০ = অতি তার " ধৈবত

অতএব মন্দ্র-পঞ্চম থেকে উৎপন্ন হয় প ধ নি রে স্বর কয়টি (সহায়ক নাদ)।

এক্ষেত্রেও ঐ একই কথা; যে কোন সপ্তকের পঞ্চম থেকেই ঐ স্বর ক'টি উৎপন্ন হবে।

এখন দেখা যাক মন্দ্র-মধ্যম-এ বাঁধা তার থেকে কোন কোন স্বর উৎপন্ন হয়। মন্দ্র-মধ্যমের আন্দোলন সংখ্যা ১৬০। তাহ'লে—

১৬০ × ১ = ১৬০ = মন্দ্র সপ্তকের মধ্যম

১৬০ × ২ = ৩২০ = মধ্য " মধ্যম

১৬০ × ৩ = ৪৮০ = তার " ষড়্জ

১৬০ × ৪ = ৬৪০ = তার " মধ্যম

১৬০ × ৫ = ৮০০ = তার " ধৈবত

১৬০ × ৬ = ৯৬০ = অতি তার সপ্তকের ষড়্জ

১৬০ × ৭ = ১১২০ = এই সংখ্যাটিও কোন ব্যবহৃত স্বরের সঙ্গে মেলে না।

১৬০ × ৮ = ১২৮০ = অতি তার সপ্তকের মধ্যম

১৬০ × ৯ = ১৪৪০ = অতি তার সপ্তকের পঞ্চম

অতএব মধ্যম থেকে উৎপন্ন হয় ম প ধ সা।

এই ভাবে তানপুরা থেকে সহায়ক নাদ উৎপন্ন হয়।

॥ তন্ত্রবাদ্যের কয়েকটি পরিভাষা ॥

লাগ-ডাট ॥ কোন রাগের মুখ্য রাগবাচক স্বর সমষ্টিকে বারম্বার প্রয়োগ করাকে বলা হয় লাগ-ডাট। অবশ্য এই পরিভাষাটিকে অন্যভাবেও বোঝানো হয়। যেমনঃ একই স্বর সমষ্টিকে দ্রুতভাবে দুই সপ্তকে বাজানো। যাকে 'পুকার'-ও বলা হয়। 'পুকার' সম্বন্ধে পূর্ব ভাগে বলা হয়েচে। ভিন্ন মতেঃ আরোহের ঘসীট্কে লাগ, এবং অবরোহের ঘসীট্কে ডাট বলা হয়। যেমন সা থেকে প পর্যন্ত ঘসীট্কে বলা হয় লাগ, আর প থেকে সা পর্যন্ত অবরোহ ক্রমের ঘসীট্কে বলা হয় ডাট।

লড়-গুথাও ॥ 'লড়' কথাটির সাধারণ অর্থ হল লড়া (লড়াই করা) এবং গুথাও মানে হচ্ছে গ্রথিত করা। এখানেও ঐ একই অর্থে 'লড়-গুথাও' প্রযোজ্য। তবলার রেলার মত কয়েকটি সীমিত স্বরকে এক সঙ্গে গ্রথিত করাকে বলা হয় লড়-গুথাও। এভাবেও এর অর্থ করেন অনেকে যে, কয়েকটি

সীমিত স্বরের মধ্যে ঘোরাফেরাকে বলা হয় লড়ী এবং তবলার রেলার মত বিভিন্ন লড়ীকে একসঙ্গে গাঁথাকে বলা হয় গুথাও।

কৃন্তন॥ সিতার বাজাবার সময়, বাঁ হাতে খুব দ্রুত ভাবে দুই, তিন বা চারটি স্বর সমূহকে বাজানোর যে ক্রিয়া তাকেই বলা হয় কৃন্তন। এই ক্রিয়াটির সময় মেজরাব দিয়ে কিন্তু একবারই আঘাত করতে হবে। যেমন, মেজরাবে একটি আঘাত দিয়ে রেসা, রেসানি কিংবা রেসানিদা এইভাবে বাজাতে হবে। জমজমা, মুর্কী ও গিটকিরী—এর তিনটি ক্রিয়ারই সমাবেশ এতে হয়ে থাকে। এই ক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে 'পূর্বভাগে' বলা হয়েচে। কৃন্তন প্রধানত সিতারেরই ক্রিয়া।

তারপরণ॥ রাগের বাদী, সম্বাদী তথা রাগবাচক স্বরগুলির প্রতি লক্ষ্য রেখে পাখোয়াজের পরণের সঙ্গে সেগুলিকে প্রয়োগ করে বাজানো। সাধারণত সুরবাহার যন্ত্রেই আলাপের শেষ ভাগে তারপরণ বাজে এবং এর সঙ্গে পাখোয়াজের সঙ্গত হয়।

কস্‌বী॥ যোগ্য গুরুর কাছ থেকে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্যকে বলা হয় কস্‌বী।

অতাঈ॥ যথাযোগ্য শিক্ষা গ্রহণ না করে এদিক-ওদিক থেকে শুনে শেখা ব্যক্তিকে বলা হয় অতাঈ।

॥ বাদকদের গুণাবগুণ ॥

এই গ্রন্থের "পূর্ব-ভাগে" আমাদের শাস্ত্রে বর্ণিত গায়কদের গুণ ও দোষের কথা উল্লেখ করেছিলাম। এবার বাদকদের দোষগুণ জানানো হচ্চে।—যন্ত্র বাদকদের এই দোষগুণগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

প্রথমে গুণগুলিই বলা যাক।—

গুণ॥ (১) বাদ্যযন্ত্র নির্মাণের কৌশল আয়ত্ব করা দরকার। (২) বিভিন্ন প্রকার বাদ্য বাদনে কুশলতা। (৩) সঙ্গীতে তিনটি শাখা (গীত, বাদ্য ও নৃত্য) সম্বন্ধে জানা। (৪) বিভিন্ন প্রকার বাদ্য যন্ত্র সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান। (৫) কোন্ বাদ্য যন্ত্র শরীরের কোন্ কোন্ অঙ্গের সাহায্যে বাজাতে হবে সে সম্বন্ধে উত্তম জ্ঞান। (৬) হস্ত ও অঙ্গুলী সঞ্চালনে দক্ষতা। (৭) তাল ও লয় সম্বন্ধে উত্তম ধারণা। (৮) রাগ ও গ্রহ স্বর সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান।

দোষ॥ উপরোক্ত গুণগুলি না থাকাটাই দোষণীয়। ঐ গুণগুলির একটিও যদি কম থাকে, তাহলে সেইটিকেই দোষ ধরা হয়।

॥ রাগ-পরিচিতি ॥

রাগ সম্বন্ধে আলোচনা করার প্রারম্ভে, এ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা শিক্ষার্থীদের জানিয়ে রাখতে চাই।—

বর্তমানে প্রচলিত ভারতীয় রাগ-সঙ্গীতগুলির যে বিভিন্ন শৈলী (ধ্রুপদ, খেয়াল প্রভৃতি)—সেগুলি যে সবই প্রাচীন 'দেশী' রাগের অন্তর্ভুক্ত, তা পূর্বেই বলা হয়েচে।

জনরঞ্জনের জন্য লোকরুচি অনুসারে দেশী সঙ্গীতের মধ্যে সামান্য পরিবর্তন দোষণীয় ছিল না। এই পরিবর্তনের স্বাধীনতা থেকে যেমন বিভিন্ন গীতশৈলীর জন্ম হয়েচে, তেমনি রাগ-রাগিনীর মধ্যেও ঘটেচে অনেক রূপান্তর। রাগ সম্বন্ধে যে মতানৈক্য দেখা যায়, তা শুধু আজই নয়—প্রাচীনকালেও ছিল। এ অবস্থায় বলা মুশ্‌কিল কোনটি ঠিক। আমার নিজের মতে কোনটিকেই বেঠিক বলা উচিত নয়।—কারণ, যাঁরা বিভিন্ন মত প্রকাশ করে গেচেন বিভিন্ন ঘরানার মাধ্যমে, তাঁরা সকলেই ছিলেন প্রতিষ্ঠাপন্ন গুণী কলাকার।

সঙ্গীতের ক্রিয়াত্মক দিকটাই প্রধান। আর এই ক্রিয়াত্মক বিদ্যাটা শুধু বই পড়ে শেখা যায় না। সেইজন্যই এটিকে বলা হয় গুরুমুখী বিদ্যা। বই আমাদের ঐ শিক্ষার সহায়ক মাত্র। এই গ্রন্থে যে রাগগুলির আলোচনা করা হয়েচে, তা খুব বিস্তারিত করা সম্ভব হয় নি স্থানাভাব হেতু। কোনো রাগ শেখবার সময় যে মূল বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখলে রাগের রূপ যথাযথ ভাবে প্রকাশ করা যায় শুধু সেই বিষয়গুলিই এখানে বোঝাবার চেষ্টা করেচি। তাছাড়া, পরীক্ষার্থীদের জন্য প্রধানতঃ পঃ ভাতখণ্ডের মত অনুসৃত হলেও, সাধ্যমত অন্যান্য মতবাদ নিয়েও কিছুটা আলোচনা এখানে করা হয়েচে।

রাগ-সঙ্গীত শিক্ষার সময়, পরীক্ষার্থীরা যেন তাঁদের আচার্যদেবের কাছ থেকে ঐ রাগের পরিচয় জেনে নেন ভালো ভাবে। এক মতে গান (বা বাজনা) শিখে আরেক মতের শাস্ত্রীয় পরিচয় শেখার মত মারাত্মক ভুল যেন তাঁরা না করেন।

॥ একত্রিশটি রাগের পৃষ্ঠা-সংখ্যাসহ তালিকা ॥

● ঠাট ॥ বিলাবল

১। শংকরা ॥ ৮২
২। দেশকার ॥ ৮৫
৩। পাহাড়ী ॥ ৮৭
৪। মাঁড় ॥ ৮৯
৫। আসা ॥ ৯১

● ঠাট ॥ কল্যাণ

৬। কামোদ ॥ ৯২
৭। ছায়ানট ॥ ৯৪
৮। শুদ্ধ কল্যাণ ॥ ৯৬
৯। গৌড়সারং ॥ ৯৯
১০। হিণ্ডোল ॥ ১০১

● ঠাট ॥ খমাজ

১১। জয়জয়ন্তী ॥ ১০৩
১২। রাগেশ্রী ॥ ১০৫
১৩। গৌড়মল্লার ॥ ১০৭
১৪। ঝিঁঝিট ॥ ১১০

● ঠাট ॥ কাফী

১৫। বাহার ॥ ১১২
১৬। মিঞামল্লার ॥ ১১৪
১৭। মালগুজী ॥ ১১৭
১৮। সিন্ধুরা ॥ ১১৯

● ঠাট ॥ আসাবরী

১৯। দরবারী কানাড়া ॥ ১২০
২০। আড়ানা ॥ ১২২
২১। দেশী ॥ ১২৫

● ঠাট ॥ ভৈরব

২২। বিভাস ॥ ১২৮
২৩। রামকেলী ॥ ১৩০
২৪। যোগিয়া ॥ ১৩৩

● ঠাট ॥ পূর্বী

২৫। শ্রী ॥ ১৩৪
২৬। বসন্ত ॥ ১৩৫
২৭। পরজ ॥ ১৩৮
২৮। পুরিয়াধনাশ্রী ॥ ১৪১

● ঠাট ॥ টোড়ী

২৯। মূলতানী ॥ ১৪৩

● ঠাট ॥ মারোয়া

৩০। পুরিয়া ॥ ১৪৫
৩১। ললিত ॥ ১৪৮

॥ শংকরা ॥

ঠাট—বিলাবল। প্রকৃতি গম্ভীর। জাতি ঔড়ব-ষাড়ব। আরোহে রে ও ম এবং অবরোহে শুধু ম বর্জিত। অবশিষ্ট স্বরগুলি শুদ্ধ। বাদী গ, সম্বাদী নি। পূর্বাঙ্গের বক্রগতির রাগ। পরিবেশনের সময় রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর (মধ্যরাত্রি)।

আরোহ॥ সা গ, প, নি ধ র্সা।

অবরোহ॥ র্সা নি প, নি ধ র্সা নি, প, গ প, গ, রে সা।

পকড়॥ র্সা, নি প, নি ধ র্সা নি, প, গ প, গ, রে সা।

পকড় (ভিন্ন প্রকার)॥ সা গ প, নি ধ র্সা।

ন্যাস স্বর॥ সা, গ, প ও নি।

গুণী মহলে শঙ্করার বিভিন্ন জাতির পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন—ঔড়ব-ষাড়ব, ঔড়ব-ঔড়ব, ষাড়ব-ষাড়ব, এবং সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ। এগুলির মধ্যে সম্পূর্ণ জাতির শঙ্করার সাক্ষাৎ ক্বচিৎ পাওয়া যায়। অবশিষ্ট তিনটি জাতির মধ্যে রে ও ম-এর ব্যবহার নিয়েই যত মতভেদ।

(১) ঔড়ব-ষাড়ব জাতির আরোহে রে ও ম লাগে না, অবরোহে শুধুই ম বর্জিত। এই জাতিতে যদিও বা রে স্বরটিকে প্রয়োগ করা হয়, তাও নিতান্তই অল্প পরিমাণে—লংঘনমূলক অল্পত্ব হিসেবে।

(২) ঔড়ব-ঔড়ব জাতিতে রে ও ম স্বরের অস্তিত্ব একেবারেই বিলুপ্ত।

(৩) ষাড়ব-ষাড়ব জাতির মধ্যে রে কোন মতে একটু স্থান করে নিলেও ম একেবারেই বর্জিত।

(৪) সম্পূর্ণ জাতির মধ্যে, বলাই বাহুল্য, কোন স্বরকেই বহিষ্কার করা হয় নি।

বাদী-সম্বাদী নিয়েও মতানৈক্য আছে। একমতে গ বাদী, নি সম্বাদী। অন্য মতে সা বাদী, প সম্বাদী। ভিন্ন মতে প বাদী ও সা সম্বাদী। যাঁরা পঞ্চমকে বাদী মানেন, তাঁরা একে বলেন উত্তরাঙ্গের রাগ।

তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শংকরার যে পরিচয় পাওয়া যায়—বিশেষ ক'রে পরীক্ষার্থীদের প্রধানতঃ যে মতে পরীক্ষা দিতে হয়, সেই মতটির (পঃ ভাতখণ্ডে) আলোচনা প্রারম্ভেই করা হয়েচে।

বেহাগের সঙ্গে শংকরার খানিকটা সাদৃশ্য আছে। বেহাগের আরোহে রে ও ধ লাগে না কিন্তু শংকরার আরোহে রে না লাগলেও ধ লাগে। অবশ্য ধৈবত এখানেও কম লাগে অর্থাৎ লংঘনমূলক অল্পত্ব হিসেবে প্রযুক্ত হয়। বেহাগে মধ্যম সুস্পষ্টরূপে ব্যবহৃত হয় কিন্তু শংকরাতে তা একেবারেই লাগে না। মধ্যমকে বর্জন করার জন্যই বেহাগের প্রভাব থেকে শংকরা মুক্তি পেয়েচে। পৃষ্ঠান্তরে (১৫১ পৃঃ) শংকরা ও বেহাগের তুলনা দেখান হয়েচে।

জাতিগত পার্থক্য ছাড়াও শংকরার আরো কয়েকটি প্রকার আছে। যেমন—শংকরাঅরণ, শংকরাকরণ, শংকরাবরণ, শংকরাভরণ প্রভৃতি।

শংকরাঅরণ হ'ল ঔড়ব-ষাড়ব জাতীয় একটি প্রকার। সেনী মতে শংকরা, ইমন ও মালশ্রীর সংমিশ্রণে এটি রচিত। আরোহে রে ও ম এবং অবরোহে শুধু রে বর্জিত। তাছাড়া এর আরোহে তীব্র মধ্যম প্রয়োগ করা হয়। যেমন: সা গ প নি ধ র্সা—র্সা নি ধ প হ্ম গ সা। বাদী-সম্বাদী যথাক্রমে গ ও নি।

ভিন্ন মতে শংকরার সঙ্গে ইমন মিলিয়ে শংকরাঅরণ বলা হয়। তীব্র মধ্যম না লাগিয়েও একে কল্যাণ অঙ্গে পরিবেশন করা হয় এবং কচিৎ কখনো শুদ্ধ মধ্যমের প্রয়োগ করা হয়। রে ও ধ-কে এতে দেখানো হয় স্পষ্ট ভাবেই। ভাতখণ্ডেজীর ক্রমিক পুস্তকমালিকা ৪র্থ খণ্ডের ২৩২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত "তুরকওয়া সন মন লাগরে" গানটি এর একটি দৃষ্টান্ত। এতে তীব্র মধ্যম নেই, অন্তরায় শুধু শুদ্ধ মধ্যম ব্যবহৃত হয়েচে।...শংকরা-ইমন নামে আরেকটি পৃথক রাগ আছে। সেটির সঙ্গে শংকরাঅরণের কিছু কিছু স্বরগত মিল আছে।

শংকরাকরণ হ'ল ঔড়ব জাতির রাগ। রে ও ম স্বর দুটিকে এতে বর্জন করা হয়। কিন্তু ভিন্ন মতে বলা হয়, শংকরার মধ্যে শুদ্ধ কল্যাণের অঙ্গ মিশিয়ে এই প্রকারটি রচিত হয়েচে। কল্যাণ অঙ্গের এই প্রকারের মধ্যে শুদ্ধ মধ্যম বর্জিত এবং তীব্র মধ্যমকে স্পষ্ট ভাবে না দেখালেও, স্পর্শ বা কণ স্বর হিসেবে তীব্র মধ্যমকে গ্রহণ করা হয়েচে। স্বর প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য হেতুই একে কল্যাণ অঙ্গের পর্যায়ভুক্ত করা হয়েচে। বিখ্যাত খেয়াল "সো জাঁই রে জাঁই" গানটি (ক্রমিক পুস্তকমালিকা ৪র্থ খণ্ড॥ পৃঃ ২৩১) এই প্রকারভুক্ত।

শংকরাবরন-এর মধ্যে বেহাগের প্রভাব বেশি। এতে রে ও ম স্বর দুটিকে স্পষ্ট ভাবেই প্রযুক্ত হতে দেখা যায়।

শংকরাভরণ নামে যে প্রকারটি আছে, সেটি সেনী ঘরানার ঔড়ব-ষাড়ব জাতীয় প্রকার। এতে ম একেবারেই বর্জিত থাকে।

এতক্ষণ শংকরার কয়েকটি প্রকারের সংক্ষিপ্তসার সমীক্ষণ করা হ'ল। অতঃপর এ সম্বন্ধে আর দু-একটি কথা বলে এই আলোচনা শেষ করব।

শংকরা গাইবার সময় ক্বচিৎ কখনো তীব্র মধ্যমের সহযোগে পঞ্চম এবং গান্ধারকে প বা রে স্বরের কণ্ সহযোগে প্রয়োগ করা হয়। যেমন—নি ধ র্সা,
ক্ষ রে প প রে
নি, প, গ, প, গ, সা | সা গ— প—, গ প গ— সা | আবার সোজাসুজি ভাবেও গান্ধার প্রযুক্ত হয়। যেমন—সা গ—, প—, নি—প, গ প
রে
গ— সা। তবে হ্যাঁ, তীব্র ক্ষ-এর কণ্ না লাগালেও কোন ক্ষতি নেই আর সুন্দর ভাবে লাগালেও তাতে খুব দোষ ধরা হয় না। কিন্তু ঋষভের স্পর্শে গান্ধারের প্রয়োগ খুবই রঞ্জকতা ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ধ এতে বেশি প্রযুক্ত হয় না।

শংকরার স্বর-পরিচয় নিম্নরূপ :—

ষড়্জ স্বরটি সাধারণ হলেও, একে উভয় প্রকার বহুত্ব (অভ্যাস ও অলংঘন) রূপেও দেখানো হয়।

ঋষভ যখন ব্যবহৃত হয়, তখন লংঘনমূলক অল্পত্ব হিসেবেই ব্যবহার করা হয়।

গান্ধার স্বরের প্রাধান্য অনস্বীকার্য কারণ এটি বাদী স্বর। কাজেই এটি উভয়-বহুত্বের মধ্যেই পড়ে।

পঞ্চম স্বরটিকে যদি বাদী বা সম্বাদী না-ও মানেন, তবুও তার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান এ রাগে আছে। সে এখানে গান্ধারের মতই অলংঘন ও অভ্যাসমূলক বহুত্বপূর্ণ।

ধৈবত-এর স্থান নিতান্তই গৌণ এ রাগে। এটি এ রাগের লংঘনমূলক অল্পত্ব স্বর।

নিষাদ কোন কোন মতে সম্বাদী, কাজেই তার প্রয়োজন উপেক্ষিত নয়। সে যেমন অভ্যাসের দ্বারা বহুত্ব প্রাপ্ত হয়েচে আবার অলংঘন বহুত্ব বললেও ভুল হবে না।

॥ দেশকার ॥

ঠাট—বিলাবল। প্রকৃতি শান্ত। জাতি ঔড়ব-ঔড়ব। ম ও নি এ রাগে বর্জিত, অবশিষ্ট স্বরগুলি শুদ্ধ। বাদী ধ, সম্বাদী গ। উত্তরাঙ্গের রাগ। পরিবেশনের সময় দিবা প্রথম প্রহর। কোন কোন মতে দিবা দ্বিতীয় প্রহর।

আরোহ॥ সা রে গ, প, ধ, র্সা।
অবরোহ॥ র্সা ধ, প, গ প ধ প, গ রে সা।
পকড়॥ ধ, প, গ প, গ রে সা।
ন্যাস স্বর॥ প, ধ ও র্সা।

উপরোক্ত আরোহ-অবরোহ প্রথমেই মনে করিয়ে দেয় কল্যাণ ঠাটের ভূপালীর কথা। আর সঙ্গে সঙ্গেই মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, একই স্বর বিশিষ্ট দুটি রাগের ঠাট ভিন্ন হ'ল কেন?

উত্তর: একটি কল্যাণ, অপরটি বিলাবল অঙ্গে পরিবেশিত হয়।

কৌতূহলী শিক্ষার্থী কিন্তু এতেই নিরস্ত হবেন না! তিনি আবার প্রশ্ন তুলবেন। অঙ্গের তফাৎটা বুঝে নিতে চাইবেন ভালো ভাবে।

ভূপালীর আলাপ বা স্বরবিস্তারের প্রতি একটু মনোযোগ দিলেই বোঝা যাবে যে, সেটি কল্যাণ অঙ্গের চলনের সঙ্গে বেশ খানিকটা মেলে। ঠিক তেমনি, দেশকারের চলনের মধ্যে পাওয়া যায় বিলাবল অঙ্গের প্রভাব।

ভূপালীর গান্ধার, ঋষভের সামান্য কণ্ নিয়ে অথবা খাড়া ভাবে প্রয়োগ করা হয়। তাছাড়া গান্ধার স্বরটি ভূপালীর বাদী স্বর—অর্থাৎ প্রাণস্বরূপ প্রধান স্বর। কাজেই ভূপালীতে গান্ধার দেশকার অপেক্ষা বেশী ব্যবহৃত হয়। দেশকারের গান্ধার বেশির ভাগই পঞ্চমের কণ্ সহযোগে লাগান হয়। বিনা কণ্-এও যে প্রযুক্ত হয় না তা নয়, তবে তা কম। তার ওপর দেশকারের সম্বাদী স্বর হ'ল গান্ধার। উপেক্ষণীয় নয়, কিন্তু ভূপালী অপেক্ষা দেশকারে গান্ধারের প্রয়োগ কম।

এবার দেখুন উক্ত দুটি রাগে ধৈবতের স্থান। ভূপালীতে ধ লাগানো হয় ষড়্জের স্পর্শ যুক্ত করে, কিন্তু দেশকারের ধ—বিশেষ ক'রে মন্দ্র সপ্তকে, ঋষভের কণ্ নিয়ে নাবে। বিনা কণ্-এও গান্ধার ও ধৈবতকে দুটি রাগেই ব্যবহার করার রীতি আছে, তবে উপরোক্ত ভাবে কণ্ যুক্ত স্বর হ'লে ঐ দুটি

রাগের রূপ আরো খোলে। ধৈবত হ'ল ভূপালীর সম্বাদী এবং দেশকারের বাদী স্বর। বুঝতেই পাচ্চেন, দেশকারে ধৈবতের প্রয়োগ ভূপালী অপেক্ষা বেশি হবে! আর দেশকারের সময় যে ভাবে ধৈবতের ওপর ন্যাস করা যায়, ভূপালীতে সে ভাবে ন্যাস করা যায় না। স্বর বিস্তার বা আলাপের সময়, ভূপালীতে বেশির ভাগ গান্ধার তথা দেশকারে ধৈবতের ওপর ন্যাস করা হয়।

উপরোক্ত দুটি রাগ গাইবার সময় পঞ্চমের ওপরও লক্ষ্য রাখতে হবে। দুটি রাগেই পঞ্চমের ওপর ন্যাস করা চলতে পারে কিন্তু দেশকারে পঞ্চমের ওপর বেশি ন্যাস করা হয়। ভূপালীর বেশী ঝোঁক (tendency) গান্ধারের দিকেই। নিচে দুটি রাগেরই সামান্য একটু স্বর-বিস্তারের দ্বারা ব্যাপারটাকে স্পষ্ট করার চেষ্টা করচি!

রে সা গ রে
ভূপালী॥ গ - রে, সা ধ্, সা রে গ - -, প গ - -, ধ - প
গ সা গ রে
গ - -, রে সা ধ্, সা রে গ।

রে প প
দেশকার॥ সা ধ্ - সা, গ রে সা, সা রে গ প, প গ - প,
প প রে
গ প ধ - প, গ রে সা, ধ্ - সা।

ওপরে যদিও দুটি রাগেরই স্বরবিস্তার মন্দ্র ও মধ্য সপ্তকের মধ্যে দেখানো হ'ল, কিন্তু মনে রাখবেন, ভূপালী পূর্বাঙ্গের এবং দেশকার উত্তরাঙ্গের রাগ। কাজেই ও দুটির আলাপ বা স্বরবিস্তার যথাক্রমে মন্দ্র ও মধ্য এবং মধ্য ও তার সপ্তকেই হয়ে থাকে। মীড়ের কাজও দেশকারেই বেশী হয়।

দেশকার ও ভূপালীর সঙ্গে আরো একটি রাগের হুবহু মিল পাওয়া যায়। সে রাগটির নাম হ'ল জয়েৎ কল্যাণ। এ রাগটি আমাদের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত নয়, কাজেই ওটি সম্বন্ধে বেশি আলোচনা না ক'রে, শুধু এইটুকু বলে রাখি যে, জয়েৎ কল্যাণে পঞ্চম বাদী স্বর অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ। আর ঋষভ সম্বাদী হলেও, আরোহের সময় তাকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাখা হয়। ধৈবত-ও এতে দুর্বল। জয়েৎ কল্যাণের আরোহ-অবরোহের স্বরূপ হ'ল—সা রে গ প ধ র্সা। র্র র্সা ধ প গ রে সা।

উপরোক্ত তিনটি রাগের স্বর সমষ্টি এক হওয়া সত্বেও, শুধু স্বরগুলি প্রয়োগের বৈশিষ্ট্যে একটি থেকে আরেকটি বাঁচিয়ে বিভিন্ন রসের সৃষ্টি করাই

হ'ল ভারতীয় রাগ সঙ্গীতের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আর এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে যথাযথভাবে শিক্ষা তথা আয়ত্ব করতে হ'লে গুরুমুখী 'তালিম' এবং উপযুক্ত অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। পৃষ্ঠান্তরে (১৫২ পৃঃ) ভূপালী ও দেশকার রাগের সমতা-বিভিন্নতা দেখানো হয়েচে।

॥ পাহাড়ী ॥

ঠাট—বিলাবল। প্রকৃতি ক্ষুদ্র। জাতি ঔড়ব। ম ও নি বর্জিত, অবশিষ্ট স্বর ক'টি শুদ্ধ। বাদী সা, সম্বাদী প। যে কোন সময়েই পরিবেশন করা চলে।

আরোহ ॥ সা রে গ প ধ র্সা।

অবরোহ ॥ র্সা ধ প গ প গ রে সা ধ্।

পকড় ॥ গ, রে সা, ধ্, প্ ধ্ সা।

ন্যাস স্বর ॥ সা, গ, প ও ধ।

ক্ষুদ্র প্রকৃতির এই রাগটি নিয়েও মতভেদ আছে। আমরা একে-একে সেগুলি দেখব।···

উপরোক্ত আরোহ-অবরোহ দেখেই বোঝা যাচ্চে যে এর স্বর-সাম্য ভূপালী বা দেশকার রাগের মত। কিন্তু যে কারণে একই জাতি এবং স্বর সমন্বয় হওয়া সত্ত্বেও ভূপালী থেকে দেশকার পৃথক রাগ, ঠিক সেই কারণেই—ভূপালীর কিছু ছায়া পড়লেও, পাহাড়ী একটি স্বতন্ত্র রাগ রূপে পরিচিত।

প্রথমেই দেখুন, উক্ত দুটি রাগের বাদী-সম্বাদী থেকে আলোচ্য রাগটির বাদী-সম্বাদীর ভিন্নতা। ভূপালীর বাদী গ, দেশকারের ধ কিন্তু পাহাড়ীর বাদী স্বর হ'ল সা।

পঞ্চম স্বরটিও অবশ্য দেশকার ও ভূপালী রাগে অপ্রধান নয়। উভয় রাগেই পঞ্চমের ওপর ন্যাস করা হয়, বরং দেশকারে পঞ্চমের স্থান ভূপালী অপেক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এদিকে পাহাড়ীতে পঞ্চম হ'ল সম্বাদী স্বর। এই রাগগুলির সঙ্গে আরেকটি রাগের স্বরসাম্য হুবহু এক রকমের। সেটি হ'ল জয়েৎ কল্যাণ। পঞ্চম হ'ল জয়েৎ কল্যাণের প্রাণ স্বরূপ অর্থাৎ বাদী স্বর। অতএব উপরোক্ত তিনটি রাগ অপেক্ষাই পঞ্চম জয়েৎকল্যাণে সর্বাপেক্ষা প্রধান।

বাদী-সম্বাদী না হওয়া সত্ত্বেও পঞ্চম যেমন ভূপালী ও দেশকারে উপেক্ষণীয়

নয়, ধৈবত তেমনি পাহাড়ীতে একটি বিশিষ্ট স্থান জুড়ে বসে আছে। পাহাড়ীতে ধৈবত হ'ল গুরুত্বপূর্ণ রাগবাচক ন্যাস স্বর—বিশেষ করে মন্দ্র সপ্তকে।

এই রাগের স্বরবিস্তার বেশির ভাগই মন্দ্র-মধ্য সপ্তকেই থাকে।

ভূপালীর প্রভাব থেকে পাহাড়ীকে বাঁচাবার জন্য কোন কোন ঘরানায় মধ্যম ও নিষাদকে প্রয়োগ করা হয়—অবশ্য দুর্বল ভাবে। তাঁদের মতে এটি সম্পূর্ণ জাতীয়।

কোন কোন ঘরের গানে উভয় গান্ধার ও উভয় নিষাদও ব্যবহার করতে দেখা যায়।

সেনী ঘরানায় এর জাতিকে মানা হয় ঔড়ব-সম্পূর্ণ রূপে। তাঁরা আরোহে গ ও নি বর্জিত করেন। বাদী-সম্বাদী যথাক্রমে ধ ও রে। আরোহাবরোহের চেহারা হ'ল—

আরোহ॥ সা রে ম প ধ র্সা।
অবরোহ॥ র্সা নি ধ প ম গ রে গ সা।
পকড়॥ ধ প ধ র্সা, নি ধ প ধ ম গ রে গ সা।

এই ঘরানার পাহাড়ীর স্বরূপ—

সা রে ম, ম গ রে গ সা, ধ প ধ র্সা, নি ধ প, ধ ম গ রে গ সা।

এঁদের বিস্তার ক্ষেত্র সীমিত মধ্য ও তার স্থানে।

পাহাড়ী সম্বন্ধে পণ্ডিত ভাতখণ্ডের মত সঠিক বোঝা যায় না। কারণ, তিনি তাঁর রচিত "রাগচন্দ্রিকাসারের" দোহায় বলেচেন :

"মধ্যম মৃদু তীখে সবহি অতি থোরে মনি লাগ।
সপ বাদী সম্বাদিতেঁ হোত পাহাড়ী রাগ॥"

অর্থাৎ অল্প পরিমাণে ম ও নি লাগবে। তাঁর ক্রমিক পুস্তকমালিকায় (৫ম খণ্ড॥ পৃঃ ২৩৫) বর্ণিত রাগ বিবরণ এবং স্বর বিস্তারেও (৫ম খণ্ড॥ পৃঃ ৪৯৪) সেই কথারই সমর্থন আছে। কিন্তু তাঁরই রচিত "অভিনবরাগ-মঞ্জরী"তে বলচেন অন্য কথা :

"গরী সধৌ পধৌ সশ্চ গপৌ ধপৌ গরী সধৌ।
মন্দ্রমধ্যস্বরা গাংশা পাহাড়ী মনিবর্জিতা॥

অর্থাৎ ম ও নি এ রাগে বর্জিত। এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যায় তাঁর

প্রদত্ত "উঠাও" ও "চলন"-এ (ক্রমিক পুস্তকমালিকা ॥ ৪র্থ খণ্ড ॥ পৃঃ ২৩৬), কিংবা তাঁরই রচিত গানে "মুরলী মধুর ধ্বনি চতুর সুনাওয়ত" (ক্রঃ পুঃ মালিকা ॥ পৃঃ ২৩৭)। উদাহরণ স্বরূপ নিচের উদ্ধৃতি দেখুন।

॥ উঠাও ॥

গ, রে সা, ধ্, প্ ধ্ সা, গ প ধ প, গ, রে সা ধ্।

॥ চলন ॥

গ, রে সা, ধ্, প্ ধ্ সা | গ গ ধ প, গ, রে সা ধ্, ধ, রে গ,

প
সা, ধ্, প্ ধ্ সা | গ প, ধ র্সা, ধ প, গ রে, ধ্ সা রে গ,
সা ধ্, প্ ধ্ সা।

॥ স্বর-বিস্তার ॥

(১) সা, রে গ, গ রে, সা রে গ রে, সা রে সা, নি্ ধ্, প্,
ধ্ সা রে গ, গ ম গ রে, গা রে গ সা, নি্ ধ্, গ, রে সা।

কোন কোন মতে পাহাড়ীকে সম্পূর্ণ জাতিরও বলা হয়। এই মতে দুই নিষাদেরই ব্যবহার আছে এবং বাদী-সম্বাদী যথাক্রমে ম ও সা। আরোহ-অবরোহের ক্রমঃ সা রে গ ম প ধ নি র্সা; র্সা ণি ধ প ম গ রে সা।

॥ মাঁড় ॥

ঠাট—বিলাবল। প্রকৃতি চঞ্চল। জাতি বক্র-সম্পূর্ণ। বাদী সা, সম্বাদী প। পূর্বাঙ্গের রাগ। সা, ম ও প এই স্বর ক'টি এ রাগে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। নিষাদ আন্দোলিত। আরোহে রে ও ধ দুর্বল এবং অবরোহে বক্রভাবে লাগে। সব সময়েই পরিবেশন করা যেতে পারে।

আরোহ ॥ সা গ রে ম গ প ম ধ প নি ধ র্সা।
অবরোহ ॥ র্সা ধ নি প ধ ম প গ ম সা।
পকড় ॥ র্সা, নি ধ, ম, প গ, ম, সা।
ন্যাস স্বর ॥ সা, গ, ম, প ও ধ।

বিভিন্ন গুণীদের কাছ থেকে আমরা শুনেচি এবং গ্রন্থাদি পাঠে জেনেচি যে, ভারতীয় রাগ সঙ্গীতের অনেকগুলি রাগ গ্রাম্য-গীত বা লোক-সঙ্গীতের সুর থেকে গ্রহণ করা হয়েচে। মাঁড়, মাঁড বা মাণ্ড্ রাগটিও তেমনি মালওআ ও রাজপুতানার লোকগীত থেকে গৃহীত হয়েচে। ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে এই রাগটি খুবই প্রিয় এবং অতি সুন্দর ভাবে তাঁরা এটিকে পরিবেশন করেন। যদিও রাগ-সঙ্গীতের পোষাক পরিয়ে অর্থাৎ রাগের নিয়ম শৃঙ্খলার ছাঁচে ফেলে একে দরবারী গায়নের উচ্চতর মর্যাদা দেবার চেষ্টা করা হয়ে থাকে, তবু এখনো অনেক গুণীই মাঁড়কে 'ধুন্' পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করেন।

ওপরে এই রাগের যে পরিচয় দেওয়া হয়েচে, সেটি পঃ ভাতখণ্ডের মত অনুযায়ী। এখানেও পণ্ডিতজীর মত স্ববিরোধিতা দোষে দুষ্ট দেখা যায়। পণ্ডিতজী তাঁর 'রাগচন্দ্রিকাসার'-এর দোহায় বলচেন: মধ্যম মৃদু তীবর সবৈঁ বক্র সজত অবরোহী। স-ম বাদী সম্বাদিতে মাঁড রাগ সুকহোহি॥ অথচ রাগ-বিবরণীতে বলচেন বাদী স্বর ষড়্জ ও সম্বাদী স্বর পঞ্চম। অনেকে এই রাগের সম্বাদী স্বর মধ্যম-কেও মানেন। বাদী-সম্বাদী নিয়ে আরো মতভেদ আছে। যেমন:—

এক মতে॥ বাদী সা, সম্বাদী প
দ্বিতীয় মতে॥ বাদী সা, সম্বাদী ম
তৃতীয় মতে॥ বাদী ম, সম্বাদী সা
চতুর্থ মতে॥ বাদী প, সম্বাদী গ

শাস্ত্রীয় অভ্যুচ্ছ্রয় নামক অলংকার থেকে এই রাগটির উৎপত্তি হয়েচে বলে মনে করা হয়। এর স্বরূপ বক্র গতির। সেই জন্য অনেকে একে সম্পূর্ণ বা বক্র-সম্পূর্ণ জাতির রাগ বলেন এবং আরোহাবরোহের স্বরূপ দেখান উপরোক্তভাবে। ভাতখণ্ডেজীও তাই বলচেন। তিনি বলেচেন: আরোহে রে ও ধ দুর্বল এবং অবরোহে বক্র ভাবে প্রযুক্ত হয়। কিন্তু তাঁর দেওয়া অবরোহে বা রাগ-বাচক (পকড়) স্বর সমষ্টিতে ঋষভের কোন নাম-গন্ধ নেই।

ভিন্ন মতে এর জাতিকে বলা হয় ঔড়ব-সম্পূর্ণ। এই মতে, আরোহে গ ও নি বর্জিত ক'রে বিলাবল ঠাটের দুর্গার মত দেখান হয়। যথা:

আরোহ॥ সা রে ম প ধ র্সা।
আরোহ॥ র্সা নি ধ প ধ প ম গ রে গ সা।

এই মতেরই ভিন্ন প্রকার অবরোহ॥ র্সা নি ধ প ধ ম গ গ রে সা

এর আরোহে কোন বক্রত্ব দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু অবরোহের স্বরূপ বক্র। এই মতাবলম্বীদের মধ্যে কেউ বলেন সা বাদী, প সম্বাদী কেউ বা মধ্যম ও ষড়্জকে যথাক্রমে বাদী-সম্বাদী মানেন।

কোন কোন গুণীকে দুই মধ্যম ও দুই নিষাদের প্রয়োগ করতেও দেখা যায়।

ঠাট নিয়েও মতানৈক্য আছে। কোন কোন মতে একে খমাজ ঠাটের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেই মতে এর জাতি সম্পূর্ণ। অবরোহ বক্র গতির। বাদী প, সম্বাদী গ। (এই সম্বাদ শাস্ত্রীয় নিয়মের ব্যতিক্রম) সা ম ও প প্রবল। নি কম্পিত। অবরোহে রে ও ধ কম লাগে। ম-ধ স্বর-সঙ্গতি করা হয়। সর্বকালিক রাগ।

পরিবেশনের সময় সম্বন্ধেও মতবিরোধ দেখুন :—

(১) সর্বকালিক।
(২) রাত্রিকাল—(কোন প্রহর নির্ধারিত নেই)।
(৩) রাত্রি তৃতীয় প্রহর।

॥ আসা ॥

ঠাট—বিলাবল। প্রকৃতি ক্ষুদ্র। জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে গ ও নি বর্জিত। বাদী ম, সম্বাদী সা। পূর্বাঙ্গের রাগ। পরিবেশনের সময় রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।

আরোহ॥ সা রে ম প ধ র্সা।
অবরোহ॥ র্সা নি ধ প ম গ রে সা।
পকড়॥ ধ, প ধ প ম গ রে, সা রে গ, রে সা।
ন্যাস॥ সা রে ম প ধ।

নামটির বানান দু' রকম দেখা যায়—আসা কিংবা আশা। যদিও বানানের পার্থক্যে অর্থ ভিন্ন হয়ে যায় কিন্তু ওরূপ কোন অর্থের সঙ্গে আশা বা আসা রাগের কোন সম্পর্ক আছে কি না তা আমার জানা নেই।

দেখেই বোঝা যাচ্ছে আরোহ বিলাবল ঠাটের দুর্গা এবং অবরোহ বিলাবলের মত। শুধু দুর্গা কেন, আসার আরোহের সঙ্গে মাঁড় রাগের একটি প্রকারের আরোহেরও হুবহু মিল আছে।

দুর্গার বাদী-সম্বাদীর সঙ্গেও আসার বাদী-সম্বাদী মেলে। কোন কোন মতে দুর্গার বাদী-সম্বাদী যথাক্রমে ম ও সা।

আসার আরেকটি প্রকার আছে সেটি খমাজ ঠাটান্তর্গত। তার পরিচয় নিম্নরূপ।

ঠাট—খমাজ। জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে গ ও নি বর্জিত। অবরোহে রে ব্যবহৃত হ'লেও তাতে স্থায়িত্ব নেই। অবরোহণে রে স্বরটিকে বক্রভাবে লাগানো হয়। শুদ্ধ নি এ রাগে লাগে না, অবরোহে কোমল নি লাগানো হয়। বাদী ধ, সম্বাদী গ।

আরোহ॥ সা রে ম প ধ র্সা।
অবরোহ॥ র্সা ণি ধ প ম গ সা।
ভিন্ন প্রকার॥ র্সা ণি ধ প ম গ রে সা।

ণি ধ প ধ ম গ রে গ সা—এই ভাবেও অবরোহ করেন অনেকে।

॥ কামোদ ॥

ঠাট—কল্যাণ। প্রকৃতি চঞ্চল। জাতি বক্র-সম্পূর্ণ। দুই মধ্যম ও অবশিষ্ট স্বরগুলি শুদ্ধ। গ ও নি দুর্বল। বিবাদী স্বর হিসেবে কোমল নিষাদও অল্প পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। বাদী প, সম্বাদী রে। মতান্তরে রে ও প। পূর্বাঙ্গের রাগ। পরিবেশনের সময় রাত্রি প্রথম প্রহর।

আরোহ॥ সা, রে, প, হ্ম প, নি ধ র্সা।
অবরোহ॥ র্সা, নি ধ, প, হ্ম প ধ প, গ ম প, গ ম রে সা।
পকড়॥ রে, প, হ্ম প, ধ প, গ ম প, গ ম রে সা।
ন্যাস স্বর॥ সা, রে ও প।

উপরোক্ত পরিচয় থেকেই বোঝা যাচ্চে যে এটি কল্যাণ ঠাটের দুই মধ্যম যুক্ত রাগ। অতএব ঐ বর্গের অন্যান্য রাগগুলির সমস্ত লক্ষণই এর মধ্যে পাওয়া যাবে। যেমন—

কামোদে তীব্র মধ্যম অপেক্ষা শুদ্ধ মধ্যমের প্রাধান্যই বেশি এবং তীব্র ম শুধু আরোহের সময় কিন্তু শুদ্ধ মধ্যম আরোহ-অবরোহ—দুই ভাবেই লাগে।

গ ও নি স্বর দুটি এতে দুর্বল এবং আরোহে নি ও অবরোহে গ বক্র ভাবে লাগে। অবশ্য কামোদের চলন এমনিতেই বক্র, কাজেই গ ও নি ছাড়া অন্য স্বরও বক্র ভাবেই প্রয়োগ করা হয়।

অবরোহের সময় বিবাদী স্বর হিসেবে কোন কোন সময় কোমল নিষাদও লাগানো হয় অল্প পরিমাণে।

কামোদের অন্তরা ওঠার সময় মধ্য প থেকে সোজা তার র্সা-তে যেতে হয়।

এই সবগুলি বৈশিষ্ট্যই কল্যাণ ঠাটের দুই মধ্যম যুক্ত যেকোন রাগের মধ্যেই পাওয়া যায়।

এবার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলির ওপর দৃষ্টি ফেরানো যাক।

কামোদের আরোহে গ একেবারেই লাগচে না অথচ বলা হচ্চে জাতি সম্পূর্ণ; এটা কেমন ক'রে সম্ভব? আগেই বলেচি গ এতে দুর্বল এবং বক্র ভাবে লাগে। যদিও আরোহের সময় সা রে গ ম বলে সোজাসুজি গান্ধার লাগানো হয় না কিন্তু যখনই গ লাগানো হয়েচে, তখনই গান্ধারের পর মধ্যম লেগেচে—ঋষভ লাগেনি। যেমন, গ ম প কিংবা গ ম রে। সেই জন্যই বলা হয়েচে সম্পূর্ণ। আর গান্ধার এতে দুর্বল এবং বক্র বলেই আরোহের সময় সা রে বলার পর সোজা পঞ্চমে যাওয়া হয় মাঝের স্বরগুলিকে লঙ্ঘন ক'রে।

সা থেকে প পর্যন্ত যাওয়ার সময় স্বর প্রয়োগের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, আরোহের সা-এর পর রে বলার সময় শুদ্ধ মধ্যমের কণ্ লাগিয়ে ঋষভের উচ্চারণ হবে অথবা সা-এর পর শুদ্ধ মধ্যম বলে তারপর রে বলে তবে

পঞ্চমে যাওয়া হয়। যেমন—সা, ^মরে প অথবা সা, ম রে প। রে ও প স্বর দুটির সঙ্গতি (বা সম্বাদ) এই রাগের অরেকটি মাধুর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

অবরোহের সময় আবার ঋষভকে ষড়্জ যুক্ত করে বলতে হয়। যেমন—

গ ম প, গ ম ^{সা}রে সা।

এই বৈশিষ্ট্যগুলি শুধু পড়ে বোঝা যায় না। গুরু-মুখ থেকে না শুনলে কোন রাগই যথাযথ শিক্ষা করা যায় না।

॥ ছায়ানট ॥

ঠাট—কল্যাণ। প্রকৃতি শান্ত। জাতি সম্পূর্ণ। দুই মধ্যম ও অবশিষ্ট স্বরগুলি শুদ্ধ। বাদী প, সম্বাদী রে। মতান্তরে রে ও প। পূর্বাঙ্গের রাগ। পরিবেশনের সময় রাত্রি প্রথম প্রহর।

আরোহ ॥ সা, রে, গ ম প, নি ধ, র্সা।
অবরোহ ॥ র্সা নি ধ প, হ্ম প ধ প, গ ম রে সা।
পকড় ॥ প — রে —, গ ম প, ম গ, ম ম রে —, সা।
ন্যাস স্বর ॥ রে, প ও ধ।

কল্যাণ ঠাটের দুই মধ্যম যুক্ত পর্যায়ের অন্যতম রাগ হ'ল ছায়ানট। কাজেই ঐ শ্রেণীর সমস্ত বৈশিষ্ট্যই এই রাগে পাওয়া যায়। যেমন—

ছায়ানটে শুদ্ধ মধ্যমই বেশি লাগে এবং আরোহ ও অবরোহ উভয় ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়। কিন্তু তীব্র মধ্যম শুধু অবরোহ গতিতে খুব অল্প পরিমাণে লাগে। ওপরের আরোহাবরোহ দেখুন।

গান্ধার (অবরোহে) এবং নিষাদ (আরোহে) অল্প পরিমাণে বক্রভাবে ব্যবহৃত হয়। আরোহ-অবরোহের দিকে তাকালেই দেখতে পাবেন। অবশ্য দ্রুত তান করার সময় এই নিয়মের লংঘন করা হয়—যা দোষণীয় মনে করেন না গুণীরা।

আরেকটি স্বর এতে অল্প পরিমাণে ব্যবহার করা হয় বিবাদীরূপে। সেটি হ'ল কোমল নিষাদ।

ছায়ানট রাগের অন্তরাগুলি সাধারণতঃ মধ্য সপ্তকের পঞ্চম থেকে সোজা তার সা-তে উঠে যায়। যথা: প প র্সা বা প ধ প র্সা। ব্যতিক্রম হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে "ক্রমিক পুস্তকমালিকা"য় (৪র্থ খণ্ড) দেওয়া কয়েকটি মাত্র ছায়ানটের অন্তরা। যেমন—

"ভরি গগরি মোরি" গানটির অন্তরার উঠান: পধ নি ধ নিনি র্সা।

"প্যারি নবলি লাডলী"—গানটির অন্তরার উঠান: প নি ধ র্সা।

ঐ গ্রন্থে বর্ণিত বাইশটি রাগের মধ্যে মাত্র উপরোক্ত দুটি গানেই ভিন্ন রকম উঠান দেখা যায়। তাই বলা হ'ল ব্যতিক্রম।

অনেকে মনে করেন, ছায়া ও নট নামক রাগ দুটির মিশ্রণে ছায়ানট-এর

সৃষ্টি হয়েচে। জানি না এই সৃষ্টি রহস্য কতটা ঠিক। তবে নটের অঙ্গ হিসেবে ছায়ানটের এক জায়গায় একটুখানি মিল পাওয়া যায়।—দুটিতেই রে গ ম প সমষ্টির প্রয়োগ হয়। কিন্তু দুটির প্রয়োগভঙ্গী এক নয়। যেমন—

নট॥ সা রে সা, গ ম —, ম প ম, গ ম —,
রে গ ম প, ম গ, ম —, রে সা।

ছায়ানট॥ সা রে সা, রে —, গ ম প, ম গ, ম রে —
সা। সা রে সা, প — রে —, রে গ ম প,
ম গ ম রে —, সা রে সা।

এই জন্যই পরীক্ষার্থীদের কাছে প্রশ্ন করা হয়, ছায়ানটের মধ্যে নটের অঙ্গ কোন জায়গায় এবং তার সঙ্গে ছায়ানটকে কি ভাবে জুড়ে দেওয়া হয়েচে!

মনে রাখবেন, নট হ'ল বিলাবল ঠাটের, তীব্র মধ্যম তাতে লাগে না। তার চলনও বিলাবল অঙ্গের। অপর পক্ষে ছায়ানট—কল্যাণ ঠাটের রাগ, তাতে উভয় মধ্যম লাগে এবং চলনও কল্যাণ-ভঙ্গিম। নটের জাতি সম্পূর্ণ-ঔড়ব। বাদী-সম্বাদী ম ও সা। আরোহাবরোহ: সা রে গ ম প ধ নি র্সা। র্সা নি প ম রে সা। দুটিরই পরিবেশন-সময় রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।

আলাহিয়া-বিলাবলের সঙ্গেও ছায়ানটের কিছুটা সাদৃশ্য দেখা যায়, যখন ছায়ানটে ম নি ধ প বলা হয়। এই সমষ্টি আলাহিয়া ও ছায়ানট দুটিতেই লাগে। কিন্তু তার পরের স্বরগুলিই দুটিকে পৃথক করে দেয়। যেমন—

আলাহিয়া বিলাবল॥ ম নি ধ প, ম গ প ম গ — রে সা রে সা।

ছায়ানট॥ ম নি ধ প — রে — গ ম প, গ ম রে — সা।

এই প্রয়োগগুলি আপনাদের গুরুদেবের কাছ থেকে শুনে নিলে পার্থক্যটা খুব ভালো ভাবে বুঝতে পারবেন।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, দুই মধ্যমযুক্ত কেদার, কামোদ, হম্বীর, ছায়ানট প্রভৃতি রাগগুলিকে প্রাচীন গুণীরা বিলাবল ঠাটের অন্তর্ভুক্ত করেচেন। সম্ভবতঃ শুদ্ধ মধ্যমের প্রাধান্যই এর প্রধান কারণ, যে কারণে বেহাগ বিলাবল ঠাটের রাগ।

যদি স্বর-সাম্যের দিকে লক্ষ্য রেখে বিচার করা হয়, তাহ'লে সত্যিই ওগুলির বিলাবল ঠাটই হওয়া উচিত। কিন্তু ভাতখণ্ডেজী কোন কোন ক্ষেত্রে স্বরূপ-সাম্যের দিকেও লক্ষ্য রেখেছিলেন। সেই হিসেবেই তিনি উক্ত রাগগুলিকে কল্যাণ ঠাটান্তর্গত করেচেন বলে মনে হয়।

এই রাগে ব্যবহৃত স্বরগুলির পরিমাণ নিম্নরূপ ঃ—

ষড়্জ—সামান্য।

ঋষভ সম্বাদী স্বর এবং উভয়প্রকার (অভ্যাস ও অলংঘনমূলক) বহুত্বপূর্ণ।

গান্ধার ও মধ্যমের বহুত্ব অলংঘনমূলক।

পঞ্চমের বহুত্ব উভয়প্রকার। বাদী স্বর।

ধৈবত অবরোহে অলংঘন বহুত্ব। অন্তরার আরোহে লংঘনমূলক অল্পত্ব হয় যখন প থেকে সোজা তার-ষড়্জে যাওয়া হয়।

নিষাদ কখনো লংঘন-অল্পত্ব, কখনো অনভ্যাসমূলক অল্পত্ব।

॥ শুদ্ধ কল্যাণ ॥

ঠাট—কল্যাণ। প্রকৃতি গম্ভীর। জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে ম ও নি বর্জিত। মতান্তরে ঔড়ব-ঔড়ব ও ঔড়ব-ষাড়ব। বাদী গ, সম্বাদী ধ। ভিন্ন মতে রে ও প। পূর্বাঙ্গের রাগ। আলাপ ও স্বরবিস্তারের ক্ষেত্র প্রধানতঃ মন্দ্র-মধ্য সপ্তকের মধ্যে সীমিত। উত্তরাঙ্গের আলাপ সাধারণতঃ তার সপ্তকের গান্ধার পর্যন্ত হয়ে থাকে। পরিবেশনের সময় রাত্রি প্রথম প্রহর। প-রে সঙ্গতি খুব চিত্তাকর্ষক ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

আরোহ॥ সা, রে, গ, প ধ র্সা।

অবরোহ॥ র্সা নি ধ প, হ্ম গ, রে সা।

ভিন্ন মতে॥ র্সা নি ধ প, গ, রে সা।

পকড়॥ গ, রে সা, নি্ ধ্ প্, সা, গ রে, প রে সা।

ন্যাস স্বর॥ সা, রে, গ ও প।

কল্যাণ ও ভূপালীর সংমিশ্রণে এই রাগটি যে কোন গুণী রচনা করেছিলেন

জানা যায় নি। এর আরোহ ভূপালী এবং অবরোহ কল্যাণ বা ইমনের মত। সেইজন্য অনেকে এটিকে ভূপকল্যাণ নামেও অভিহিত করেন।

কোন কোন মতে ভূপকল্যাণকে পৃথক রাগ বলা হয়। তা'র আরোহ-অবরোহ ক্রম হ'লঃ সা রে গ প ধ র্সা। র্সা ধ প গ রে সা। এই ভূপকল্যাণ রাগটিরই আরেক নাম হ'ল ভূপালী।...

অধিকাংশ গুণীর মতেই এটি কল্যাণ ঠাটের রাগ। তবে কোন কোন মতে বিলাবল ঠাটের অন্তর্ভুক্তও করা হয়।

ঠাট ছাড়াও, এর ক্রিয়াত্মক প্রয়োগ সম্বন্ধেও মতানৈক্য আছে।—এক মতে এটিতে তীব্র মধ্যম ও শুদ্ধ নিষাদ না লাগিয়ে সম্পূর্ণভাবে ভূপ অঙ্গে পরিবেশন করেন। অন্য মতে ঐ দুটি স্বর প্রয়োগ ক'রে কল্যাণ অঙ্গে পরিবেশিত হয়। ভিন্ন মতে তীব্র ম ও নি লাগানো হয় এবং পঞ্চম বর্জিত করা হয়। তবে হ্যাঁ, যাঁরা তীব্র ম ও শুদ্ধ নিষাদ প্রয়োগ করেন, তাঁরাও খুব অল্প পরিমাণেই তা লাগান।

আজকাল বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অবরোহের সময় খুব সামান্য পরিমাণে ম ও নি লাগিয়ে ভূপ অঙ্গের শুদ্ধ কল্যাণই বেশি শোনা যায়। এই রাগের খুব প্রচলিত মধ্য লয়ের খেয়াল "বাজো রে বাজো" গানটিকেই দেখুন (ক্রমিক পুস্তকমালিকা—৪র্থ ভাগ—পৃঃ ৬৬)। এর স্থায়ীতে মাত্র একজায়গায় তীব্র মধ্যমকে স্পর্শ স্বর হিসেবে প্রয়োগ করা হয়েচে কিন্তু নি একেবারেই নেই। অন্তরার মধ্যে কিন্তু তীব্র ম ও নিষাদকে শুধু কণ্ স্বর হিসেবেই নয়—নিষাদকে পপধনি সারেসানি এই ভাবেও নেওয়া হয়েচে।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প থেকে গ কিংবা রে পর্যন্ত এবং সা থেকে ধ পর্যন্ত মীড় সহযোগে তীব্র ম ও নি দেখানো হয়। যেমন বেহাগে দেখানো হয় রে ও ধ-কে—গ থেকে সা এবং নি থেকে প পর্যন্ত মীড়ের মাধ্যমে। তবে হ্যাঁ, তারই মধ্যে শুদ্ধ কল্যাণে তীব্র মধ্যম অপেক্ষা নিষাদকে অপেক্ষাকৃত প্রবল রাখা হয়। কোন কোন শিল্পী আরোহের সময়ও ম ও নি প্রয়োগ করেন কিন্তু তা খুবই দুর্বল ভাবে। নি যদি বেশি হয়, তাহলে যেমন কল্যাণের রূপ বেশি প্রকাশ পাবে তেমনি নি একেবারে বাদ দিলে জৈৎকল্যাণ রাগের ছায়াপাত ঘটবার সম্ভাবনা থাকে।

এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, প্রথম শ্রেণীর শিল্পীরা যখন কোন রাগে আর্ষ প্রয়োগ হিসেবে কোন বিবাদী স্বর ব্যবহার করেন, তখন তা এমন

মুন্সিয়ানার সঙ্গে—পরিমিত ভাবে প্রয়োগ করেন, যাতে রাগহানি হওয়া দূরের কথা, রাগের রঞ্জকতা বেড়ে যায় অনেকখানি। কিন্তু সাধারণ শিক্ষার্থী-শিল্পীরা—যাঁদের এখনও সেই পরিপক্বতা বা দক্ষতা আসে নি—তাঁরা যখন মহাজনদের অনুসরণ বা অনুকরণ করার প্রয়াস পান, তখন বেসামাল হয়ে পড়েন।…আলোচ্য রাগে মধ্যম ও নিষাদ প্রয়োগ করা সম্বন্ধেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। খেয়াল গানে তান করার সময় অবশ্য এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে, সে সময় মধ্যম ও নিষাদের প্রত্যক্ষ প্রয়োগকে ত্রুটি হিসেবে ধরা হয় না, তবু অনেকে দ্রুত তানের সময় এই স্বর একেবারে বাদও দিয়ে দেন। কিন্তু আলাপ-বিস্তারের সময় স্বরের প্রয়োগ সম্বন্ধে সচেতন থাকা উচিত।

ছায়ানট রাগের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা জেনেচি যে, কল্যাণ ঠাটের রাগগুলিকে প্রধানতঃ তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েচে। যেমন—

(১) যে রাগগুলিতে শুধু তীব্র মধ্যম লাগানো হয়। যেমন—ইমন, হিণ্ডোল প্রভৃতি।

(২) যে রাগগুলিতে দুই মধ্যমই ব্যবহৃত হয়। যেমন—কেদার, হমীর প্রভৃতি।

(৩) যে রাগগুলিতে ম ও নি একেবারেই বর্জিত অথবা খুবই সামান্য লাগানো হয়। যেমন ভূপালী, শুদ্ধ কল্যাণ প্রভৃতি।

২য় ও ৩য় পর্যায়ের রাগগুলিতে তীব্র মধ্যম গৌণ বা বর্জিত হওয়া সত্ত্বেও কল্যাণ অঙ্গের প্রাধান্য থাকায় এগুলিকে কল্যাণ ঠাটের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েচে।

কল্যাণ অঙ্গ বলতে কী বোঝায়, সে বিষয়ের অবতারণা আপাততঃ স্থগিত রাখা হ'ল—গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায়। তাছাড়া বিষয়টি প্রয়োগাত্মক। পড়ে শেখার চাইতে শুনে শেখাই বিধেয়। তাই নিজ নিজ আচার্যদেবের নিকট থেকেই আপনারা বিষয়টি বুঝে নেবেন।

প-রে সঙ্গতি এই রাগে খুব মনোরঞ্জক হয়, তা আগেই বলেচি। অন্যান্য আরো কয়েকটি রাগেও প-রে সঙ্গতি খুব চিত্তাকর্ষক হয়। কিন্তু প্রত্যেকটির প্রয়োগ স্বতন্ত্র। এই রাগে প এবং রে, দুটির ওপরেই থামার পর সা-এ এসে দাঁড়াতে হয়। যেমন, প—রে—সা। গৌড়সারং রাগ আলোচনার সময় অন্যান্য রাগের প-রে স্বরের প্রয়োগ কৌশল বুঝিয়ে দেওয়া হয়েচে। ভূপালীর

প্রভাব থেকে শুদ্ধ কল্যাণকে বাঁচাবার জন্য নিষাদের প্রয়োগ, প-রে সঙ্গতি এবং মন্দ্র সপ্তকের বিস্তার যথাযোগ্য ভাবে করা উচিত। এই রাগের স্বর-পরিচিতি নিম্নরূপ।—

সা, রে, গ ও প স্বর ক'টি এই রাগে অলংঘন ও অভ্যাসমূলক বহুত্ব রূপে প্রযোজ্য। গ এই রাগের বাদী স্বর।

ক্ষ—আরোহে বর্জিত। অবরোহে অনভ্যাসমূলক অল্পত্ব।

ধ—অলংঘনমূলক বহুত্ব। সম্বাদী স্বর।

নি—আরোহে বর্জিত। অবরোহে মত বিশেষে লংঘনমূলক অথবা অনভ্যাসমূলক অল্পত্ব।

॥ গৌড়সারং ॥

ঠাট—কল্যাণ। প্রকৃতি শান্ত। জাতি সম্পূর্ণ (বক্রগতি)। মধ্যম শুদ্ধ ও তীব্র দুই-ই লাগে; অবশিষ্ট স্বরগুলি শুদ্ধ। বাদী গ, সম্বাদী ধ। পূর্বাঙ্গের রাগ। পরিবেশনের সময় দ্বিপ্রহর।

আরোহ॥ সা, গ রে ম গ, প ক্ষ ধ প, নি ধ র্সা।

অবরোহ॥ র্সা ধ নি প, ধ ক্ষ প, গ ম রে, প, রে সা।

পকড়॥ সা, গ রে ম গ, প, রে সা।

ন্যাস স্বর॥ সা, গ ও প।

কল্যাণ ঠাটের রাগগুলিকে প্রধানতঃ যে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েচে, গৌড়সারং রাগটি তা'র দ্বিতীয় পর্যায়ের মধ্যে পড়ে। এই পর্যায়ের রাগগুলিতে তীব্র মধ্যম গৌণ বা বর্জিত হওয়া সত্ত্বেও, কল্যাণ অঙ্গের প্রাধান্য থাকায় এগুলিকে ঐ ঠাটের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েচে। তৃতীয় পর্যায়ের রাগগুলি সম্বন্ধেও গুণীদের বক্তব্য একই।

গৌড় ও সারং (বৃন্দাবনী সারং) নামে দুটি পৃথক রাগ আছে। মনে হয়, গৌড়সারং-এর জন্ম হয়েচে ঐ রাগ দুটির সংমিশ্রণে।

গৌড়-এর বৈশিষ্ট্য হ'ল রে গ রে ম গ—এই স্বরসমষ্টি। গৌড়সারং-এর মুখ্য স্বরসমষ্টিও হ'ল গ রে ম গ। কাজেই দুটির মধ্যে মিল পাওয়া যাচ্চে।

সারং-এর রাগজ্ঞাপক স্বরসমন্বয় হ'ল—ম রে প রে। গৌরসারং-এর অবরোহেও আমরা দেখতে পাই ম রে প রে।

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে, ঐ রাগ দুটির কিছু প্রভাব গৌড়সারং-এর মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই রাগের এমন একটি নিজস্ব গুণ আছে, যার দ্বারা সে পৃথক রাগ হিসেবে পরিচিত হবার দাবী রাখে।

আগেই বলেছি, এটি দুই মধ্যমযুক্ত কল্যাণ ঠাটের রাগ। কাজেই, এই পর্যায়ের রাগগুলির বৈশিষ্ট্য গৌড়সারং-এ আছে। এতে তীব্র মধ্যম অপেক্ষা শুদ্ধ মধ্যমের প্রয়োগ বেশি এবং তীব্র মধ্যম শুধু আরোহ গতিতে সামান্য পরিমাণে প্রযোজ্য। যেমন—হ্ম ধ প, কিংবা হ্ম প।

উক্ত পর্যায়ের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, এই রাগগুলির আরোহে নি এবং অবরোহে গ বক্রভাবে লাগানো হয়। অধিকন্তু আরোহে নি ও অবরোহে গ দুর্বল থাকে। আলোচ্য রাগেও এই নিয়ম প্রযোজ্য।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য: এই রাগগুলিতে বিবাদী স্বর হিসেবে সামান্য পরিমাণে কোমল নিষাদও লাগানো হয় বিশেষ নৈপুণ্যের সঙ্গে। বহু প্রচলিত মধ্য লয়ের খেয়াল "পল না লাগি মোরী" (পঃ ভাতখণ্ডের ক্রমিক পুস্তকমালিকা, ৪র্থ খণ্ড) গানটির স্থায়ীতে পাবেন এই সামান্য কোমল নিষাদের প্রয়োগ। যেমন—

সা
ধ্ ণি্ প্ —
আ ০ ওয়ে ০

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হ'ল: এই পর্যায়ের রাগগুলির অন্তরা বেশির ভাগই মধ্য সপ্তকের পঞ্চম থেকে সোজা তার সপ্তকের ষড়্জে গিয়ে ওঠে।

আপনারা কল্যাণ ঠাটের দুই মধ্যমযুক্ত যে রাগগুলি (কেদার, কামোদ, হাম্বীর, ছায়ানট, গৌড়সারং প্রভৃতি) শিখেছেন, তা'র মধ্যে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি পাওয়া যায় কিনা দেখবেন।

গৌড়সারং-এ প-রে সংগতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং মুখ্য। ছায়ানট, শুদ্ধ কল্যাণ, জয়জয়ন্তী প্রভৃতি রাগেও এই সংগতি আমরা পেয়ে থাকি। কিন্তু প্রত্যেকটির প্রয়োগকৌশল ভিন্ন রকমের। যেমন—

গৌড়সারং-এ পঞ্চমের ওপর একটু দাঁড়িয়ে তবে ঋষভে যাওয়া হয় এবং ঋষভে না থেমেই নেমে আসা হয় ষড়্জে। যথা: প — রে সা।

ছায়ানট-এ কিন্তু পঞ্চমের বদলে ঋষভের ওপর থেমে ষড়্‌জে এসে পৌছায়। যথা : প রে — সা।

শুদ্ধ কল্যাণ-এ পঞ্চম ও ঋষভ - দুটির ওপরেই থেমে সা-তে যাওয়া হয়। যথা : প — রে — সা।

জয়জয়ন্তীতে কোন অসুবিধে নেই। কারণ এ-রাগে একই সপ্তকের মধ্যে পঞ্চম-ঋষভের সংগতি স্থাপন করা হয় না। হয় মন্দ্র প থেকে মধ্য রে অথবা মধ্য প থেকে তার রে-তে হবে এর প-রে সঙ্গতি।

গৌড়সারং-কে অনেকে বিলাবল ঠাটের অন্তর্গতও করেন।

॥ হিণ্ডোল ॥

ঠাট - কল্যাণ। প্রকৃতি গম্ভীর। জাতি ঔড়ব। রে ও প এ-রাগে সম্পূর্ণভাবে বর্জিত। ম তীব্র, অবশিষ্ট স্বরগুলি শুদ্ধ। বাদী ধ, সম্বাদী গ, উত্তরাঙ্গের রাগ। বিস্তার ক্ষেত্র প্রধানত মধ্য ও তার সপ্তক। নি এতে বক্রভাবে লাগে এবং দুর্বল। গমকের প্রাধান্য আছে। পরিবেশনের সময় দিবা প্রথম প্রহর।

আরোহ ॥ সা গ, হ্ম ধ নি ধ, র্সা।
অবরোহ ॥ র্সা, নি ধ, হ্ম গ, সা।
পকড় ॥ সা, গ, হ্ম ধ নি ধ, হ্ম গ, সা।
ন্যাস স্বর ॥ সা, গ ও ধ।

এটি প্রাচীন হ'লেও প্রাচীন কালের চেহারার সঙ্গে বর্তমানের হিণ্ডোলের মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

হিণ্ডোল বা হিন্দোলের যে পরিচয় ওপরে দেওয়া হয়েচে, তা ছাড়াও ত'ার আরেকটি পরিচয় পাওয়া যায় গুণী সমাজে। সেই মত অনুসারে গ ও ধ যথাক্রমে বাদী ও সম্বাদী। অতএব এটি পূর্বাঙ্গের রাগ এবং পরিবেশন সময় রাত্রি। এই মতটিও বিশেষ উপেক্ষণীয় নয়।

এই রাগের চেহারা—স্বরগত ভাবে—সোহিনীর মত। তফাৎ এই যে, সোহিনীতে রে লাগে, হিণ্ডোলে রে বর্জিত। অর্থাৎ সোহিনীর ঋষভকে বাদ দিলে হিণ্ডোলের কাঠামো তৈরী হয়ে যাবে।

সোহিনীতে নি সোজাসুজি এবং বেশি লাগে, হিণ্ডোলে লাগে বক্রভাবে এবং কম। যেমন :

সোহিনীর আরোহ ॥ সা গ, হ্ম ধ নি র্সা।

হিণ্ডোলের আরোহ ॥ সা গ, হ্ম ধ নি ধ, র্সা।

শুধু তাই নয়, উত্তরাঙ্গে নিষাদকে সতর্কতার সঙ্গে অল্প পরিমাণে ব্যবহার না করলে এতে সোহিনী, মারোয়া, পুরিয়া প্রভৃতি রাগের ছায়াপাত ঘটতে পারে। এইজন্য অনেকে নিষাদকে প্রায় লাগানই না।

পুরিয়া রাগে যেমন নিষাদ প্রবল, হিণ্ডোলে তেমনি ধৈবত প্রবল। পৃষ্ঠান্তরে এই দুটি রাগের তুলনা দেখুন (পৃঃ ১৫৫)।

অনেক সময় প্রশ্ন করা হয় : উত্তরাঙ্গে তার-ষড়্জ পর্যন্ত হিণ্ডোলকে কী ভাবে পুরিয়া থেকে পৃথক রাখা যায় ?

উত্তর দেবার সময় মনে রাখতে হবে, দু'টিই গম্ভীর প্রকৃতির রাগ হ'লেও হিণ্ডোলের চাইতে পুরিয়া বেশি গম্ভীর। আর মনে রাখতে হবে নি ও ধ-এর প্রয়োগকৌশল। পুরিয়াতে নি প্রবল,—সম্বাদী স্বর। হিণ্ডোলে ধ প্রবল—বাদী স্বর। সেইজন্য পুরিয়ার সময় নিষাদে ন্যাস করা চলে কিন্তু হিণ্ডোলে নিষাদের স্থান কি, তা আগেই বলেচি। হিণ্ডোলে ধৈবতের ওপর ন্যাস করা হয়। যেমন :

পুরিয়া ॥ হ্ম ধ নি, র্সা (অথবা হ্ম ধ নি, হ্ম ধ র্সা)।

হিণ্ডোল ॥ হ্ম ধ নি ধ, র্সা।

পূর্বাঙ্গে অবশ্য সে ভয় নেই, কারণ আগেই বলেচি, হিণ্ডোলে রে লাগে না। বস্তুতঃ এই ঋষভের জন্যই অন্য রাগগুলি থেকে হিণ্ডোলকে চিনে নেওয়া যায়।

বলতে পারেন : কোন কোন খ্যাতিমান শিল্পীকে ক্বচিৎ কখনো হিণ্ডোলে রে ও শুদ্ধ ম প্রয়োগ করতে দেখা যায়। তা'তে কি রাগরূপ ভ্রষ্ট হয় না ?

প্রশ্নের উত্তর কতকটা আপনার উত্তরের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রয়ে গেচে। আপনি নিজেই বলেচেন, "কোন কোন খ্যাতিমান শিল্পী" "ক্বচিৎ কখনো" ঐ স্বর দুটি প্রয়োগ করেন। এর দ্বারা বোঝা যাচ্চে, ঐ স্বর দুটি হিণ্ডোলের নিয়মিত স্বর নয়। কুশলী শিল্পীরা রাগরূপ বজায় রেখেও, বিশেষ মুন্সিয়ানার সঙ্গে উক্ত স্বর দুটি প্রয়োগ করার ক্ষমতা রাখেন। এই ক্ষমতা বা মুন্সিয়ানার জন্যই তাঁরা খ্যাতিমান।

হিণ্ডোলে ব্যবহৃত স্বরগুলির পরিমাণ নিম্নরূপ : –

সা—সামান্য। (তার ষড়্‌জ—বিশেষ)।

গ—অভ্যাস ও অলংঘনমূলক বহুত্ব।

হ্ম—অলংঘন-বহুত্ব।

ধ—উভয়প্রকার বহুত্ব।

নি—অল্প তথা বক্রভাবে প্রযোজ্য।

॥ জয়জয়ন্তী ॥

ঠাট—খমাজ। প্রকৃতি শান্ত। জাতি সম্পূর্ণ। দুই গ ও দুই নি ব্যবহৃত হয়। আরোহে ধৈবত দুর্বল। এইজন্য অনেকে এর জাতিকে বলেন ষাড়ব-সম্পূর্ণ; আরোহে ধ বর্জিত। বাদী রে, সম্বাদী প। পূর্বাঙ্গের পরমেল-প্রবেশক রাগ। পরিবেশনের সময় রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের শেষভাগ। এতে ধ-ম ও প-রে স্বর-সঙ্গতি খুব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

আরোহ॥ সা রে, গ ম প, নি র্সা।

অবরোহ॥ র্সা ণি ধ প, ধ ম, রে জ্ঞ রে সা।

পকড়॥ রে জ্ঞ রে সা, নি্ সা, ধ্ ণি্ রে।

ন্যাস স্বর॥ রে, ম ও প।

মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, এতে যখন দুই গান্ধার ও দুই নিষাদই লাগে তখন এটিকে কাফী ঠাটের অন্তর্ভুক্ত করা হ'ল না কেন? প্রশ্নটি যুক্তিপূর্ণ। এবং সত্যিই এইজন্য কেউ কেউ জয়জয়ন্তীকে কাফী ঠাটের রাগ বলে থাকেন। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, কাফী ঠাটের রাগগুলিতে কোমল গান্ধার হ'ল মুখ্য স্বর এবং তা আরোহ ও অবরোহে নিয়মিত রূপেই প্রযোজ্য। শুদ্ধ গান্ধার সেখানে গৌণ। কিন্তু জয়জয়ন্তীর কোমল গান্ধারের মর্যাদা ঠিক সেরকম নয়। সেখানে শুদ্ধ গান্ধারই মুখ্য। কোমল গান্ধার এখানে খুব সামান্য ভাবে দুই ঋষভের মাঝখানে (রে জ্ঞ রে) প্রয়োগ করা হয়। রে এই রাগের বাদী স্বর। কোমল গান্ধার দুপাশে প্রবলভাবে ঋষভকে দাঁড় করিয়ে তার আড়াল থেকে সামান্য উঁকি-ঝুঁকি দেয়। তা'ও

আরোহের সময় নয়—অবরোহে। অবশ্য বাগেশ্রী অঙ্গ দেখাবার সময় কখনো কখনো আরোহেও কোমল গান্ধারকে দেখানো হয় বটে।

বলা হয়, সুরট, বিলাবল ও গৌড়ের মিশ্রণে জয়জয়ন্তী রচিত। আবার অনেকে বলেনঃ খমাজ, কাফী, নট ও দেশ-এর মিশ্রণ হয়েচে এতে। উভয় পক্ষের বক্তব্যই ঠিক। বিশ্লেষণ করে দেখা যাক, সেরূপ কোন আভাষ এতে পাওয়া যায় কি না!

প্রথমেই দেখুন সুরটের (বা দেশের) অঙ্গ জয়জয়ন্তীর মধ্যে কেমন ভাবে কতটা অনুপ্রবেশ করেচে। ম প, নি র্সা স্বর-সঙ্গতি দেশ, সুরট ও জয়জয়ন্তীর মধ্যে বিলক্ষণ ভাবেই লাগানো হয়।

বিলাবল (আলাহিয়া) রাগের মত জয়জয়ন্তীতেও গ ম রে সা এবং ম প ধ নি ধ প, ম প ধ ম, গ ম প, গ ম রে ব্যবহৃত হয়।

গৌড়ের মূল স্বরসমষ্টি হ'ল রে গ রে ম গ। জয়জয়ন্তীতে এইটেই একটু স্বতন্ত্র ভাবে—রে গ ম গ রে—এইভাবে লাগানো হয়।

রে স্বরটি এ-রাগের খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োগের মধ্যে বৈশিষ্ট্যও আছে। এটি যে বাদী স্বর তা আগেই বলা হয়েচে। অতএব এটি বেশ প্রবল স্বর। এটিকে কখনো খাড়া ভাবেও লাগান হয়, কখনো বা গান্ধারকে স্পর্শ ক'রে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ও মনোরঞ্জক সঙ্গতি হ'ল প ও রে। ছায়ানট, শুধ, কল্যাণ, গৌড়সারং প্রভৃতি রাগেও প - রে সঙ্গতি বিদ্যমান কিন্তু ঐগুলিতে একই সপ্তকের প ও রে ব্যবহার করা হয়। জয়জয়ন্তীতে থাকে দুটি দু' সপ্তকের। হয় মন্দ্র-প, মধ্য-রে অথবা মধ্য-প ও তার-রে। তাছাড়া প্রয়োগভঙ্গীর মধ্যেও তফাৎ আছে। ইতিপূর্বে (গৌড়সারং দ্রষ্টব্য) তা বোঝান হয়েচে।

জয়জয়ন্তীকে বলা হয় পরমেল-প্রবেশক রাগ। পরমেল-প্রবেশক কথার তাৎপর্য আগেই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েচে (সঙ্গীত পরিচিতি ॥ পূর্বভাগ ॥ পৃষ্ঠা ৪৭ দেখুন)। খমাজ ঠাটের রাগ হলেও, এর মধ্যে কাফী ঠাটের গাইবার সুবিধে হয় বলে একে ঐ সংজ্ঞা দেওয়া হয়েচে। এই রাগের সমপ্রকৃতি রাগ হ'ল গারা। গারা রাগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নরূপ ঃ—

॥ গারা ॥

ঠাট—খমাজ। জাতি সম্পূর্ণ। দুই গ ও দুই নি ব্যবহৃত হয়। বাদী গ, সম্বাদী নি। পূর্বাঙ্গের রাগ। পরিবেশনের সময় দিবা দ্বিতীয় প্রহরের শেষভাগ।

আরোহ॥ সা রে় গ রে, গ ম প ধ, নি র্সা।
অবরোহ॥ র্সা ণি ধ ণি, প ম গ রে, জ্ঞ রে সা।

॥ রাগেশ্রী ॥

ঠাট—খমাজ। প্রকৃতি শান্ত। জাতি ঔড়ব-ষাড়ব। আরোহে রে ও প এবং অবরোহে শুধু প বর্জিত। আরোহে শুদ্ধ, অবরোহে কোমল নি ব্যবহৃত হয়। বাদী গ, সম্বাদী নি। পূর্বাঙ্গের রাগ। পরিবেশনের সময় রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।

আরোহ॥ সা গ, ম ধ, নি র্সা।
অবরোহ॥ র্সা ণি, ধ, ম গ, রে সা।
পকড়॥ ধ্ ণি্ সা গ, ম গ, রে সা।
ন্যাস স্বর॥ সা, গ, ধ ও নি।

রাগেশ্রীকে রাগেশ্বরীও বলা হয়। এর বাদী-সম্বাদী নিয়ে বিলক্ষণ মতভেদ আছে। যেমন, কেউ বলেন: ধ বাদী, গ সম্বাদী, কেউ ঠিক তার উল্টো বলেন। অর্থাৎ গ বাদী, ধ সম্বাদী। অনেকে আবার মধ্যম ও ষড়্জকে বাদী-সম্বাদী মানেন। তাছাড়া গ ও নি সম্বন্ধে তো আগেই বলা হয়েচে। এক্ষেত্রে ভালো উপায় হচ্চে, আপনি যাঁর কাছে শিখবেন, তাঁর মত অনুসরণ করা। কারণ আপনি যে স্বর দুটিকে বাদী-সম্বাদী বলবেন, রাগ পরিবেশনের সময় সেই স্বর দুটির বাদীত্ব ও সম্বাদীত্ব দেখানো দরকার। কোন কোন গুণী শিল্পী খুব অল্প পরিমাণে ক্বচিৎ পঞ্চমের প্রয়োগ করেন।

ম ও ধ-এর সঙ্গতি এই রাগের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। যেমন: ম ধ, ণি ধ, কিংবা ম গ ম ধ; ণি ধ ম গ; ধ ধ ম ধ; ম ধ ধ ম; ম গ ধ ম; ম ণি ধ ম ইত্যাদি।

এবার আপনি হয়ত প্রশ্ন করে বসবেন, আমি প্রথমে বলেচি এর আরোহে শুদ্ধ ও অবরোহে কোমল নিষাদের প্রয়োগ হয় কিন্তু পকড় বলার সময় বলেচি ধ্ ণি্ সা। অর্থাৎ আরোহ গতিতে কোমল নিষাদ লাগানো

হয়েচে! ঠিকই ধরেচেন আপনি। সাধারণ ভাবে আরোহে শুদ্ধ এবং অবরোহে কোমল নিষাদই লাগে কিন্তু মন্দ্র সপ্তকে আরোহের সময় ঐভাবে কোমল নিষাদ নেওয়ার রীতি আছে। তবে মনে রাখবেন, ঐ স্থান ছাড়া অন্য কোন স্থানে কিন্তু আরোহে শুদ্ধ নিষাদই লাগবে।

রাগেশ্রীর মত বাগেশ্রীতেও ধৈবত ও মধ্যমের সঙ্গত হয়। তাই রাগেশ্রীর উত্তরাঙ্গে খানিকটা বাগেশ্রীর প্রভাব এসে পড়ে। যেমন বাগেশ্রীর র্সা ণি ধ, ম—সমন্বয়। কিন্তু এই স্বরসমষ্টির পরেই যখন শুদ্ধ গান্ধারের প্রয়োগ করা হয়, তখনই বাগেশ্রীর প্রভাব মুক্ত হয়ে রাগেশ্রীর রূপ বিকশিত হয়ে ওঠে।

খমাজ ঠাটের দুর্গা নামক রাগটির সঙ্গে রাগেশ্রীর খানিকটা সাদৃশ্য আছে। দুটিকে পাশাপাশি রেখে তুলনা করলে এর মিল ও অমিল আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

॥ রাগেশ্রী ও দুর্গা (খমাজ ঠাটের) ॥

॥ সমতা ॥

১। দুটিই খমাজ ঠাটের রাগ।
২। দুটিরই আরোহে রে ও প বর্জিত—অর্থাৎ ঔড়ব জাতির।
৩। দুটিরই বাদী-সম্বাদী যথাক্রমে গ ও নি।
৪। দুটিতেই উভয় নিষাদ প্রযোজ্য।
৫। দুটিরই উত্তরাঙ্গে রাগেশ্রীর মত ধ-ম স্বর-সঙ্গতি হয়।
৬। দুটিতেই শুদ্ধ গান্ধারের প্রয়োগ করে বাগেশ্রীর ভ্রান্তি অপনোদন করা হয়।
৭। দুটিরই আরোহে একই স্বর প্রযুক্ত হয়। যেমন—
রাগেশ্রী॥ সা গ ম ধ নি র্সা।
দুর্গা॥ সা গ ম ধ নি র্সা।
৮। দুটিই পূর্বাঙ্গের রাগ এবং পরিবেশনের সময় রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।

॥ বিভিন্নতা ॥

॥ রাগেশ্রী ॥	॥ দুর্গা ॥
১। এর অবরোহ যাড়ব।	১। এর অবরোহ ঔড়ব।

২। অবরোহে রে লাগে কিন্তু প বর্জিত।	২। অবরোহে রে ও প দুটিই বর্জিত।
৩। অবরোহ: র্সা নি ধ ম গ রে সা।	৩। অবরোহ: র্সা নি ধ ম গ সা।

কর্ণাটকী রাগ "নাট কুরঞ্জিকা"র সঙ্গেও রাগেশ্রীর খানিকটা মিল আছে। সেটিও খমাজ ঠাটের রাগ।

রাগেশ্রীর সঙ্গে মালগুঞ্জী রাগেরও সামান্য সাদৃশ্য আছে। তবে মালগুঞ্জীর আরোহে ঋষভের অল্প প্রয়োগ, কোমল গান্ধার ও পঞ্চমের ব্যবহার দুটিকে সম্পূর্ণ পৃথক করে রাখে।

॥ গৌড়মল্লার ॥

গৌড়মল্লার রাগের পরিচয় দেবার আগে জিজ্ঞেস করি নিঃ আপনি কোন ঠাটের গৌড়মল্লার শিখেছেন? এরূপ প্রশ্নের কারণ, এই রাগটির ঠাট নিয়ে বহু মতভেদ আছে। আর সেই কারণেই এর চেহারার মধ্যেও ঘটেচে নানা পরিবর্তন। প্রথমেই এই সব মতান্তর নিয়ে আলোচনা করলে শিক্ষার্থীরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়বেন—যা আমি আদৌ পছন্দ করি না।

বর্তমানে কাফী ও খমাজ—এই দুটি ঠাটেরই গৌড়মল্লার প্রচলিত আছে। দুটিই খুব শ্রুতিমধুর। সেইজন্যই বোধহয় এ-দুটির একটিও এ পর্যন্ত উপেক্ষিত হয় নি। তাই আমার জিজ্ঞাসা: কোনটির পরিচয় আগে জানালে আপনাদের সুবিধে হবে!···আচ্ছা, আমি প্রথমে খমাজ ঠাটের গৌড়মল্লারের পরিচয় পেশ করচি। কারণ, খেয়াল-গায়কেরা বেশির ভাগ এই ঠাটের গানই শোনান। তারপর অন্য ঠাটগুলি নিয়েও একটু আলোচনা করা যাবে।

॥ খমাজ ঠাটের গৌড়মল্লার ॥

ঠাট—খমাজ। প্রকৃতি শান্ত। জাতি সম্পূর্ণ। আরোহে শুদ্ধ ও অবরোহে কোমল নি, অবশিষ্ট স্বরগুলি শুদ্ধ। বাদী ম, সম্বাদী সা। পূর্বাঙ্গের রাগ। বিস্তার ক্ষেত্র মন্দ্র ও মধ্য সপ্তকে। বক্রগতির এই রাগটির পরিবেশনকাল রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর (মধ্যরাত্রি)। বর্ষাকালে যেকোন সময়।

আরোহ॥ সা রে গ ম, প ধ নি র্সা।

অবরোহ॥ র্সা ধ ণি প, ম, গ রে গ, রে সা।

॥ দ্বিতীয় প্রকার ॥

আরোহ॥ রে গ রে ম গ রে সা, রে প, ম প, ধ র্সা।

অবরোহ॥ র্সা, ধ, ণি প, ম গ ম, রে সা।

পকড়॥ রে গ রে ম গ রে সা, প ম প ধ র্সা, ধ প ম।

পকড় ভিন্ন প্রকার॥ রে গ ম, ম প ধ প ম গ।

ন্যাস স্বর॥ সা, গ, ম ও প।

এ রাগে নিষাদের ব্যবহার খুব অল্প, যাকে সাঙ্গীতিক পরিভাষায় বলা হয় লংঘনমূলক অল্পত্ব। নিষাদ যেমন দুর্বল, গান্ধার তেমনি প্রবল, মানে অলংঘনমূলক বহুত্ব। আরোহে নিষাদকে লংঘন করে প্রায়ই না লাগানোর জন্য কোন কোন মতে এর জাতিকে ষাড়ব-সম্পূর্ণ বলা হয়।

গৌড় ও মল্লার রাগের মিশ্রণে এই রাগটি যে কার দ্বারা রচিত, তা জানা যায় না। গৌড়-এর রে গ রে ম গ এবং মল্লার-এর রে প ম প ধ র্সা ধ প ম, এই দুই রাগের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বরসমষ্টিকে মুন্সিয়ানার সঙ্গে যুক্ত ক'রে যিনি এই রাগটির মনোহর রূপ সৃষ্টি করেচেন, তিনি শুধুই জ্ঞানী নন রসিক শিল্পী। মল্লারের সঙ্গে অন্য রাগ মিশিয়ে আরো অনেক রাগ গুণীরা রচনা করেচেন। যেমন : মিঞা কী মল্লার, মেঘমল্লার, নটমল্লার, রামদাসী মল্লার, সুরদাসী মল্লার, মীরাবাঈ কী মল্লার প্রভৃতি বারো রকমের মল্লার। প্রত্যেকটি রাগই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে।

একটু সংক্ষিপ্ত স্বর বিস্তার সহযোগে দেখানো হচ্চে, কী সুন্দর ভাবে গৌড়ের রূপ আলোচ্য রাগে মেশানো হয়েচে।

রে
প্রথমে—সা, রে গ ম, ম, গ, রে গ রে ম গ রে সা, গ - গ - ম
ম

এইভাবে গৌড় অঙ্গ দেখানোর পর মল্লার-জ্ঞাপক রে — প সংগতি জুড়ে দেওয়া হয়। মল্লারের বাদী প এবং গৌড়মল্লারের বাদী ম। কাজেই প্রথমে গৌড়মল্লারের বাদীত্বকে কায়েম ক'রে তারপর মল্লারের পঞ্চমের ওপর গিয়ে ন্যাস করা হয়। তারপর আরো এগিয়ে যান—ম প ধ র্সা, ধ প ম, র্সা - -

ধ - ণি প, ম প ম গ, রে গ রে ম গ রে সা, রে - গ - গ ম। অন্তরার উঠান : ম প ধ র্সা — নি র্সা, র্সা — ধ ণি প, ধ নি র্সা ইত্যাদি।

খমাজ ঠাটের গৌড়মল্লারের স্বর-পরিচয় নিম্নরূপ :—

ষড়্‌জ হ'ল সম্বাদী স্বর। এটি অলংঘন ও অভ্যাসমূলক বহুত্ব রূপে প্রয়োগ করা হয়।

ঋষভ লংঘনমূলক অল্পত্ব হিসেবে বক্রভাবে প্রযুক্ত হয়। যেমন : রে গ রে ম গ রে সা ; সা গ রে গ ম ; প ম রে গ ম ইত্যাদি।

গান্ধার এ-রাগে প্রবল—অলংঘনমূলক বহুত্ব। এটির ওপর মাঝে মাঝে ন্যাসও করা হয়। যেমন : ম প ম গ ; ম ধ ণি প ম গ ইত্যাদি।

মধ্যম এ-রাগের বাদী স্বর কাজেই অলংঘন ও অভ্যাস—উভয় প্রকারেই এর বহুত্ব দেখানো হয়।

পঞ্চম—উভয় প্রকার বহুত্ব আছে।

ধৈবত—এরও বহুত্ব আছে অলংঘনমূলক রূপে। যেমন : ম প ধ র্সা ; ধ ণি প, ধ নি র্সা ; ণি ধ ণি প ইত্যাদি।

নিষাদ –লংঘনমূলক অল্পত্ব।

॥ কাফী ঠাটের গৌড়মল্লার ॥

ঠাট—কাফী। প্রকৃতি শান্ত। জাতি সম্পূর্ণ। উভয় গান্ধার, উভয় নিষাদ ও অবশিষ্ট স্বরগুলি শুদ্ধ। বাদী ম, সম্বাদী সা। পূর্বাঙ্গের রাগ। বিস্তার ক্ষেত্র মন্দ্র-মধ্য সপ্তক। বক্রগতির রাগ। সময়—মধ্যরাত্রি, বর্ষাকালে যে কোন সময়।

আরোহ ॥ সা রে ম, প, ধ র্সা।
অবরোহ ॥ র্সা ণি প ম প জ্ঞ ম, রে সা।

॥ ভিন্নপ্রকার ॥

আরোহ ॥ সা রে, ম, প, ধ, র্সা।
অবরোহ ॥ র্সা ধ, ণি প, ম জ্ঞ, ম রে সা।
পকড় ॥ ণি প ম প জ্ঞ ম রে সা।

দুই গান্ধার প্রযুক্ত হলেও, এতে কোমল গান্ধারের প্রাবল্য বেশী। অনেকে

শুধুই কোমল গ ব্যবহার করেন এবং এই মতটিই বেশী প্রচলিত। সেনী ঘরানাতেও বিশেষতঃ ধ্রুপদ গানে শুদ্ধ গা ব্যবহার হয় না। বলা হয়, খেয়াল গায়কীর সুবিধের জন্য পরবর্তীকালে (খেয়াল যুগে) দুই গ ও দুই নি যুক্ত করা হয়েচে। সেনী মতে এর আরোহাবরোহের স্বরূপ হ'ল : সা রে ম প ধ ণি প নি র্সা। র্সা ধ ণি প জ্ঞ ম রে সা।

মনে হয় কাফী ঠাটের প্রকারটিই প্রাচীন। কারণ, বেশীর ভাগ ধ্রুপদ গানই এই ঠাটের অন্তর্গত। অপরপক্ষে বেশীর ভাগ খেয়ালই দেখা যায় খমাজ বা বিলাবল ঠাটে।

॥ বিলাবল ঠাটের গৌড়মল্লার ॥

এই ঠাটের গৌড়মল্লার তত প্রচলিত নয়। বলা হয়, গৌড়, মল্লার ও বিলাবলের মিশ্রণে এটির উৎপত্তি। এই প্রকারটিও শ্রুতিকটু নয়।

পঃ ভাতখণ্ডের "ক্রমিক পুস্তকমালিকা"র চতুর্থ খণ্ডে গৌড়মল্লার রাগের যে সংকলন প্রকাশিত হয়েচে, তার মধ্যে উপরোক্ত তিন প্রকারের গানই পাওয়া যায়। অবশ্য সেখানে প্রকারের কোন উল্লেখ নেই। নিম্নের গানগুলি দেখুন—

(১) খমাজ ঠাটের ॥ "ঝুক আই বদরিয়া" অথবা "কারি বদরিয়া"।
(২) কাফী ঠাটের ॥ "আই ইয়ে ঘটা উমড় ঘুমড়"।
(৩) বিলাবল ঠাটের ॥ "বল্‌মা বহার আঈ" অথবা "গাজে রাজে"।

॥ ঝিঁঝিট ॥

ঠাট—খমাজ। প্রকৃতি ক্ষুদ্র। জাতি সম্পূর্ণ। আরোহে সব স্বর শুদ্ধ, অবরোহে কোমল নি। অল্প পরিমাণে কোমল গান্ধারও প্রয়োগ করেন অনেকে। বাদী গ, সম্বাদী নি। পূর্বাঙ্গের রাগ। আলাপ বা স্বর বিস্তারের ক্ষেত্র মন্দ্র-মধ্য সপ্তকে। পরিবেশনের সময় রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।

আরোহ ॥ সা, রে ম গ, ম প নি র্সা।
অবরোহ ॥ র্সা ণি ধ প ম গ রে গ, সা।
পকড় ॥ ধ্‌ সা, রে ম গ।
ন্যাস স্বর ॥ সা, গ ও প। ভিন্ন মতে ॥ সা, গ, ম, প ও ধ।

এই রাগটির বাংলা উচ্চারণ ঝিঁঝিট এবং হিন্দীতে বলা হয় ঝিঁঝোটী।

ক্ষুদ্র প্রকৃতির এই রাগটির স্বরূপ সম্বন্ধে সকলে একমত নন। এক লক্ষ্ণৌ শহরেই একে দু'ভাবে গাওয়া হয়। একপ্রকার আরোহ-অবরোহ আপনারা ওপরে দেখেছেন। ঐ প্রকারে উভয় নিষাদ গ্রাহ্য এবং সম্পূর্ণ জাতি হ'লেও গান্ধারকে বক্রভাবে লাগানো হয় আর আরোহের সময় ধৈবতকে লংঘন করা হয়।

আরেক প্রকারের আরোহাবরোহ নিম্নরূপ :—

আরোহ॥ সা রে গ ম প ধ ণি র্সা।

অবরোহ॥ র্সা ণি ধ প ম গ রে সা।

এই প্রকারে শুদ্ধ নি লাগে না এবং সরল ভাবেই আরোহ-অবরোহ করা হয়। খমাজের সঙ্গে এর সাদৃশ্য খুব বেশি। সেইজন্যই আরোহে রে লাগিয়ে খমাজ থেকে পৃথক করা হয়েচে।

কোন কোন মতে কোমল গান্ধারের ব্যবহারও পাওয়া যায়। যেমন—জ্ঞ রে সা ণি্ ধ্ প্, ধ্ সা।

আরেক প্রকারের ঝিঁঝিট আছে, যার আরোহে গ ও নি-কে বর্জন করা হয়েচে।

বাদী-সম্বাদী নিয়েও মতভেদ পাওয়া যায়। কেউ বলেন গ ও নি যথাক্রমে বাদী-সম্বাদী ; কেউ বলেন গ বাদী, ধ সম্বাদী।

এই রাগের আলোচনাতেও ভাতখণ্ডেজী স্ববিরোধী মন্তব্য করেচেন—ক্রমিক পুস্তকমালিকা॥ ৫ম খণ্ড॥ ২৬২ পৃষ্ঠা দেখুন।

রাগচন্দ্রিকাসারের দোহায় বলেচেন : "কোমল মনি ঝিন্‌ঝুটি হয় চঢ়ত ন লগে নিষাদ। কহুঁ কোমল গন্ধার হয় ধগ সম্বাদীবাদ।" অর্থাৎ এতে কোমল ম ও নি লাগে এবং আরোহে নিষাদ লাগবে না। কোথাও কোমল গান্ধার আছে, ধ-গ যথাক্রমে সম্বাদী ও বাদী।

অথচ রাগের শাস্ত্রীয় পরিচয়ে বলচেন, গ বাদী, সম্বাদী নি। আরো আশ্চর্য, কোথাও তিনি নিষাদের ওপর ন্যাস করেন নি।

আরোহ-অবরোহ দেখাচ্চেন : সা রে গ ম প ধ নি র্সা। র্সা ণি ধ প ম গ রে সা। অর্থাৎ আরোহেও নিষাদ লাগচে।

শাস্ত্রীয় পরিচয়ের মধ্যে বা রাগের আরোহ, অবরোহ, উঠাও, চলন কিংবা

৪৯৯-৫০০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত স্বর-বিস্তারে অথবা নয়টি গানের স্বরলিপির কোথাও কিন্তু কোমল গান্ধারের লেশমাত্র তিনি দেখান নি।

শুদ্ধ নিষাদের প্রয়োগ সম্বন্ধেও তিনি কিছুই বলেন নি উপরোক্ত কোন জায়গায়। তবে হ্যাঁ, দুটি গানের স্বরলিপিতে ((১) "আশ্রয় রাগ কহত গুণিজন" ও (২) "মধুর মধুর পনঘট পর") তিনি শুদ্ধ ও কোমল উভয় প্রকার নিষাদই প্রয়োগ করেচেন। তাঁর মত গুণীজনের গ্রন্থে, বিদ্যার্থীদের পক্ষে ভ্রান্তিমূলক কিছু থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। এজন্য অনেক সময় বিদ্যার্থীদের বিশেষভাবে পরীক্ষার্থীদের পঃ ভাতখণ্ডে-মতাবলম্বী পরীক্ষকদের সামনে বসে বড়ই অসুবিধায় পড়তে হয়।

আমরা দুই নি এবং কোমল গ যুক্ত ঝিঁঝিটের একটু স্বর-বিস্তার এখানে উদ্ধৃত করচি।—এই স্বর-বিস্তারে ধৈবত বাদী স্বর।

সা, রে ম গ, সা, ণি্ ধ্ প, ধ্ ণি্ ধ্ সা, রে ম প, প ধ ম প, গ প ম গ, সা, রে ম গ। সা, রে সা ণি্ ধ্ সা, ণি্ ণি্ ধ্, প্ ধ্, সা ধ্ স রে ম গ, সা। রে গ ম, নি্ সা রে গ, ম, নি্ সা রে নি্ সা ণি্ ধ্ প্ ধ্, সা। সা গ ম, প, ধ প ম গ প, ম গ রে সা গ, প, ণি ধ, প ম প, গ, ম রে, জ্ঞ রে, সা ণি্ ধ্ সা।

॥ বাহার ॥

ঠাট—কাফী। প্রকৃতি চঞ্চল। জাতি ষাড়ব-ষাড়ব। আরোহে রে এবং অবরোহে ধ বর্জিত। বাদী ম, সম্বাদী সা। মতান্তরে যথাক্রমে র্সা ও ম। সাধারণতঃ দুই নিষাদই এতে ব্যবহৃত হয়। আরোহে শুদ্ধ, অবরোহে কোমল নি। তবে কখনো কখনো মন্দ্র সপ্তকে আরোহ গতিতেও কোমল নিষাদের প্রয়োগ হয়ে থাকে। বক্রগতির উত্তরাঙ্গবাদী রাগ। পরিবেশনের সময় মধ্যরাত্রি।

আরোহ॥ সা, জ্ঞ ম, প জ্ঞ ম, ণি ধ নি র্সা।

ভিন্ন প্রকার॥ সা ম প জ্ঞ ম ণি ধ নি র্সা।

অবরোহ॥ র্সা, ণি প ম প, জ্ঞ ম, রে সা।

পকড়॥ ম প জ্ঞ ম, ধ, নি র্সা।

ন্যাস স্বর॥ সা, ম ও প।

প্রাচীন গ্রন্থাদিতে এ-রাগের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কারণ এটি যাবনিক রাগ। তবে কে যে এটির রচয়িতা তা এখনো জানা যায় নি ভালো ভাবে।

বর্তমানে এটি 'রাগ' পদবাচ্য হলেও, পূর্বে গুণী মহলে এটি 'রাগ' হিসেবে স্বীকৃতি পায় নি। সে সময় এটিকে বলা হ'ত ধুন্। ধুন্ বলা হয় সেই রচনাকে, যার মধ্যে কোন আইনকানুনের বালাই নেই কিন্তু তা শ্রুতিমধুর। সেকালে অনেকগুলি রাগ-রাগিনীর মিশ্রণে যা রচিত হ'ত, তাকে ধুন্ বলা হ'ত। সংকীর্ণ জাতির রাগেও দুটির বেশি রাগ মিশ্রিত হ'ত, ধুন্ বলা হ'ত তা'র চাইতেও বেশি রাগের মিশ্রণকে। বাহার রাগটি রচিত হয়েচে বাগেশ্রী, অড়ানা, মল্লার প্রভৃতির মিশ্রণে।

আগেই বলেচি, এতে দুই নিষাদের প্রয়োগ হয়। অনেক গুণী এতে দুই ধৈবত ও দুই গান্ধারও ব্যবহার করেন।

যদিও এর আরোহে রে এবং অবরোহে ধ বর্জিত, কিন্তু তানের সময় এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। অর্থাৎ দ্রুত তানকারীর সময় আরোহে রে ও অবরোহে ধ প্রয়োগ করা হয় কোন কোন সময়। গুণীরা তাতে দোষ ধরেন না। তবে আলাপ-বিস্তার বা গানের (বা গতের) বন্দিশের মধ্যে স্বরগুলিকে যথাযথ প্রয়োগ করাই বিধেয়। তা' না করলে ভুল ধরা হবে। তানের সময় নিয়ম লঙ্ঘিত হলেও, রাগের রূপ বা চরিত্র চিনে নিতে কষ্ট হয় না তা'র স্বর সম্মেলনের (combination) জন্য।

বাহারের সঙ্গে বাগেশ্রীর কোথায়—কতটুকু মিল আছে দেখুন। জ্ঞ ম ণি ধ, নি র্সা বললে বাহার ফুটে ওঠে বটে কিন্তু যদি বলা হয় জ্ঞ ম ণি ধ, ণি র্সা তাহ'লে হয়ে যাবে বাগেশ্রী। শুধু আরোহেই নয়, অবরোহের সময়েও বাহারে জ্ঞ ম রে সা এবং বাগেশ্রীতে ম জ্ঞ রে সা সমষ্টি প্রযুক্ত হয়।

অড়ানার ছায়াপাত এতে কী ভাবে ঘটে দেখুন।—আড়ানা ও বাহার—দুটি রাগেরই অবরোহে প্রায় একই স্বরসমষ্টি ব্যবহৃত হয়। যেমন—

অড়ানা॥ র্সা দ ণি প ম প, জ্ঞ ম, রে সা।

বাহার॥ র্সা ণি প ম প, জ্ঞ ম, রে সা।

অর্থাৎ ণি প ম প জ্ঞ ম রে সা—এই স্বরসমষ্টি উভয় রাগেরই অবরোহে লাগানো হয়।

এবার দেখুন মিঞা-মল্লারের সঙ্গে বাহারের সাদৃশ্য।—দুটি রাগেই কোমল

গান্ধার লাগে কিন্তু দুটি কোমল গান্ধারের মধ্যে তফাৎ আছে। যেমন, মিঞা কী মল্লারের কোমল গান্ধার মধ্যমকে স্পর্শ করে আন্দোলিত হয় কিন্তু বাহারে তা হয় না। এ তো গেল স্থূল ব্যাপার। সূক্ষ্ম বিচারে, মিঞা-মল্লারের কোমল গান্ধারের অবস্থান বাহার অপেক্ষা কিছুটা নিচুতে।

পৃষ্ঠান্তরে এই দুটি রাগের সমতা-বিভিন্নতা দেখানো হয়েচে।

ণি ধ নি র্সা স্বর সমষ্টিও দুটি রাগেই লাগা সত্ত্বেও বাহারে যেমন সমান সমান ওজনে ণি ধ নি র্সা লাগানো হয়, মিঞা-মল্লারে তা হয় না। মিঞা-মল্লারের সময়, ণি — ধ নি — — র্সা এই ভাবে লাগে। তা ছাড়া এই স্বর সমষ্টির প্রয়োগ বাহারের ক্ষেত্রে শুধু মধ্য সপ্তকেই সীমিত কিন্তু মিঞা-মল্লারে উভয় সপ্তকেই প্রযোজ্য। এই সমতা-বিভিন্নতা অনুসারে বাহার পরিবেশন করার সময় কী ভাবে দুটি রাগের সঙ্গতিতে আবির্ভাব-তিরোভাব ঘটানো হয় দেখুন।—

মূল রাগ বাহার॥ সা ম, ম প জ্ঞ ম ণি ধ নি র্সা।
মিঞা-মল্লারে তিরোভাব॥ নি র্সা র্রে র্সা, ণি - ধ নি - র্সা।
বাহারে পুনরাবির্ভাব॥ র্সা - ণি প ম প জ্ঞ ম, ণি ধ নি র্সা।

॥ আরেক রকম দেখুন ॥

মূল রাগ বাহার॥ ম, ম প জ্ঞ ম, ণি ধ।
বাগেশ্রীতে তিরোভাব॥ ম জ্ঞ ম জ্ঞ রে সা, ণি় ধ় সা।
মূল রাগে পুনরাবির্ভাব॥ ম, ম প জ্ঞ ম, ণি ধ নি র্সা।

॥ মিঞা-মল্লার ॥

ঠাট—কাফী। প্রকৃতি শান্ত—গম্ভীর। জাতি সম্পূর্ণ-ষাড়ব। অবরোহে ধৈবত বর্জিত। গ ও নি কোমল, অন্য স্বরগুলি শুদ্ধ। শুদ্ধ নিষাদও ব্যবহৃত হয়। বাদী ম, সম্বাদী সা। মতান্তরে সা ও প। পূর্বাঙ্গবাদী। বিস্তার ক্ষেত্র মন্দ্র-মধ্য সপ্তক। পরিবেশনের সময় মধ্যরাত্রি। কিন্তু এটি বর্ষা ঋতুর রাগ, তাই বর্ষাকালে যে কোন সময় পরিবেশিত হতে পারে।

আরোহ॥ সা, রে ম রে সা, ম রে, প, ণি ধ, নি র্সা।

অবরোহ॥ র্সা নি প, ম প, জ্ঞ ম রে সা।
পকড়॥ রে ম রে সা, নি্ প্, ম্ প্ নি্ ধ্, নি্ সা।
ভিন্ন প্রকার॥ (১) ম রে, প, জ্ঞ, ম রে সা, নি্ প্।
(২) ম্ প্ নি্ ধ্, নি্ সা।
ন্যাস স্বর॥ সা, রে, জ্ঞ, প ও ধ।

রাগটির নামকরণ নিয়ে গুণী মহলে মতানৈক্য আছে। এই মতভেদ হ'ল 'মিঞা' শব্দটি নিয়ে। কোন কোন মতে এই রাগের স্রষ্টা অমর শিল্পী তানসেন, তাই এই নামের সঙ্গে 'মিঞা' শব্দটি যুক্ত। অপর পক্ষ সবিস্ময়ে বলেন, মল্লার-এর সঙ্গে 'মিঞা' শব্দটি কী ভাবে যুক্ত হয়েচে জানি না, এটিকে শুধু 'মল্লার'ই বলা উচিত—(পঃ বিনায়ক রাও পটবর্ধন)। এরকম বিসম্বাদ দরবারী কানড়া, মিঞা কী সারং, মিঞা কী তোড়ী প্রভৃতির বেলাতেও দেখা যায়। আমরা আপাতত ঐ তর্কের মধ্যে যাচ্চি না। তবে 'শুদ্ধ মল্লার' নামেও একটি পৃথক রাগ আছে—যার সঙ্গে আলোচ্য রাগটির কোন সম্পর্ক নেই, সেটি একটি পৃথক রাগ।

গৌড়মল্লার-এর ঠাট বা প্রকার সম্বন্ধে যেমন মতভেদ আছে, মিঞামল্লার সম্বন্ধে তেমন কিছু নেই। সকলেই এটিকে কাফী ঠাট বলে মানেন। কিন্তু এর জাতি নিয়ে অনেকেই একমত নন। যেমন, যদিও এর আরোহ সম্পূর্ণ জাতীয়, তবু গান্ধার এতে সোজাসুজি—সা রে জ্ঞ ম—এভাবে লাগে না। আরোহ এবং অবরোহ—উভয় ক্ষেত্রেই গ বক্রভাবে প্রয়োগ করা হয়। গান্ধার এ-রাগের আরোহে লংঘনমূলক অল্পত্ব তথা অবরোহে অলংঘনমূলক বহুত্ব হিসেবে প্রযোজ্য। আরোহে গান্ধারের অল্পত্ব-হেতু অর্থাৎ প্রায় না-লাগানোর জন্য, এর আরোহের জাতিকে কোন কোন মতে বলা হয় ষাড়ব। আবার অবরোহে বক্রভাবে তথা লংঘনমূলক অল্পত্ব হিসেবে ধৈবতকে প্রয়োগ করার জন্য এর অবরোহকে বলেন সম্পূর্ণ। কিন্তু ভেবে দেখলে, এই ষাড়ব-সম্পূর্ণ মতবাদীর যুক্তিকেও অগ্রাহ্য করা চলে না। আরোহে বক্রভাবে গান্ধার লাগা সত্বেও যদি তাকে সম্পূর্ণের সংজ্ঞা দেওয়া হয়, তাহ'লে অবরোহে ধৈবতকে বক্রভাবে লাগালে তাকে সম্পূর্ণ মানতে আপত্তি থাকবে কেন?

এবার দেখুন বাদী-সম্বাদীর মতভেদ। এ সম্বন্ধে তিন রকম মত দেখা যায়।

(১) ম বাদী, সা সম্বাদী।
(২) সা বাদী, প সম্বাদী।
(৩) রে বাদী, প সম্বাদী।

এবার বিচার করে দেখা যাক।—ম এ-রাগের অলংঘনমূলক বহুত্ব কিন্তু এই স্বরের ওপর ন্যাস করা হয় না। অথচ বাদী স্বরের ওপর ন্যাস করা উচিত।

সা গুরুত্বপূর্ণ নিশ্চয়ই এবং একে কেউ বাদী, কেউ সম্বাদী মানেন। অসুবিধার বিশেষ কোন কারণ নেই।

রে ও প—দুটি স্বরই উভয় প্রকার (অলংঘন এবং অভ্যাসমূলক) বহুত্বে পূর্ণ এবং ন্যাসও করা হয়।

উপরোক্ত বিচারে, বাদী স্বর হিসেবে মধ্যম অপেক্ষা ষড়্জ কিংবা ঋষভই ভোট বেশী পাবে। কারণ, বাদী স্বরের সংজ্ঞা হিসেবে এদেরই যুক্তি প্রবল।

মিঞা-মল্লারের পূর্বাঙ্গে দরবারী কানাড়া ও উত্তরাঙ্গে বাহারের স্বর-সমষ্টির সাম্য লক্ষণীয়। জ্ঞ ম রে সা—দরবারী ও মিঞা-মল্লার—উভয় রাগেরই পূর্বাঙ্গে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া আলোচ্য রাগের গান্ধার দরবারীর মতই অতি-কোমল, তথা গাম্ভীর্যের সঙ্গে আন্দোলিত হয়। তফাৎ এই, মিঞা-মল্লারের গান্ধার, ম ও রে—দুই স্বরেরই কণযুক্ত এবং ঋষভ মধ্যমের স্পর্শযুক্ত হয়।

ম ম
যেমন : জ্ঞ — — ম রে — — সা। দরবারীর গান্ধার শুধুই মধ্যমযুক্ত এবং

ম স
ঋষভ ষড়্জযুক্ত। যেমন : জ্ঞ — — ম — রে — — সা।

বাহারের সঙ্গেও মিঞামল্লারের সাম্য দেখা যায়—ণি ধ নি র্সা সমষ্টির জন্য। তবে এখানেও প্রয়োগবিধির তারতম্য আছে। বাহারে এই স্বরক'টি সমান ওজনে লাগানো হয় এবং কোন স্বরই স্পর্শযুক্ত নয়। কিন্তু মিঞা-মল্লারের বেলায় কোমল ও শুদ্ধ নিষাদকে অপেক্ষাকৃত বেশী স্থিতিশীল করা হয়, আর ধৈবত স্থিতিশীল হয় না। উপরন্তু কোমল নিষাদ কখনো পঞ্চম, কখনো বা শুদ্ধ ধৈবতের স্পর্শযুক্ত হয় এবং শুদ্ধ নিষাদে লাগে শুদ্ধ ধৈবতের কণ্।

প্ ধ্
যেমন : ণি্ — ধ্ নি্ — — সা। তাছাড়া এই স্বর-সমষ্টি মিঞামল্লারের বেলায় উভয় সপ্তকেই প্রয়োগ করা হয়, কিন্তু বাহারের সময় শুধুই মধ্য-সপ্তকে

প্রযোজ্য। বাহারের সঙ্গে মিঞামল্লারের এই স্বরসঙ্গতি থাকায়, এই দুটি রাগের মধ্যে কী ভাবে আবির্ভাব-তিরোভাব ঘটানো হয় দেখুন।

মূল রাগ মিঞামল্লার॥ সা, সারে নি্সা, ণি্ — ধ্ নি্ — — সা।
বাহারের দ্বারা তিরোভাব॥ সা ম, ম প জ্ঞ — ম, রে রে সা।
মিয়ামল্লারে পুনরাবির্ভাব॥ রে সা নি্ সা, ণি্ — ধ্ নি্ — — সা।

পৃষ্ঠান্তরে এই দুটি রাগের সমতা-বিভিন্নতাও দেখান হয়েচে।

গম্ভীর প্রকৃতির রাগগুলি আলাপ-প্রধান হয়। আলাপ বা স্বরবিস্তারেই এ-সব রাগের স্বরগুলিকে সুবিন্যস্ত ক'রে রাগ-রূপকে যথাযথ ভাবে বিকশিত করা সম্ভব—যা তানের সময় রক্ষা করা যায় না। মিঞামল্লার, দরবারী কানাড়া প্রভৃতি রাগ এই শ্রেণীভুক্ত।

মিঞামল্লার রাগের স্বর-পরিচয় নিম্নরূপ।—

ষড়্জ হ'ল এতে সম্বাদী এবং সাধারণ। কোন কোন মতে বাদী স্বর।

ঋষভে উভয় প্রকারের (অভ্যাস ও অলংঘনমূলক) বহুত্ব আছে। কোন মতে বাদী।

কোমল গান্ধার এ-রাগের আরোহে লংঘনমূলক অল্পত্ব, অবরোহে অলংঘন-বহুত্ব।

মধ্যমের বহুত্ব অলংঘনমূলক। কোন কোন মতে এটি বাদী স্বর কিন্তু ন্যাস হয় না।

পঞ্চমের বহুত্ব উভয় প্রকারেই (অভ্যাস ও অলংঘনমূলক) আছে। কোন কোন মতে এটি সম্বাদী স্বর।

ধৈবত আরোহে অলংঘন-বহুত্ব, অবরোহে লংঘনমূলক অল্পত্ব।

নিষাদ—অভ্যাস ও অলংঘনমূলক অল্পত্ব।

॥ মালগুঞ্জী ॥

ঠাট—কাফী। প্রকৃতি শান্ত। জাতি ষাড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে প বর্জিত। দুই গ ও দুই নি লাগে। বাদী ম, সম্বাদী সা। পূর্বাঙ্গের রাগ। সময় মধ্যরাত্রি—দ্বিতীয় প্রহরের শেষভাগ।

আরোহ॥ ধ্ ণি্ সা রে গ, ম, ধ, নি র্সা।

অবরোহ॥ র্সা নি ধ, প ম, গ ম, জ্ঞ রে সা।

পকড়॥ গ ম জ্ঞ রে সা নি় ধ় নি় সা গ ম।

ন্যাস স্বর॥ সা, গ, ম ও ধ।

রাগেশ্রী, বাগেশ্রী ও জয়জয়ন্তী (বা গারা) রাগের মিশ্রণে মালগুঞ্জী রচিত। এতে দুই গান্ধার ও দুটি নিষাদ ব্যবহৃত হয়, তা আগেই বলেচি। কিন্তু সাধারণ নিয়ম অনুসারে যেমন আরোহে শুদ্ধ ও অবরোহে কোমল স্বর ব্যবহার করা হয়, এই রাগের শুধু গান্ধারের বেলাতেই সেই নিয়মটি প্রযোজ্য। অর্থাৎ আরোহে শুদ্ধ এবং অবরোহে কোমল গান্ধার লাগান হয়। কিন্তু নিষাদের বেলায় তা'র ব্যতিক্রম ঘটেচে। কোমল নিষাদ এ-রাগের আরোহ ও অবরোহ উভয় ক্রমেই প্রয়োগ করা হয়। তাছাড়া শুদ্ধ নি অপেক্ষা কোমল নিষাদই এ-রাগে বেশি প্রাধান্য পেয়েচে। যেমন: সা, নি় ধ় নি় সা, ধ় নি় সা রে গ। শুদ্ধ নিষাদের স্থান মালগুঞ্জীতে গৌণ। শুদ্ধ নি প্রধানত মধ্য সপ্তকের আরোহেই লাগে।

পঞ্চম এ-রাগের আরোহে লাগে না, অবরোহে লাগে। কিন্তু অবরোহের সময়ও তা'র প্রয়োগ অল্প পরিমাণে লংঘনমূলক বা অনভ্যাস দ্বারা দেখানো হয়।

মালগুঞ্জীর আরোহে যখন ম ধ নি র্সা দেখানো হয় এবং অবরোহে পঞ্চমের অল্পত্ব দেখিয়ে র্সা নি ধ, ম জ্ঞ রে সা প্রয়োগ করা হয় তখনই শ্রোতাদের মনে পড়ে যায় বাগেশ্রীর কথা। অথচ মালগুঞ্জীতে এরূপ প্রয়োগ আদৌ দোষাবহ নয়। এই কারণেই বলা হয় এটি বাগেশ্রী অঙ্গের রাগ এবং এটি কাফী ঠাটের অন্তর্গত।

কোন কোন গুণী শিল্পী আরোহের সময় ঋষভকে লংঘনমূলক অল্পত্ব দ্বারাও দেখান। যেমন: সা গ ম ধ নি র্সা। তাই আমরা একই শিল্পীকে উভয় প্রকারেই ঋষভের ব্যবহার করতে দেখি। এইরূপ পরিবেশনকে ভুল ধরা হয় না।

মালগুঞ্জীর নিষাদ সম্বন্ধে মতানৈক্য আছে। আমরা যেমন আরোহ এবং অবরোহ—উভয় ক্রমেই কোমল নিষাদকে প্রয়োগ করি, অনেকে—বিশেষ ক'রে সেনী ঘরানায় শুধু অবরোহেই কোমল নিষাদকে ব্যবহার করা হয়।

ঠাট নিয়েও মতভেদ আছে। যেহেতু এর আরোহে শুদ্ধ এবং অবরোহে

কোমল নিষাদ তথা কোমল গান্ধার অপেক্ষা শুদ্ধ গান্ধারকে প্রবল ভাবে প্রয়োগ করা হয়, সেইহেতু অনেকে একে খাম্বাজ ঠাটের অন্তর্ভুক্ত করেন।

আবার জাতিভেদ ক'রে সম্পূর্ণরূপেও মানেন কেউ কেউ।

বাদী-সম্বাদী নিয়ে অবশ্য কোন মতভেদ দেখা যায় না।

॥ সিন্ধুরা ॥

ঠাট—কাফী। প্রকৃতি ক্ষুদ্র। জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে গ ও নি বর্জিত। গ ও নি কোমল, অবশিষ্ট স্বরগুলি শুদ্ধ। বাদী সা, সম্বাদী প। মতান্তরে রে ও ধ। পূর্বাঙ্গের রাগ। পরিবেশনের সময় সম্বন্ধে মতানৈক্য আছে। কোন কোন মতে সব সময়েই পরিবেশন করা চলে, কোন মতে দিবা চতুর্থ প্রহর, আরেক মতে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।

আরোহ॥ সা, রে ম প, ধ, র্সা।

অবরোহ॥ র্সা ণি ধ প, ম জ্ঞ, রে ম জ্ঞ রে সা।

ন্যাস স্বর॥ সা, রে, গ, প ও ধ।

সিন্ধুরা রাগটি আধুনিক কালের নয়। পঃ অহোবলের "সঙ্গীত পারিজাত" (সূত্র ৩৫৭) গ্রন্থেও এই রাগটির উল্লেখ আছে। একে অনেকে সিন্ধুরা, সিন্ধোড়া ও সৈন্ধবী নামেও অভিহিত করেন। বলা হয়, শুদ্ধ মল্লার, কানাড়া এবং দেশ রাগের সংমিশ্রণে এটির উৎপত্তি।

নিষাদের বর্জন সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কোন কোন মতে আরোহে নি লাগানো হয়।

সেনী মতে আরোহে গ ও ধ বর্জন করা হয়।

বিভিন্ন মতের কয়েকটি আরোহ-অবরোহের প্রকার এখানে দেওয়া হ'ল।

(১) সা, রে ম প, ধ, র্সা। র্সা ণি ধ প, ম জ্ঞ রে ম জ্ঞ রে সা।

(২) সা, রে ম প ধ, ণি ধ, র্সা। র্সা, ণি ধ ম প জ্ঞ, রে সা।

(৩) সা রে ম প নি র্সা। র্সা ণি ধ প ম জ্ঞ রে সা।

(৪) সা রে ম প ধ র্সা। র্সা ণি ধ প ম জ্ঞ রে সা।

এবার দেখুন সিন্ধুরার মধ্যে দেশ, কাফী, আসা প্রভৃতির ছায়া কী ভাবে প্রতিফলিত হয়।

সিন্ধুরায় দেশ রাগের ছায়াপাত॥ যদি উপরোক্ত ৩নং প্রকারের মত আরোহে নি লাগানো হয়, তাহ'লে দেশ রাগের মত মনে হয়।

সিন্ধুরায় কাফী রাগের ছায়া॥ ণি ধ প জ্ঞ রে কিংবা ণি ধ ম প জ্ঞ রে অথবা ণি ধ প ম জ্ঞ রে স্বর-সমষ্টির প্রয়োগ কাফী রাগের আভাস দেয়।

সিন্ধুরায় আসা রাগের ছায়া॥ সিন্ধুরার উপরোক্ত প্রথম প্রকার আরোহ সা রে ম প ধ র্সা মনে করিয়ে দেয় বিলাবল ঠাটের ঔড়ব-সম্পূর্ণ জাতীয় আসা রাগটির কথা।

অনেকে সিন্ধুরার সঙ্গে কাফী রাগকে মিশ্রিত করে গেয়ে থাকেন। এই প্রকারটি অপেক্ষাকৃত বেশি প্রচলিত। কাফীর সঙ্গে সিন্ধুরার খুব মিল আছে।

॥ দরবারী কানাড়া ॥

ঠাট—আসাবরী। প্রকৃতি গম্ভীর। জাতি সম্পূর্ণ-ষাড়ব; মতান্তরে সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ। আরোহ সম্পূর্ণ হ'লেও গান্ধারকে বক্র এবং দুর্বল রাখা হয়। অবরোহে ধৈবত বর্জিত। গ ও ধ স্বর আন্দোলিত। গ, ধ ও নি এতে কোমল, অবশিষ্ট স্বরগুলি শুদ্ধ। বাদী রে, সম্বাদী প। পূর্বাঙ্গের রাগ। বিস্তার ক্ষেত্র মন্দ্র-মধ্য সপ্তকেই সীমিত থাকে। পরিবেশিত হয় মধ্যরাত্রে (দ্বিতীয় প্রহরের শেষ ভাগে)।

আরোহ॥ ণি্ সা, রে জ্ঞ, রে সা, ম প, দ, ণি র্সা।

অবরোহ॥ র্সা, দ, ণি, প, ম প, জ্ঞ, ম রে, সা।

পকড়॥ জ্ঞ, রে রে, সা, দ্, ণি্ সা, রে, সা।

ন্যাস স্বর॥ সা, প।

সঙ্গীত-সম্রাট মিঞা তানসেন এই রাগটির রচয়িতা। কানাড়া অঙ্গের যে রাগগুলির উল্লেখ প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়, সেগুলি সবই শুদ্ধ ধৈবতযুক্ত ছিল। অনেকে অনুমান করেন, তানসেনই প্রথম এই প্রকারের মধ্যে

কোমল ধৈবতের আমদানী করেন। সঙ্গীতবিদ্ স্বর্গীয় কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "গীত সূত্রসার" গ্রন্থে অষ্টাদশ কানাড়ার নাম দেওয়া হয়েচে। অর্থাৎ কানাড়ার মোট আঠারোটি প্রকার আছে। আজ অবশ্য আরো কয়েকটি প্রকার বেড়েচে। এই প্রকারগুলির মধ্যে দরবারী ও আড়ানা বাদে প্রায় সবগুলিই কাফী ঠাটের। কানাড়া অঙ্গ বলতে আমরা বুঝি পূর্বাঙ্গে জ্ঞ ম রে সা এবং উত্তরাঙ্গে ণি ধ ণি প অথবা ণি প জ্ঞ ম স্বরের সমন্বয়। তাছাড়া বেশির ভাগ কানাড়াতেই গান্ধার আন্দোলিত থাকে। আলোচ্য রাগের আরোহ-অবরোহ দেখলেই বুঝবেন যে এর মধ্যেও এই সমন্বয়ের প্রকাশ আছে। কানাড়া অঙ্গের অন্যান্য রাগগুলির সঙ্গে দরবারী কানাড়ার তফাৎ যে শুধু ধৈবতের, তা আগেই বলা হয়েচে।

এর জাতি নিয়ে মতভেদ আছে। সেনী ঘরানায় এটিকে বলা হয় সম্পূর্ণ জাতীয়। তাঁরা আরোহ-অবরোহ দেখান এইভাবে: সা রে ম জ্ঞ ম প ণি দ ণি র্সা। র্সা ণি দ ণি প ম জ্ঞ রে সা। গ ও ধ বক্রভাবে প্রযুক্ত হয় বলে এঁরা সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ বলেন—যদিও আরোহে গান্ধারকে সোজাসুজি লাগানো হয়েচে। ভাতখণ্ডেজীর মতেও আরোহে গান্ধার এবং অবরোহে ধৈবত বক্র। আমরা অন্যত্র দেখেচি কোনও স্বর বক্রভাবে প্রযুক্ত হলেও তাকে সম্পূর্ণ বা বক্র-সম্পূর্ণ আখ্যা দেওয়া হয়। এখানেও দেখচি, পণ্ডিতজীর আরোহে গান্ধার বক্রভাবেই লেগেচে এবং তিনি বলেচেন: আরোহে গান্ধার দুর্বল, জলদ ও সরল তানে একে একেবারেই বাদ দেওয়া হয়। তবু এর আরোহকে তাঁর সম্পূর্ণ বলতে দ্বিধা হয় নি কিন্তু অবরোহে ধৈবত বক্র রূপে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কেন যে তিনি তাকে বর্জিত স্বর বললেন এবং অবরোহকে ষাড়ব আখ্যা দিলেন, তা বুঝতে বেশ অসুবিধা হয়।

গান্ধার স্বরটিকে দরবারীতে মধ্যমের কণ্ সহযোগে, ঋষভকে ষড়্জের স্পর্শে তথা ধৈবতে কোমল নিষাদের ছোঁয়া দিয়ে প্রয়োগ করা হয়। যথা: সা,

    ণি্   সা   ম   সা   ণি্
ণি্সা, দ্ — ণি্সা, রে — জ্ঞ — রে — সা, দ্ — ণি্ সা। গ ও ধ এতে অতি কোমল লাগে এবং আন্দোলিত হয়।

দববারী কানাড়ার সমগোত্রীয় রাগ হ'ল আড়ানা। এটিও কানাড়া প্রকারের আসাবরী ঠাটের অন্তর্গত। এ-দুটির মধ্যে যে সাম্য-বৈষম্য আছে, তা অন্যত্র আলোচনা করা হয়েচে। দরবারীর আলাপ বা স্বর-বিস্তার মন্দ্র-মধ্য

সপ্তকেই সীমাবদ্ধ, তার-সপ্তকে বেশীক্ষণ বিস্তার করলে আড়ানা হয়ে যাবার ভয় থাকে।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয়ের অবতারণা বোধহয় খুব অপ্রাসঙ্গিক বিবেচিত হবে না।

প্রয়াগ সঙ্গীত সমিতির রেজিষ্ট্রার পণ্ডিত জগদীশনারায়ণ পাঠক, সঙ্গীত প্রবীণ, তাঁর "সঙ্গীত-প্রশ্ন-পঞ্জিকা"য় (১ম সংস্করণ ॥ ১৯৫৭ ॥ পৃষ্ঠা ১৯) দরবারী কানাড়ার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেচেন : "বাস্তবিক পক্ষে এই রাগটি (দরবারী কানাড়া) শাস্ত্রে কানাড়া নামে উল্লিখিত আছে। এই কানাড়াই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন কানাড়া।"

প্রাচীন কানাড়ায় শুদ্ধ ধৈবত ব্যবহৃত হ'ত। কাজেই "দরবারী কানাড়াই প্রাচীন কানাড়া" এ উক্তিতে শিক্ষার্থীদের মনে ভ্রান্তি উৎপাদন হ'তে পারে। বরং বলা যেতে পারে, ঐ কানাড়ার শুদ্ধ ধৈবত কোমল করে মিঞা তানসেন নতুন নামে এটিকে প্রচার করেচেন মাত্র। অনুসন্ধিৎসু বিদ্যার্থীদের জন্য এখানে শুদ্ধ কানাড়ার সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে দিচ্চি।

॥ শুদ্ধ কানাড়া ॥

জাতি সম্পূর্ণ। বাদী প, সম্বাদী সা। গতি বিলম্বিত এবং বক্র। সময়—রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।

আরোহ॥ সা রে ম জ্ঞ ম প ণি ধ ণি র্সা।
অবরোহ॥ র্সা ধ ণি প ম জ্ঞ ম রে সা।
পকড়॥ ম জ্ঞ ম প, জ্ঞ, ম রে সা।

গ ও ধ সর্বদাই ম ও নি যুক্ত থাকে এবং আন্দোলিত হয়। যেমন :
ম ণি
জ্ঞ, ধ।

॥ অড়ানা ॥

ঠাট—আসাবরী। প্রকৃতি চঞ্চল। জাতি ষাড়ব-ষাড়ব। আরোহে গ, অবরোহে ধ বর্জিত। গ ও ধ কোমল, নি উভয়প্রকার; অবশিষ্ট স্বরগুলি শুদ্ধ। বাদী র্সা (তার সপ্তকের ষড়্‌জ), সম্বাদী প। উত্তরাঙ্গের রাগ।

স্বর-বিস্তারের ক্ষেত্র মধ্য ও তার সপ্তকে সীমাবদ্ধ। সময়—রাত্রি তৃতীয় প্রহর।

আরোহ॥ সা রে ম প, দ নি র্সা।
অবরোহ॥ র্সা দ ণি প ম প, জ্ঞ ম, রে সা।
পকড়॥ র্সা, দ, নি র্সা, দ, ণি প ম প, জ্ঞ ম রে সা।
ভিন্ন প্রকার॥ র্সা, দ ণি প, ম প র্সা।
ন্যাস স্বর॥ সা ও প।

বীর রসাত্মক এই রাগটি দরবারী কানাড়ার সমগোত্রীয়। শুধু কানাড়া প্রকার বা একই ঠাটের বলে নয়, দরবারীর সঙ্গে এর স্বরগত এবং স্বরূপগত অনেকগুলি মিল আছে। পৃষ্ঠান্তরে এই দুটি রাগের সমতা-বিভিন্নতা দেখান হয়েচে।

অর্বাচীন হলেও, দরবারী কানাড়ার চাইতে অড়ানা বা আড়ানার বয়স বেশি। রাগটির স্রষ্টা যে কে, তা জানা যায় না এবং সম্ভবত পণ্ডিত লোচনের "রাগতরঙ্গিনী" (১৫শ শতাব্দী) গ্রন্থের পূর্বে আর কোথাও এর উল্লেখ পাওয়া যাবে না। তানসেন আকবর বাদশাহের মনোরঞ্জনের জন্য দরবারী কানাড়া রচনা করেছিলেন বলে উল্লিখিত আছে। আকবর বাদশাহের রাজত্বকাল ছিল ১৫৫৬—১৬০৫ খৃষ্টাব্দ। তাই বলছিলাম, দরবারীর চাইতে অড়ানা বয়সে বেশ বড়। কে জানে, পরবর্তীকালে তানসেন হয়ত এই রাগটিরই অনুসরণে দরবারী কানাড়া রচনা করেছিলেন!

আড়ানা যখন কানাড়ারই প্রকার, তখন কানাড়ার বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। কানাড়ার বৈশিষ্ট্য বলতে আমরা বুঝি :

(১) এতে গ ম রে সা, নি ধ নি প কিংবা নি প গ ম স্বর সমষ্টির সঙ্গত কোন-না-কোন রকম ভাবে থাকবে। (২) গ ও ধ এতে লাগবে বক্র এবং দুর্বল ভাবে। (৩) সারঙ্গের স্বরগত (নি - প, ম - রে ; অথবা সা রে ম প প্রভৃতি) কিছু প্রভাবও এতে পাওয়া যাবে।

আড়ানার মধ্যে উপরোক্ত সব রকম বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান।—তবে কানাড়ার প্রায় সব প্রকারগুলিতেই শুদ্ধ ধৈবত লাগে, দরবারী কানাড়া ও আড়ানা তা'র ব্যতিক্রম। কোন কোন মতে শুদ্ধ ধৈবত লাগিয়ে অড়ানাকে কাফী

ঠাটান্তর্গতও করা হয়েচে বটে, কিন্তু বর্তমানে আসাবরী ঠাটের প্রকারটিই সর্বাধিক প্রচলিত।

অড়ানার সঙ্গে দরবারীর স্বর সাম্য থাকলেও, আড়ানা উত্তরাঙ্গের

ণি
রাগ বলে তা'র প্রবণতা তার সপ্তকের দিকেই বেশি। যেমনঃ র্সা, দ,

ণি ণি ণি ম সা
নি র্সা, রেঁ র্সা, দ দ ণি প, ম প র্সা, দ — ণি প, ম প, জ্ঞ ম, রে

ণি র্ম ণি
সা, সা রে ম প দ, রেঁ র্সা, জ্ঞঁ র্ম রেঁ র্সা, নি র্সা, দ নি র্সা। দরবারী তা'র বিপরীত। মন্দ্র-মধ্য সপ্তকে বেশিক্ষণ আলাপ করতে গেলে এর মধ্যে দরবারীর ছায়াপাত ঘটবার আশঙ্কা থাকে।

আড়ানার ঋষভেও দরবারীর মত ষড়্জের কণ্ লাগে এবং কোমল গান্ধার মধ্যমযুক্ত। কিন্তু দরবারীর গান্ধার অতিকোমল। তাছাড়া দরবারীর গান্ধার আন্দোলিত হয়, অড়ানায় তা হয় না। ঋষভে সা-এর কণ্ লাগলেও দরবারীতে ঋষভের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ—সেটি বাদী স্বর। কিন্তু আড়ানাতে ঋষভ অনুবাদী মাত্র।

আড়ানার কোমল ধৈবতের চাইতে দরবারীর কোমল ধৈবত সামান্য নিচু এবং আন্দোলিত হয়। আড়ানাতে দুই নিষাদই লাগে, দরবারীতে শুদ্ধ নিষাদ লাগে না। কিন্তু আড়ানার শুদ্ধ নিষাদ হারমোনিয়মের শুদ্ধ নিষাদ অপেক্ষা কিছু নিচু। র্সা দ ণি প সমষ্টি আড়ানার সময় শুধু মধ্য সপ্তকেই প্রয়োগ করা হয়, মন্দ্র সপ্তকে হয় না।

আড়ানা আরম্ভ করার সময় মধ্য নি, তার-সা অথবা তার-রে থেকেই আরম্ভ করা হয় কিন্তু দরবারী আরম্ভ করা হয় মধ্য সপ্তকের সা, রে বা ম থেকে।

সর্বোপরি মনে রাখতে হবে যে, আড়ানার প্রকৃতি চপল, তাই তা'র চলনের মধ্যে—প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে সেই চাপল্য বজায় রাখতে হবে। যে গায়কদের কণ্ঠস্বর গম্ভীর নয়, তাঁরা সাধারণতঃ দরবারীর বদলে আড়ানাই গেয়ে থাকেন।

আড়ানার জাতি নিয়ে মতভেদ আছে। যেহেতু অবরোহে বক্রভাবে ধৈবত লাগানো হয়, সেইহেতু কেউ কেউ একে বলেন যাড়ব-সম্পূর্ণ জাতি। যুক্তিটা উপেক্ষণীয় নয়। দরবারী কানাড়ার সম্বন্ধে আলোচনা

করার সময়, এ বিষয় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েচে, তাই এখানে তা'র পুনরাবৃত্তি করা হ'ল না। ধৈবতকে বর্জিত করলে 'সুহা' নামক কানাড়া পরিবারের আরেকটি রাগ পাওয়া যায়। সুহা রাগের আরোহাবরোহ দেখুন : নি্ সা, জ্ঞ ম, প নি ম প, র্সা। র্সা, নি প, ম প, জ্ঞ ম রে, সা। আড়ানার ধৈবত বিহীন একটি প্রকারও আছে।

॥ দেশী ॥

ঠাট—আসাবরী। প্রকৃতি শান্ত। জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে গ ও ধ বর্জিত, অবরোহে সব স্বরই লাগে। বাদী প, সম্বাদী রে। বক্র গতির উত্তরাঙ্গ-বাদী রাগ। পরিবেশনের সময় দিবা দ্বিতীয় প্রহর।

আরোহ॥ সা রে ম প নি র্সা।
অবরোহ॥ র্সা প দ, ম প, রে জ্ঞ, সা রে, নি্ সা।
পকড়॥ ম প জ্ঞ, সা রে নি্ সা।
ন্যাস স্বর॥ সা, রে, জ্ঞ ও প।

আলোচ্য রাগটির নাম প্রাচীন গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত আছে। তবে প্রাচীন রূপের সঙ্গে এর আধুনিক রূপের তুলনা করা যুক্তিযুক্ত হবে না নানা কারণে।

অন্যান্য অনেক রাগের মত এই রাগটি সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। পাঁচ-ছ' রকম দেশীর মধ্যে এখানে মাত্র দু-একটি সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে।

ভাতখণ্ডেজী বলেচেন, এটি তোড়ীর একটি প্রকার বলে একে দেশী-তোড়ীও বলা হয়। কখনো-কখনো এতে শুদ্ধ ধৈবতও প্রয়োগ করা হয়। পূর্বাঙ্গে সারং ও উত্তরাঙ্গে আসাবরীর সংযোগে এই রাগটি উৎপন্ন হয়েচে। "রাগলক্ষণ" গ্রন্থে যে আন্ধ্র মতের দেশীর বর্ণনা আছে, তার স্বরূপের সঙ্গে অধুনা প্রচলিত দেশীর খুব মিল আছে।

ভাতখণ্ডেজী তাঁর ক্রমিকপুস্তকমালিকায় (৬ষ্ঠ ভাগ) এই রাগের আরোহাবরোহ না দিয়ে শুধু উঠাও ও চলন দেখিয়ে দিয়েচেন। যেমন :

সা ম সা নি

উঠাও॥ নি্ সা, রে প জ্ঞ, রে, নি্ সা, রে ম প রে ম প, দ প, ম প জ্ঞ, রে, প জ্ঞ রে, নি্ সা।

ণি
চলন॥ সা, রে জ্ঞ রে সা, রে, ণি্সা, রে ম প, রে ম প, দ প,

ম ম সা
র্সা, প, দ প, ম প জ্ঞ, রে, প জ্ঞ রে, সা ণি্ সা | ম ম প র্সা, নি র্সা,

ণি ম
র্রে র্জ্ঞ র্রে র্সা, র্রে নি র্সা, র্সা, প, দ প, ম প জ্ঞ রে, রে ম

প র্সা, প, দ প, ম প জ্ঞ, রে, সা, রে ন্ সা।

কোন মতে এটি আসাবরী ঠাটের ঔড়ব-ষাড়ব জাতির রাগ। আরোহে গ ও ধ বর্জিত এবং অবরোহে ম বর্জিত। যেমন ঃ

আরোহ॥ সা রে ম প ধ ম প নি র্সা।

অবরোহ॥ র্সা প দ ম প রে জ্ঞ সা রে ণি্সা।

এতে গ কোমল, দুই ধ ও দুই নি লাগানো হয়েচে। বাদী ও সম্বাদী যথাক্রমে ম ও রে। মধ্য ও তার সপ্তকে বিস্তার করা হয়। অবরোহের গতি বক্র। আরোহে বক্রভাবে ধৈবত লাগানো হয় বলে কেউ কেউ এর জাতিকে ষাড়ব-সম্পূর্ণও মানেন।

আরেক প্রকার॥ ঔড়ব-সম্পূর্ণ জাতীয় আসাবরী ঠাটের রাগ এটি। আরোহে গ ও ধ বর্জিত। বাদী-সম্বাদী প ও সা।

আরোহ॥ সা রে ম প নি র্সা

অবরোহ॥ র্সা নি দ প ম জ্ঞ রে সা।

এতে গ, ধ ও নি কোমল।

অন্য আরেক প্রকারে ঋষভ কোমল লাগানো হয়। আসাবরী রাগেও আগে কোমল রে লাগানোর প্রচলন ছিল, এখনো অনেকে এই মত অনুসরণ করেন। এই কোমল রে-যুক্ত আসাবরী ও দেশী যথাক্রমে কোমল আসাবরী ও কোমল দেশী নামেও আখ্যাত হয়।

কেউ বলেন সারং ও আসাবরীর সংমিশ্রণে এটির উৎপত্তি, আবার কোন কোন মতে এর উৎপত্তি হয়েচে আসাবরী ও আড়ানার সংমিশ্রণে।

এতগুলি প্রকারের মধ্যে দুই ধ, দুই নি ও কোমল গ-যুক্ত দেশী-ই বেশি প্রচলিত এবং শ্রুতিমধুর।

উক্ত সমস্ত মতেই এর বাদী স্বর পঞ্চম কিন্তু সম্বাদী হিসেবে রে ও সা-এর

মধ্যে মতভেদ পাওয়া যাচ্চে। রে অপেক্ষা সা-এর সম্বাদীত্বই বেশী যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।…ষড়্‌জ-পঞ্চমের সঙ্গতি মীড় যুক্ত হয়ে থাকে। অবরোহে তার সপ্তকের সা থেকে মীড় টেনে মধ্য সপ্তকের পঞ্চমে আসা হয়, আর মধ্য প থেকে মধ্য-সা পর্যন্ত স্বরগুলিকে প্রয়োগ করা হয় বক্রভাবে। যেমন—প দ, ম প, রে জ্ঞ, সা রে, নি্‌ সা। নিষাদ সব সময়েই ঋষভের সাহায্য নিয়ে উচ্চারিত হয়। শুদ্ধ নিষাদের অপেক্ষা কোমল নিষাদই বেশী লাগানো হয়। কোমল ধৈবত তেমনি শুদ্ধ অপেক্ষা কম লাগে।

দেশী পরিবেশনের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে জৌনপুরীর সঙ্গে এর গোলমাল না হয়ে যায়। কারণ, রে ম প, দ প, কিংবা ম প জ্ঞ—স্বর সমষ্টি এই দুটি রাগেই লাগে। অতএব এই স্বর সমষ্টির পরেই দেশীর রাগ-বাচক সমষ্টি প্রয়োগ করতে হবে। যেমনঃ রে ম প, দ প, ম প জ্ঞ, রে জ্ঞ, সা রে, নি্‌ সা। কিংবা ম প জ্ঞ, রে জ্ঞ সা রে নি্‌ সা। আবির্ভাব-তিরোভাব এই দুই ভাবেই করা হয়।

কাফীর সঙ্গতিতেও দেশী রাগের আবির্ভাব-তিরোভাব দেখানো হয়। যেমন—

মূল রাগ দেশী॥ র্সা প, ধ — ম প, রে জ্ঞ সা রে নি্‌ সা,

কাফীতে তিরোভাব॥ রে ম প — জ্ঞ রে,

দেশীতে পুনরাবির্ভাব॥ রে জ্ঞ সা রে নি্‌ সা।

দেশী রাগের স্বরগুলির মান নিম্নরূপ ঃ—

সা—সাধারণ। মতান্তরে অলংঘন বহুত্ব। কোন মতে সম্বাদী।

রে ও ম—অলংঘন-বহুত্ব। কোন মতে রে সম্বাদী।

জ্ঞ—আরোহে লংঘনমূলক অল্পত্ব; অবরোহে অভ্যাস-বহুত্ব।

প—উভয় বহুত্ব। বাদী স্বর।

ধ—কোমল ও শুদ্ধ উভয় প্রকারই বিশিষ্ট স্থানে অলংঘনমূলক বহুত্ব।

নি—মন্দ্র-সপ্তকে অলংঘন বহুত্ব, কখনো লংঘন-বহুত্ব।

নি—সামান্য।

॥ বিভাস ॥

গৌড়মল্লার রাগটি আলোচনার পূর্বে যেমন জিজ্ঞেস করেছিলাম, এবারেও তেমনি জিজ্ঞেস করে নি, আপনারা কে কোন ঠাটের বিভাস রাগের পরিচয় জানতে চান? কারণ ভৈরব, মারোয়া ও পূর্বী—এই তিন ঠাটেরই বিভাস আছে। অবশ্য ভৈরব ঠাটের বিভাস-ই বেশি প্রচলিত। কাজেই···

আমি তিন প্রকার বিভাস-এরই সাধারণ পরিচয় আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করচি।

॥ ভৈরব ঠাটের বিভাস ॥

প্রকৃতি শান্ত—গম্ভীর। জাতি ঔড়ব-ঔড়ব। ম ও নি এই ঠাটের বিভাসে লাগে না। রে ও ধ কোমল এবং অবশিষ্ট স্বরগুলি শুদ্ধ। বাদী ধ, সম্বাদী গ (মতান্তরে রে)। উত্তরাঙ্গের প্রাতঃকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ। মধ্য ও তার সপ্তকে বিস্তার হয়। পরিবেশনের সময় প্রাতঃকাল।

আরোহ॥ সা ঋ গ প দ র্সা।

অবরোহ॥ র্সা দ প, গ প দ প, গ ঋ সা।

পকড়॥ দ প, গ প, গ ঋ সা।

ন্যাস স্বর॥ সা, দ ও প।

আরোহ দেখেই মনে পড়ে যায় দেশকার বা ভূপালীর কথা। ভূপালীর রে ও ধ-কে কোমল করে দিলেই ভৈরব ঠাটের বিভাস রাগের কাঠামোটি পাওয়া যাবে। এই জন্য অনেকে একে ভৈরব ঠাটের ভূপালীও বলেন। এতে গ-প স্বর-সঙ্গতির প্রাধান্য আছে এবং ধৈবত হয়ে পঞ্চমের ওপর এসে ন্যাস করা হয় বিশেষ ভাবে। অবশ্য ধৈবত স্বরটিও এতে ন্যাস স্বর, তবু বেশির ভাগ সময়ই পঞ্চমে ন্যাস করা হয়।

'রেবা' নামে পূর্বী ঠাটের একটি রাগ আছে, যার সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে ভৈরব ঠাটের বিভাসের সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য দেখা যায়। নিচে এই দুটি রাগের সমতা-বিভিন্নতা দেখুন—

॥ সমতা ॥

১। দুটিরই জাতি ঔড়ব-ঔড়ব।

২। দুটিতেই ম ও নি বর্জিত।

৩। দুটিতেই রে ও ধ কোমল এবং অবশিষ্ট স্বরগুলি শুদ্ধ।

৪। দুটিরই আরোহ এক প্রকার।

৫। সা ও প উভয় রাগেরই ন্যাস স্বর।

॥ বিভিন্নতা ॥

॥ বিভাস ॥	॥ রেবা ॥
১। ভৈরব ঠাটের রাগ।	১। পূর্বী ঠাটের রাগ।
২। বাদী-সম্বাদী যথাক্রমে ধ ও গ (কিংবা রে)।	২। বাদী-সম্বাদী যথাক্রমে সা ও প (মতান্তরে গ ও ধ)।
৩। উত্তরাঙ্গের রাগ।	৩। পূর্বাঙ্গের রাগ।
৪। সময়—সকাল, সন্ধিপ্রকাশ।	৪। সময়—সন্ধ্যা, সন্ধিপ্রকাশ।
৫। অবরোহ ঃ র্সা দ প, গ প দ প, গ ঋ সা।	৫। অবরোহ ঃ র্সা দ প, গ প দ প, গ, প গ, ঋ সা।
৬। সা ও প ছাড়া দ ন্যাস স্বর।	৬। সা ও প ছাড়া গ ন্যাস স্বর।

॥ পূর্বী ঠাটের বিভাস ॥

এই ঠাটের বিভাস হল সম্পূর্ণ জাতীয়। রে ও ধ কোমল, ম তীব্র এবং অবশিষ্ট স্বরগুলি শুদ্ধ। ম ও নি এতে লাগলেও, দুর্বল। বাদী ধ, সম্বাদী রে। উত্তরাঙ্গের রাগ। ন্যাস স্বর সা, গ, প ও ধ। বর্তমানে এই ঠাটের বিভাস আর শোনা যায় না।

॥ মারোয়া ঠাটের বিভাস ॥

জাতি সম্পূর্ণ। প্রকৃতি গম্ভীর। রে কোমল, ম তীব্র ও অবশিষ্ট স্বরগুলি শুদ্ধ। বাদী ধ, সম্বাদী গ। উত্তরাঙ্গের রাগ। সময় প্রাতঃকাল।

আরোহ॥ সা ঋ গ হ্ম গ প ধ নি ধ র্সা।

অবরোহ॥ র্সা নি ধ হ্ম ধ হ্ম গ সা।

পকড়॥ নি্ ঋ গ, হ্ম গ, ঋ সা, গ প ধ, হ্ম গ, প গ, ঋ সা।
ন্যাস স্বর॥ সা, গ, ধ ও নি।

ভৈরব ঠাটের বিভাসের সঙ্গে মারোয়া ঠাটের বিভাসের খানিকটা মিল আছে। যেমন, দুটিরই বাদী-সম্বাদী এক এবং দুটিই প্রাতর্গেয় উত্তরাঙ্গের রাগ। দুটিতেই গ ও প-এর সঙ্গত হয়। অমিল যে আছে তা বোঝাই যাচ্ছে ঠাটের বিভিন্নতার জন্য। গ ও প ছাড়াও, এই ঠাটের বিভাসে ম ও ধ-এর সঙ্গতি আছে। গুণীরা বলেন দেশকার ও গৌরীর মিশ্রণে এর উৎপত্তি।

॥ রামকেলী ॥

ঠাট—ভৈরব। প্রকৃতি গম্ভীর। জাতি বক্র-সম্পূর্ণ। বাদী ধ (মতান্তরে প)। সম্বাদী রে। ঠাট ভৈরব হলেও এতে দুই মধ্যম ও দুই নিষাদ ব্যবহৃত হয়। উত্তরাঙ্গের রাগ। বিস্তার ক্ষেত্র মধ্য ও তার সপ্তক। পরিবেশনের সময় প্রাতঃকাল, প্রাতঃকালীন সন্ধিপ্রকাশ। কেউ বলেন ভৈরবের আগে—কেউ বলেন পরে গাওয়া উচিত।

আরোহ॥ সা গ, ম প, দ নি র্সা।
অবরোহ॥ র্সা নি দ, প, হ্ম প দ র্ণি দ প, গ, ম ঋ সা।
পকড়॥ দ প, হ্ম প, দ ণি দ প গ, ম ঋ সা।
ন্যাস স্বর॥ গ, প ও দ।

রামকেলী রাগটি প্রাচীন। তাই বলে আজকের রামকেলীর মধ্যে কেউ যদি প্রাচীন রামকেলীর রূপ খোঁজবার চেষ্টা করেন, ব্যর্থ হতে হবে। অবশ্য শুধু রামকেলীই নয়, প্রাচীন কালের বহু রাগই—যা আজও বেঁচে আছে গুণী সমাজে,—তার প্রায় সবগুলির মধ্যেই রূপান্তর ঘটেচে। মিল রক্ষিত আছে শুধু নামে।

আপনারা জানেন, যে প্রাচীন 'দেশী' সঙ্গীতের বংশ থেকে আজকের ধ্রুপদ, খেয়াল প্রভৃতি শৈলীর জন্ম হয়েচে, সেই 'দেশী' সঙ্গীতের মধ্যে স্থান ও কাল ভেদে পরিবর্তন করা ছিল মার্জনীয়। সম্ভবতঃ সেই ক্রম-পরিবর্তনের ফলেই আগের রাগগুলির সঙ্গে আজকের রাগগুলির এত অসামঞ্জস্য দেখা যায়। আর বোধহয় সেই কারণেই পণ্ডিত ভাতখণ্ডে রাগগুলির নতুন শাস্ত্রীয়-পরিচয় দেবার

প্রয়াস পেয়েছিলেন। গুণী মাত্রেরই জানা আছে যে, প্রাচীন রামকৃতি, রামক্রী, রামক্রিয়া, রামকিরি প্রভৃতি নামধেয় কতগুলি রাগের সঙ্গে রামকেলী নামটির কিছুটা সামঞ্জস্য আছে। কিন্তু আজকের রামকেলীর সঙ্গে তাদের মিল কতটুকু ?

রামকেলী নিয়ে আজও মতানৈক্য দেখা যায়। এক মতে এর জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে ম ও নি বর্জিত। বাদী কেউ মানেন ধ, কেউ প। সম্বাদী অবশ্য ঋষভকেই মানা হয়। ঠাট ভৈরব। রে ও ধ কোমল, কিন্তু কোমল নিষাদও প্রযুক্ত হয় অল্প পরিমাণে।···আরেক প্রকারে দুই গান্ধার ব্যবহার করা হয়। ভাতখণ্ডেজীর মত সর্বাগ্রেই উল্লিখিত হয়েচে।

আগেই বলা হয়েচে যে, ঠাট ভৈরব হলেও এতে তীব্র মধ্যম ও কোমল নিষাদ ব্যবহার করেন অনেকে। সত্যি বলতে কি, তীব্র ম ও কোমল নি রামকেলীর সৌন্দর্যকে আরো বাড়িয়ে তোলে। তাছাড়া এই দুটি স্বরের প্রয়োগ ভৈরব থেকে এটিকে সহজেই বাঁচিয়ে দেয়। তবে হ্যাঁ, এই দুটি স্বর প্রয়োগের একটু বিশেষ নিয়ম আছে। যেমন, হ্ম প, দ ণি দ প, এই ভাবে, খুব অল্প পরিমাণে লাগানো হয়। অন্য কোন প্রকারে তীব্র হ্ম ও কোমল ণি-কে ব্যবহার করা হয় না। তাছাড়া ভৈরবের স্বর-বিস্তার যেমন মন্দ্র-মধ্য সপ্তকে করা হয়, রামকেলীর বিস্তার তেমনি করা হয় মধ্য ও তার স্থানে। ভৈরব থেকে বাঁচানোর এও একটা ভালো উপায়।

জাতি সম্পূর্ণ হলেও, আরোহের সময় ঋষভকে লংঘন করা হয় এই রাগে। দ্বিতীয়তঃ ভৈরবের ঋষভ যেরূপ গাম্ভীর্যের সঙ্গে আন্দোলিত হয়, রামকেলীতে আন্দোলিত হলেও তা অপেক্ষাকৃত কম হয়।

ষড়্‌জ-পঞ্চম ভাব অনুসারে এই রাগের বাদী-সম্বাদী যথাক্রমে কোমল ধ ও কোমল রে হওয়াই উচিত। অবশ্য ষড়্‌জ-মধ্যম ভাব করে পঞ্চমকেও বাদী মানা যেতে পারে, তাছাড়া দুই মধ্যম তথা দুই নিষাদযুক্ত রাগে পঞ্চমকে বাদী করার রীতিও প্রচলিত আছে। তবে পঞ্চম বাদী মানা হোক বা না-ই হোক, রামকেলীতে তার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। সে এখানে উভয় প্রকার বহুত্ব নিয়ে বিরাজ করচে। পঞ্চম এ রাগে প্রবল এবং অন্যতম ন্যাস স্বর। কিন্তু ঋষভকে সম্বাদী মানার যুক্তি কিছুটা দুর্বল বলেই মনে হয়। বরং যাঁরা এ রাগে সা - প বাদী-সম্বাদী মানেন, তাঁদের

যুক্তিটাই বেশি জোরালো। মনে হয়, ভাতখণ্ডেজী এটিকে উত্তরাঙ্গের মধ্যে ফেলার জন্যই ধ কিংবা প-কে বাদী বলেচেন।

এটি উত্তরাঙ্গের রাগ। অতএব সাধারণ নিয়মানুসারে এই রাগের রূপ অবরোহ ক্রমেই বেশি পরিস্ফুট হয়।

ভৈরব ও কালিংড়া রাগের সঙ্গে রামকেলীর কিছুটা সাদৃশ্য আছে।

ভৈরবের রে ও ধ আন্দোলিত হয় রামকেলী অপেক্ষা বেশি এবং ভৈরবে পঞ্চম অপেক্ষা মধ্যম প্রবল। কিন্তু রামকেলীতে পঞ্চম প্রবল। ভৈরবে সাধারণতঃ মধ্যম থেকে কোমল ঋষভ হয়ে ষড়্জে আসা হয়। রামকেলীতেও ম ঋ সা বলা হয় কিন্তু সেখানে তীব্র ম ও কোমল নি প্রয়োগ করার পর ম ঋ সা বলার জন্য ভৈরব-এর প্রভাব থেকে তাকে বাঁচানো যায়। যেমন এই রাগের অবরোহ এবং পকড় দেখানো হয়েচে। এভাবে না করে রামকেলীতে ম গ ঋ সা করেও নামা হয়। উভয় প্রয়োগই প্রচলিত আছে।

ম প দ নি র্সা—স্বর সমষ্টিও ভৈরব ও রামকেলী—দুটিতেই প্রযোজ্য। তাই এই স্বর সমষ্টি ভৈরবে প্রয়োগ করার সময় ম প দ, নি র্সা, নি দ, ম প ম, ঋ, ঋ সা—এইভাবে বলা হয়। আর রামকেলীতে বলা হয় এই ভাবেঃ ম প, দ, নি র্সা, নি দ ণি দ প, হ্ম প, হ্ম প ণি দ প, গ, ম গ, ঋ সা।

কালিংড়া ও রামকেলী—দুটিতেই পঞ্চম প্রবল এবং ন্যাস স্বর। গান্ধার স্বরটিও উভয় রাগের ন্যাস স্বর। যেমনঃ গ, ম প, দ প, দ ম প, গ ম গ—কালিংড়া। রামকেলীতে হবে গ, ম প, দ প, হ্ম প, দ ণি দ প, গ।

রামকেলীতে এইভাবে আবির্ভাব-তিরোভাব ক্রিয়াটিও দেখানো হয়।

রামকেলীর স্বরগুলির পরিমাণ নিম্নরূপ :—

সা—সাধারণ।

ঋ—আরোহে লংঘনমূলক অল্পত্ব, অবরোহে অনভ্যাসমূলক বহুত্ব।

গ—অলংঘন বহুত্ব।

ম—অলংঘন বহুত্ব।

হ্ম—অনভ্যাস বহুত্ব।

প—উভয় প্রকার বহুত্ব।
দ—অলংঘন বহুত্ব।
ণি—অনভ্যাস বহুত্ব।
নি—অলংঘন বহুত্ব।

॥ যোগিয়া ॥

ঠাট—ভৈরব। প্রকৃতি শান্ত। জাতি ঔড়ব-ষাড়ব। আরোহে গ ও নি, অবরোহে গ বর্জিত। রে ও ধ কোমল, অবশিষ্ট স্বরগুলি শুদ্ধ। কোমল নি ব্যবহারের রীতিও আছে। বাদী ম, সম্বাদী সা। উত্তরাঙ্গের রাগ। পরিবেশনের সময় প্রাতঃকাল।

আরোহ॥ সা ঋ ম প দ র্সা।
অবরোহ॥ র্সা নি দ প, দ ম, ঋ সা।
পকড়॥ ম প দ, ঋ র্সা, নি দ প দ ম, ঋ ম, ঋ সা।
অথবা ঋ ম ম, প প, দ ম ঋ সা।
ন্যাস স্বর॥ সা, ম ও প।

কর্ণাটকী সঙ্গীতে মায়ামালবগৌলম্ নামক ঠাটান্তর্গত সাবেরী নামক একটি রাগ আছে যার সঙ্গে আলোচ্য রাগটির স্বরূপ-সাম্য দেখা যায়। তফাৎ এই যে সাবেরী রাগের অবরোহে গ লাগানো হয় কিন্তু যোগিয়া রাগে গান্ধার একেবারেই বর্জিত। সাবেরীর আরোহাবরোহের স্বরূপ এইরূপঃ সা ঋ ম প দ র্সা। র্সা নি দ প ম গ ঋ সা। সেই জন্য অনেকে মনে করেন, উত্তরী রাগ ভৈরবের সঙ্গে দক্ষিণী সাবেরীর সংমিশ্রণ করে যোগিয়া রাগটি রচিত হয়েচে। রচয়িতার নাম জানা যায় না।

গান্ধার স্বরের প্রয়োগ ক্বচিৎ কখনো অল্প পরিমাণে যোগিয়াতে করা হয়। পঃ ভাতখণ্ডে তাঁর 'অভিনবরাগমঞ্জরী'তেও সে কথা বলেচেনঃ "ক্বচিদ্-গান্ধারসংযুতা"। তবে অবরোহণের সময়েই এই প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন, ম ঋ গ ঋ সা। কণ্ স্বর হিসেবেও ঋষভের সঙ্গে অল্প পরিমাণে গান্ধার যুক্ত করেন অনেকে। বিষ্ণুপুরের স্বর্গীয় রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "সঙ্গীত মঞ্জরী" গ্রন্থেও যোগিয়ায় গান্ধারের প্রয়োগ দেখা যায়। বিষ্ণুপুর ঘরাণায় এই

রাগটিকে ঔড়ব-সম্পূর্ণ জাতির বলা হয়। আরোহে গ ও নি বর্জিত করে অবরোহে গ লাগানো হয়। যেমনঃ সা ঋ ম প দ র্সা। র্সা নি দ প ম গ ঋ সা।—এই আরোহ-অবরোহের স্বরূপ কর্ণাটকী সাবেরীর সঙ্গে হুবহু মিলে যায়।

বাদী-সম্বাদী সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। ওপরে দেখিয়েচি, বাদী ম, সম্বাদী সা। কিন্তু বাদী তার-সা, সম্বাদী ম এবং বাদী ধ, সম্বাদী রে—এরূপ মতও আছে। শেষোক্ত বাদী সম্বাদী মানা হয় সেনী ঘরানা ও বিষ্ণুপুর ঘরানায়।

কোমল নিষাদের প্রয়োগ ধৈবতের সঙ্গে কণ্ স্বর হিসেবে অবরোহের সময় ব্যবহৃত হয়। যেমন, ঋ´ র্সা দ^{ণি} দ^{ণি} প।

॥ শ্রী ॥

ঠাট—পূর্বী। প্রকৃতি গম্ভীর। জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে গ ও ধ বর্জিত। রে ও ধ কোমল, ম তীব্র, অবশিষ্ট স্বরগুলি শুদ্ধ। বাদী রে, সম্বাদী প। পূর্বাঙ্গের রাগ। পরিবেশন-কাল সন্ধ্যা—সায়ংকালীন সন্ধি-প্রকাশ রাগ।

আরোহ॥ সা, ঋ ঋ, হ্ম প, নি র্সা।
অবরোহ॥ র্সা, নি দ প, হ্ম গ ঋ, গ ঋ, ঋ, সা।
পকড়॥ সা, ঋ ঋ, সা, প, হ্ম গ ঋ, গ ঋ, ঋ, সা।
তিন্নপ্রকার॥ ঋ ঋ প, হ্ম দ প।
ন্যাস স্বর॥ সা, রে ও প।

শ্রী নামটির মধ্যেই যেন একটা শোভা ও লাবণ্য মাখানো রয়েচে। কিন্তু অন্যান্য প্রচলিত তথা অপ্রচলিত লাগগুলির মত এই রাগটিকে সচরাচর শোনা যায় না। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে শ্রী রাগের উল্লেখ থাকলেও এই গাম্ভীর্যপূর্ণ শ্রুতিমধুর রাগটি আজ প্রায় অবলুপ্তির পথে। কারণ, মাধুর্যপূর্ণ হলেও রাগটি কঠিন। সেই কারণেই শিল্পীরা একে এড়িয়ে যান কি না কে জানে!

নামের মিল ছাড়া প্রাচীন শ্রী রাগের সঙ্গে বর্তমানের শ্রী-র আর কোন মিল খুঁজতে গেলে আপনারা হতাশ হবেন। প্রাচীনকালের শ্রী ছিল কাফী মেল

অন্তর্গত অর্থাৎ তাতে কোমল গ ও নি ব্যবহৃত হত। তারপর সে পরিবর্তিত হ'ল খমাজ ঠাটে। এখন সে পরিচিত পূর্বী ঠাটের জন্য-রাগ হিসেবে। প্রথম পরিবর্তন (কাফী থেকে খমাজ) মধ্য যুগেই সংঘটিত হয়েছিল। কর্ণাটকীতে এখনো সে কাফী ঠাটের বলেই চিহ্নিত হয়।

শ্রী রাগের সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বর হ'ল কোমল ঋষভ। শুধু বাদী বলে নয়—এর প্রয়োগের মধ্যেই রয়েচে একটা বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য। গান্ধারকে স্পর্শ

সা গ
করে, কখনো বা ষড়জকে ছুঁয়ে গমকী চালে সে চলে। যথা: ঋ, ঋ।

ঋষভকে শুধু কণ্-যুক্ত করে বললেই হবে না, পুনরাবৃত্তি না করলে শ্রী রাগের বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হয়। তাছাড়া আরোহের সময় রে থেকে তীব্র ম হয়ে পঞ্চমে গিয়ে ন্যাস করতে হয়, কখনো বা রে থেকে সোজা পঞ্চমেও চলে যাওয়া

নি সা গ গ
হয় ঋষভকে স্পর্শ করে। যেমন: সা, ঋ, ঋ, সা, ঋ হ্ম — প, হ্ম প,

গ গ ঋ প গ
(প), হ্ম গ ঋ, ঋ, প — ঋ, ঋ, সা। অথবা: হ্ম প, দ প, দ হ্ম

গ গ. ঋ গ
গ ঋ, গ ঋ, প ঋ, ঋ সা। ঋ-প ও প-ঋ সঙ্গত মীড়যুক্ত হবে। উপরোক্ত স্বর সমন্বয় শ্রী রাগকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

কোন কোন ঘরানায় এর আরোহে শুধুই গান্ধারকে বর্জিত করে ষাড়ব-সম্পূর্ণ জাতির অন্তর্ভুক্ত করেন। ধৈবতকে আরোহ গতিতে বক্রভাবে প্রয়োগ করা হয় বলেই তাঁরা ধৈবতকে বর্জিত বলে মানেন না। কেউ কেউ আবার পঞ্চম ও ষড়্জকে যথাক্রমে বাদী-সম্বাদী রূপে চিহ্নিত করেন।

॥ বসন্ত ॥

ঠাট—পূর্বী। প্রকৃতি গম্ভীর। রে ও ধ কোমল, মধ্যম উভয় প্রকার এবং অবশিষ্ট স্বরগুলি শুদ্ধ। জাতি সম্পূর্ণ। বাদী তার সপ্তকের সা, সম্বাদী পঞ্চম। উত্তরাঙ্গের প্রাতঃকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ। স্বর বিস্তার হয় মধ্য ও তার সপ্তকের মধ্যে। ঋতুকালীন রাগ, তাই বসন্ত ঋতুতে এটি যে কোন সময়ে গাওয়া চলে কিন্তু অন্য সময়ে রাত্রির শেষ প্রহরে।

আরোহ ॥ সা গ, হ্ম দ, ঋ́, র্সা।

অবরোহ ॥ ঋ́ নি দ, প, হ্ম গ, হ্ম — গ, হ্ম দ হ্ম গ, ঋ স।

পকড় ॥ হ্ম দ, ঋ́, র্সা, ঋ́ নি দ, প, হ্ম গ, হ্ম — গ।

ন্যাস স্বর ॥ ঋ, গ, প, দ ও র্সা।

বসন্ত ঋতুর এই বিখ্যাত রাগটি নিয়ে শুধু আজই নয়, প্রাচীন গুণীদের মধ্যেও মতভেদের অন্ত ছিল না। প্রাচীনকালে রাগ-রাগিনীর লিঙ্গ নির্ণয়ের সময় কোন পণ্ডিত একে পুংলিঙ্গ করে নাম দিয়েছিলেন বসন্ত, ভিন্ন মতাবলম্বীরা একে স্ত্রীলিঙ্গের সংজ্ঞা দিয়ে নামকরণ করেছিলেন বাসন্তী বা বসন্তী। তা ছাড়া অনুসন্ধান করলে হিন্দুস্থানী ও কর্ণাটকী মতে বিলাবল, ভৈরব, ভৈরবী, আসাবরী, পূর্বী, মারোয়া প্রভৃতি বিভিন্ন ঠাটেই একে দেখতে পাবেন।

বর্তমানে আমরা দুটি ঠাটের বসন্তের সঙ্গে পরিচিত—মারোয়া ও পূর্বী ঠাট। এই দুটি ঠাটের মধ্যেও মতানৈক্য দেখা যায়। যেমন, মারোয়া ঠাটের অন্তর্গত বসন্তকে কেউ পঞ্চম বর্জিত ষাড়ব জাতি মানেন, কেউ বলেন সম্পূর্ণ জাতি।

পূর্বী ঠাটের বসন্তে কেউ শুধু তীব্র মধ্যম ব্যবহার করেন, কেউ দুই মধ্যমই লাগান। শেষোক্ত মতটিই বেশি প্রচলিত। দ্বিতীয় মতের বসন্তে ললিতাঙ্গ দেখানোরও রীতি আছে, যদিও তা অনিবার্য নয়।

ভাতখণ্ডেজী পূর্বী ঠাটের উভয় মধ্যম যুক্ত বসন্তের উল্লেখ করেচেন। যার পরিচয় প্রথমেই দেওয়া হয়েচে। তিনি আরো বলেচেন যে, এতে কোমল গান্ধার যুক্ত করেও গাইবার রীতি আছে, অবশ্য তা বর্তমানে একেবারেই অপ্রচলিত।

আমার পূজ্যপাদ সঙ্গীতাচার্য শ্রীযুক্ত ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের বসন্ত যাঁরা শুনেচেন, তাঁরা হয়ত কোন কোন সময়ে তাঁকে ঈষৎ কোমল গান্ধার লাগাতে দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি যে রীতি বিরুদ্ধ কিছু করেন নি, ভাতখণ্ডেজীর এই উক্তিটিও অন্তত তার সাক্ষ্য দেয়।

ভাতখণ্ডেজী যদিও এর জাতিকে বলেচেন সম্পূর্ণ, কিন্তু তাঁর প্রদর্শিত আরোহে পঞ্চমকে প্রধানতঃ বর্জনই করা হয়েচে। নিষাদকেও মধ্য সপ্তকে বেশির ভাগই অবরোহ গতিতে দেখানো হয়েচে। এ সম্বন্ধে বলা যেতে পারে, এটি বক্রগতির রাগ। রে, প ও নি স্বর তিনটিও আরোহে বক্রগতিতে লাগে। এইরূপ বক্রগতির রাগকে কেউ বলেন বক্রসম্পূর্ণ, কেউ শুধু সম্পূর্ণও

বলেন। ভাতখণ্ডেজীও সেই জন্যই সম্পূর্ণ জাতি বলেচেন। আরোহে রে ও প লাগে না বলে অনেকে ঔড়ব-সম্পূর্ণও বলে থাকেন।

বসন্তের আরোহে প ও নি স্বরকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয় না। তাতে পরজের ছায়া আসে। যদিও পঞ্চম স্বরটি উভয় রাগেই (পরজ ও বসন্ত) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ—সম্বাদী স্বর।

বাদী-সম্বাদী নিয়েও ভাতখণ্ডেজী গোলমাল বাধিয়েছেন। 'রাগচন্দ্রিকাসার' গ্রন্থের দোহাতে তিনি লিখেচেন সা বাদী, ম সম্বাদী। যথাঃ "স ম বাদী সম্বাদীতে, য়হ বসন্ত কহ দীন্হ। কিন্তু ক্রমিক পুস্তকমালিকার রাগ-পরিচিতিতে বলচেন, বাদী তার সপ্তকের সা, সম্বাদী পঞ্চম। শুদ্ধ ধৈবতযুক্ত প্রকারে অবশ্য মধ্যমকেই বাদী মানা হয়, কারণ তাতে পঞ্চম বর্জিত। কিন্তু পণ্ডিতজী তো কোমল ধৈবত যুক্ত প্রকারেরই বর্ণনা করেচেন, তাহলে? আর পঞ্চম যদি সম্বাদী স্বরই হয়, তাহলে আরোহের সময় কি তাকে অমর্যাদা করা উচিত? সেনী ঘরের মতে মধ্যমকে সম্বাদী মানলে ক্ষতি কি ছিল?

আমরা এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম, তার দ্বারা এইটুকুই বোঝাতে চেয়েচি যে, আজকালকার শিক্ষার্থীরা যেন উপাধি পরীক্ষার জন্য রাগগুলিকে মোটামুটি ভাবে সামান্য শিক্ষা করে, অন্য কোন শ্রদ্ধাভাজন শিল্পীদের প্রতি অহেতুক অবজ্ঞা প্রকাশ না করেন। আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। তার বাইরে এমন অনেক কিছু আছে, যা আমরা জানি না। এ অবস্থায় আমার মতের সঙ্গে না মিললেই যে তা ভুল, এমন মনে করা অজ্ঞতারই পরিচায়ক।

পরীক্ষার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যেটুকু জানা দরকার, আলোচ্য বিষয় থেকে আপাততঃ সেইটুকুই গ্রহণ করা উচিত। অতঃপর সেই আলোচনাতেই পুনঃপ্রবেশ করচি।

পুরিয়াধনাশ্রীর আলোচনা প্রসঙ্গে বলেচি, পূর্বী ঠাটের রাগগুলি সাধারণতঃ দুই অঙ্গে পরিবেশিত হয়—শ্রী ও পূর্বী অঙ্গে। বসন্ত গাওয়া হয় শ্রী অঙ্গে। আমরা জানি, র্সা নি দ প, অথবা র্সা র্ঋ নি দ প—স্বর সমষ্টি শ্রীতে প্রযুক্ত হয়। বসন্তে যখন এই স্বর সমষ্টি প্রয়োগ করা হয়, তখন শ্রীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এর পরেই হ্ম গ, হ্ম — গ বলে বসন্তের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা হয়। এই হ্ম গ স্বর দুটির পুনরাবৃত্তি—এটা যেমন বসন্তের গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গতি, শ্রীতে তেমনি তা প্রযোজ্য নয়। বসন্তের প্রথম হ্ম গ বলার পর

দ্বিতীয় বারের সময় হ্ম-কে একটু দীর্ঘ করে তবে গ উচ্চারিত হয়। যেমন, হ্ম গ, হ্ম — গ।

শ্রী অঙ্গের বসন্তের তানগুলি সাধারণতঃ আরোহে ধ-কে বাদ দিয়ে হ্ম প নি র্সা ঋ´ র্সা নি দ প হ্ম গ ঋ সা—এই ভাবে করা হয়।

বসন্তে ললিতের অঙ্গ দেখানো হয় দুই মধ্যমকে পাশাপাশি লাগিয়ে। যেমব : স ম, হ্ম ম গ, এই অংশটুকু বলার পর নি দ, প ইত্যাদি বলে বসন্তে আবির্ভূত হতে হয়। মনে রাখবেন, বসন্তে ললিতাঙ্গ না দেখালেও চলে কিন্তু শ্রী অঙ্গকে এড়ানো যায় না।

পরজের সঙ্গে বসন্তের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ (উভয় রাগের সমতা-বিভিন্নতা ১৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। তাই সব সময় তাকে এড়িয়ে চলতে হবে। তার জন্য বসন্তে ধৈবত এবং পরজে নিষাদ খুব প্রবল রাখা হয়। তার-ষড়্জকে একটু স্থায়ী রেখে—ন্যাস করার পর যদি সোজা নি দ প বলে পঞ্চমের ওপর ন্যাস করা হয়, তাহলে পরজ হয়ে যাবে। কিন্তু দ-এর ওপর ন্যাস করে নি দ — প বললে বসন্ত হবে। বসন্ত আরো পরিস্ফুট হবে যদি র্সা, ঋ´ নি দ — প বলা হয়। আর মনে রাখবেন, পরজে কখনই হ্ম গ স্বরের পুনরাবৃত্তি হয় না কিন্তু বসন্তে খুব বেশি পরিমাণেই হয়।

॥ পরজ ॥

ঠাট—পূর্বী। প্রকৃতি চঞ্চল। রে ও ধ কোমল, উভয় মধ্যম এবং অবশিষ্ট স্বরগুলি এতে শুদ্ধ। জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ। বাদী তার সপ্তকের সা, সম্বাদী প। উত্তরাঙ্গের রাগ। স্বর বিস্তার হয় মধ্য ও তার সপ্তকে। পরিবেশনের সময় রাত্রি শেষ প্রহর। প্রাতঃকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ।

আরোহ॥ ন্ সা গ, হ্ম দ নি র্সা।
অবরোহ॥ র্সা, নি দ প, হ্ম প দ প, গ ম গ, ম গ ঋ সা।
পকড়॥ র্সা, নি দ প, হ্ম প দ প, গ ম গ।
ন্যাস স্বর॥ গ, প ও নি।

বসন্তের মত পরজ রাগটিও প্রাচীন এবং বিসম্বাদমূলক।

পুরিয়াধনাশ্রী ও বসন্ত রাগের আলোচনা কালে বলেচি যে, পূর্বী ঠাটের

রাগগুলিকে শ্রী এবং পূর্বী অঙ্গে পরিবেশন করা হয়। পরজ পরিবেশিত হয় পুরিয়াধনাশ্রীর মত পূর্বী অঙ্গে।

এর জাতি নিয়েও মতভেদ আছে। বিভিন্ন গুণীরা বিভিন্ন জাতির অন্তর্ভুক্ত করেচেন এই রাগটিকে। যেমন: সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ, ষাড়ব-সম্পূর্ণ (আরোহে রে বর্জিত) ও ঔড়ব-সম্পূর্ণ (আরোহে রে ও প বর্জিত)।

সম্পূর্ণ জাতির মতবাদের পক্ষে যাঁরা, তাঁদের আরোহের সঙ্গে ঔড়ব-সম্পূর্ণ মতবাদীদের কিন্তু কোন অমিল নেই। দুই পক্ষের আরোহই নি্ সা গ, ক্ষ দ নি র্সা।

ভাতখণ্ডেজী সম্পূর্ণ জাতির মানলেও তাঁর আরোহে রে ও প পাওয়া যায় না। কিন্তু সম্পূর্ণ জাতির ভিন্ন মতাবলম্বীদের আরোহ-অবরোহ অন্য রকম। যেমন: সা ঋ গ ক্ষ প দ নি র্সা। র্সা নি দ প ক্ষ প দ প ম গ ঋ সা। অবশ্য এই চেহারার পরজের সঙ্গে আমাদের পরিচয় খুবই কম।

সেনী ঘরানায় এটিকে বলা হয় ষাড়ব-সম্পূর্ণ। তাঁদের আরোহ-অবরোহের স্বরূপ হ'ল যথাক্রমে সা গ, ক্ষ প দ নি র্সা। র্সা নি দ প ক্ষ গ ঋ সা। অন্য ঘরানার ষাড়ব-সম্পূর্ণ জাতির আরোহাবরোহ আবার ভিন্ন রকমের। যথা: নি্ সা গ, ম প দ ক্ষ দ নি র্সা। র্সা নি দ প, ক্ষ প, দ প, ম গ, ক্ষ গ ঋ সা।

দেখা যায়, বর্তমানে ঔড়ব-সম্পূর্ণ মতাবলম্বীদের পক্ষই সংখ্যাগুরু।— আলোচনার প্রারম্ভে এই মতের পরিচয় দেওয়া হয়েচে।

পরজ ও বসন্ত সমপ্রকৃতির রাগ। কাজেই দুটির মধ্যে সাম্য-বৈষম্য বুঝে নেওয়া দরকার। পৃষ্ঠান্তরে এই দুটি রাগের সমতা-বিভিন্নতা দেওয়া হয়েচে। কাজেই এখানে আর তার পুনরুল্লেখ না ক'রে শুধু এই দুটি রাগের প্রয়োগাত্মক বিভিন্নতাগুলি আলোচনা করা যাক।

প্রথমে ধরুন দুটি রাগে মধ্যমের স্থান। দুই রাগেই উভয় মধ্যম ব্যবহৃত হলেও, বসন্তে শুধু মধ্যমের প্রয়োগ কম হয়। আর বসন্তে যেমন সা-এর পরেই শুদ্ধ ম-কে লাগান হয়, পরজে তা কোন সময়েই হবে না। পরজের আরোহে শুদ্ধ মধ্যম লাগে না, তীব্র মধ্যম দিয়েই উঠতে হয়। প্রধানতঃ অবরোহের সময় গ ম গ, ম গ ঋ সা—এইভাবে শুদ্ধ মধ্যমকে প্রয়োগ করা হয়। তীব্র ম শুধু আরোহেই নয়, অবরোহেও গ ম গ বলার পর ক্ষ গ ঋ সা—

এই ভাবেও নেমে আসা যায়। অর্থাৎ তীব্র ম আরোহ-অবরোহ উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়।

বসন্তে যেমন হ্ম গ, হ্ম — গ প্রয়োগ খুব গুরুত্বপূর্ণ, পরজে তেমনি গ ম গ। পরজে কোন সময়ই হ্ম ও গ-এর পুনরাবৃত্তি হয় না।

পরজ ও বসন্তের বেশি সাদৃশ্য দেখা যায় মধ্য থেকে তার সপ্তকে যাওয়ার সময়। কারণ দুটিরই আরোহে পঞ্চম বর্জিত। যে তফাৎটুকু আছে, বলতে গেলে তা খুবই সামান্য। অথচ এই সামান্য তফাৎটুকুই অসামান্য হয়ে দাঁড়ায় দুটি রাগের রূপ ফুটিয়ে তোলার সময়। তীব্র মধ্যম থেকে তার-ষড়্জে যাবার সময় পরজে হ্ম দ নি — — র্সা কিন্তু বসন্তে হ্ম দ ঋ´ — — র্সা অথবা হ্ম দ র্সা বলে উঠতে হয়।

পরজের পূর্বাঙ্গে কালিংড়া ও উত্তরাঙ্গে বসন্তের রূপ পাওয়া যায়। বলা হয়, পরজ ঐ রাগ দুটির সংমিশ্রণে রচিত। সেনী মতে এর উৎপত্তি বসন্ত, পুরিয়া-ধনাশ্রী ও সোহিনী রাগ থেকে। বাস্তবিক পক্ষে ঐ রাগগুলির স্বরগত সাম্য পরজের মধ্যে আছে। সেইজন্যই কুশলী কলাকারেরা পরজের মধ্যে ঐ রাগগুলির সাহায্যে আবির্ভাব-তিরোভাব ঘটিয়ে শ্রোতাদের চমৎকৃত করেন। ঐ রাগগুলির ছায়াপাত ঘটে বলেই পরজ গাইবার সময় সতর্কতা দরকার।

বসন্তে যেমন ধৈবতের ওপর ন্যাস হয়, পরজে তেমনি নিষাদের ওপর। যেমন:

বসন্তে॥ র্সা — — নি দ — ঋ´ — — নি দ — — প, হ্ম দ ঋ´ — র্সা।
পরজে॥ র্সা ঋ´ র্সা ঋ´ নি দ নি —, নি — — দ প, গ ম গ।

কালিংড়াতে যেমন দ প, গ ম গ—সমষ্টির বাহুল্য আছে, পরজেও এই সমন্বয় পাওয়া যায়। তাই পরজে এই সমষ্টি প্রয়োগের সময় একটু তীব্র ম-যুক্ত না করলে কালিংড়ার রূপ প্রকট হয়ে উঠবে। কাজেই—হ্ম প, দ প, গ ম গ, হ্ম গ ঋ সা—এইভাবে বলা উচিত। কালিংড়াতে তীব্র ম লাগে না, দুটির পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়।

পরজের র্সা ঋ´ র্সা ঋ´ নি র্সা মনে করিয়ে দেয় সোহিনীকে। তবে দুটির মধ্যে তফাৎ নিম্নরূপ:

পরজ॥ র্সা ঋ´ র্সা ঋ´ নি র্সা নি দ নি।
সোহিনী॥ র্সা ঋ´ র্সা ঋ´ নি র্সা — নি ধ গ।

॥ পুরিয়াধনাশ্রী ॥

ঠাট—পূর্বী। প্রকৃতি চঞ্চল। জাতি সম্পূর্ণ। রে ও ধ কোমল, ম তীব্র, অবশিষ্ট স্বরগুলি শুদ্ধ। বাদী প, সম্বাদী রে। পূর্বাঙ্গের রাগ। সময় সায়ংকালীন সন্ধিপ্রকাশ।

আরোহ॥ নি্ ঋ গ হ্ম প, দ প, নি র্সা।
অবরোহ॥ ঋ´ নি দ প, হ্ম গ, হ্ম ঋ গ, ঋ সা।
পকড়॥ নি্ ঋ গ, হ্ম প, দ প, হ্ম গ, হ্ম ঋ গ, দ হ্ম গ, ঋ সা।
ন্যাস স্বর॥ গ ও প।

নামটি শুনলেই মনে হয়, পুরিয়া ও ধনাশ্রী নামক রাগ দুটির মিশ্রণে 'পুরিয়াধনাশ্রী'র উৎপত্তি হয়েচে। অতএব বিশ্লেষণ করে দেখা যাক ব্যাপারটা।

প্রথমে দেখা যাক, পুরিয়ার সঙ্গে এর কতটুকু সাদৃশ্য আছে। পুরিয়া—মারোয়া ঠাটের রাগ। এতে রে কোমল ও ম তীব্র কিন্তু ধ শুদ্ধ এবং প বর্জিত। পুরিয়াধনাশ্রী রাগের রে কোমল ও ম তীব্র বটে কিন্তু ধ কোমল এবং পঞ্চম প্রবল ভাবে ব্যবহৃত হয়।

এবার দেখুন ধনাশ্রীর সঙ্গে কতটা মেলে। ধনাশ্রী হ'ল কাফী ঠাটের রাগ। এতে গ ও নি কোমল লাগে। পুরিয়াধনাশ্রী এ দুটিরই বিপরীতধর্মী—সে পূর্বী ঠাটের রাগ, এতে গ ও নি শুদ্ধ লাগে। তাহ'লে?

দেখা যাচ্ছে, দুটি রাগেরই পূর্বাঙ্গে তীব্র মধ্যম পর্যন্ত খানিকটা মিল আছে। দুটি রাগেরই আরোহ নি্ ঋ গ হ্ম এই ভাবে ওঠে। তারপর পঞ্চম লাগাবার সঙ্গে সঙ্গেই দুটির চেহারা পৃথক হয়ে যায়। পুরিয়াধনাশ্রী থেকে যদি পঞ্চমকে সরিয়ে নেওয়া হয় এবং ধৈবতকে শুদ্ধ করে দেওয়া হয়, তাহ'লে অনেকটা পুরিয়ার মত হয় বটে। দুটি রাগের আরোহ পর পর সাজিয়ে দেখুন।

পুরিয়া॥ নি্ ঋ গ, হ্ম ধ, নি ঋ´ র্সা।
পুরিয়াধনাশ্রী॥ নি্ ঋ গ হ্ম প, দ প, নি র্সা।

তবে কি এই সাম্যের জন্যই আলোচ্য রাগটিকে ঐ নামে অভিহিত করা হয়?

অনেকের মতে, পূর্বী ঠাটের শ্রী, পূর্বী, জৈতশ্রী ও মালবী রাগের সংমিশ্রণে এটি রচিত।

শ্রী রাগে রে কোমল এবং প্রবল (বাদী স্বর), আরোহে গ ও ধ বর্জিত। পঞ্চমের স্থানও গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি সম্বাদী স্বর। পুরিয়াধনাশ্রীতেও ঋষভ দুর্বল নয়, এটি সম্বাদী স্বর। তাছাড়া ঋষভকে অলংঘনমূলক বহুত্বের সংজ্ঞা দেওয়া হয়। সেনী মতে ঋষভে ন্যাস করা হয় কিন্তু ভাতখণ্ডেজীর মতে হয় না। শ্রীর মতো এর আরোহে গ ও ধ বর্জিত নয় বরং পুরিয়াধনাশ্রীর গান্ধারকে অভ্যাস ও অলংঘনমূলক বহুত্ব রূপে তথা ধৈবতকে কোন মতে অলংঘন বহুত্ব, কোন মতে লংঘনমূলক বহুত্ব রূপে চিহ্নিত করা হয়।

জৈতশ্রী ও মালবী রাগ আমাদের পাঠ্য-বহির্ভূত, তাই ওগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করা হ'ল না।

পূর্বী ঠাটের রাগগুলি প্রধানতঃ দুই অঙ্গে গীত হয়—পূর্বী অথবা শ্রী। যেমন বসন্ত, শ্রী প্রভৃতি শ্রী অঙ্গে কিন্তু পুরিয়াধনাশ্রী পূর্বী অঙ্গে। তাই পুরিয়াধনাশ্রী পরিবেশনের সময়, একে পূর্বী থেকে বাঁচাবার জন্য পূর্বাঙ্গে প, হ্ম গ, হ্ম ঋ গ, প, দ হ্ম গ, ঋ সা এবং উত্তরাঙ্গে ঋ´ নি দ, প, দ গ প, হ্ম গ, হ্ম ঋ গ—এইভাবে প্রয়োগ করা উচিত।

পুনিয়াধনাশ্রীর স্বরগুলির মান নিম্নরূপ ঃ

সা—সামান্য।

ঋ—অলংঘনমূলক বহুত্ব।

গ—দুই প্রকার বহুত্ব। অভ্যাসমূলক ও অলংঘনমূলক।

[অভ্যাসমূলক, যথা ঃ নি্ ঋ গ, হ্ম ঋ গ, দ হ্ম গ, হ্ম ঋ গ।

অলংঘনমূলক, যথা ঃ নি্ ঋ গ, হ্ম প, হ্ম গ ঋ গ, প হ্ম দ প, হ্ম দ হ্ম গ, হ্ম ঋ গ।]

হ্ম—অলংঘনমূলক বহুত্ব।

প—দুই প্রকার বহুত্ব।

[অভ্যাসমূলক, যথা ঃ নি্ ঋ গ হ্ম প, প হ্ম দ প, হ্ম গ ঋ গ হ্ম প, হ্ম প নি দ প, র্সা নি হ্ম নি দ প।

অলংঘনমূলক, যথা ঃ নি্ ঋ গ হ্ম প, হ্ম প দ প, হ্ম প দ নি দ প, নি দ ঋ´ নি দ প, হ্ম গ হ্ম ঋ গ, ঋ, নি্ ঋ সা।]

দ—কোন মতে অলংঘনমূলক বহুত্ব, ভিন্ন মতে লংঘনমূলক অল্পত্ব।
[ওপরে যেভাবে রাগের বিবরণ বা পরিচয় দেওয়া হয়েচে, তাতে ধৈবতকে লংঘনমূলক অল্পত্বই বলা উচিত—আরোহাবরোহের স্বরূপ অনুযায়ী।]
নি—অলংঘনমূলক বহুত্ব।

॥ মুলতানী ॥

ঠাট—টোড়ী। প্রকৃতি শান্ত গম্ভীর। জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহে রে ও ধ বর্জিত। রে, গ ও ধ এতে কোমল লাগে এবং ম তীব্র। বাদী প, সম্বাদী সা। পূর্বাঙ্গের রাগ। পরিবেশনের সময় দিবা শেষ প্রহর।

আরোহ॥ নি্ সা, জ্ঞ হ্ম প, নি র্সা।
অবরোহ॥ র্সা নি দ প, হ্ম জ্ঞ, ঋ সা।
পকড়॥ নি্ সা, হ্ম জ্ঞ, প, হ্ম জ্ঞ, ঋ সা।
ন্যাস স্বর॥ জ্ঞ ও প।

জৌনপুরের সুলতান হুসেন শর্কীর তৈরী বলে যেমন একটি রাগের নাম হয়েচে জৌনপুরী, কলিঙ্গ রাজ্যে জন্মেচে বলে কলিঙ্গড়া (বা কলিংড়া), সম্ভবতঃ মুলতান থেকে তেমনি মুলতানী রাগটির জন্ম হয়েচে।*

এই রাগের কোন উল্লেখ পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে পাওয়া যায় না। খুব সম্ভবতঃ মধ্যকালীন পণ্ডিত কবি লোচনের (১৫শ শতাব্দীর ১ম দিকে) "রাগতরঙ্গিনী"র পূর্বে আর কোন গ্রন্থে এর উল্লেখ নেই।

মুলতানীর আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মনে আসে টোড়ী (বা তোড়ী) রাগটির কথা। পরীক্ষার সময়েও পরীক্ষকেরা টোড়ীর সঙ্গে মুলতানীর তুলনামূলক আলোচনা করতে বলেন। পৃষ্ঠান্তরে এই দুই রাগের সমতা-বিভিন্নতা দেওয়া হয়েচে।

টোড়ী ও মুলতানী—দুটিই টোড়ী ঠাটের রাগ হওয়ার জন্য, দুটিতেই রে, গ ও ধ কোমল, ম তীব্র এবং অবশিষ্ট স্বরগুলি শুদ্ধ লাগে। অবশ্য জাতি এবং

* এই রাগের আবিষ্কার নাকি সম্রাট শাহজহাঁর সময়ে (১৬২৭-৫৮ খৃঃ), ভিন্নমতে আকবরের (১৫৫৬-১৬০৫ খৃঃ) দরবারে মুলতান-নিবাসী শেখ বহাউদ্দীন জকরিয়া করেছিলেন। কিন্তু তার পূর্বে লোচনের 'রাগতরঙ্গিনী' গ্রন্থে এর উল্লেখ এল কী করে?
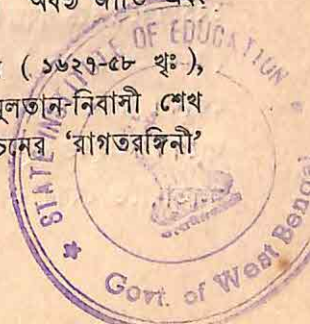
বাদী-সম্বাদী দুটি রাগেই পৃথক। কিন্তু শুধু এই পার্থক্যের জন্যই নয়—দুটি রাগের স্বর একরকম হলেও, তা'র প্রয়োগ-কৌশলের ওপরেও এই দুটি রাগের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। আর এই সূক্ষ্ম প্রয়োগ-নৈপুণ্য পুঁথি-পত্রের সাহায্যে আয়ত্ত করা যায় না। এর জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত গুরু—যিনি এই দুটি রাগের স্বরগুলি ভালো ভাবে বুঝিয়ে দেবেন।

যেমন মনে করুন টোড়ী ও মুলতানী—দুটিরই রে ও ধ কোমল। কিন্তু টোড়ীতে এ দু'টি প্রবল এবং মূলতানীতে দুর্বল।

টোড়ীর গান্ধার অতি কোমল এবং কোমল ঋষভকে স্পর্শ ক'রে তা'র প্রয়োগ কিন্তু মুলতানীর গ সাধারণ কোমল এবং তীব্র মধ্যমের কণ্ সহ প্রযুক্ত হয়।

মুলতানীর ম নি স্বর দুটিও টোড়ীর ম ও নি অপেক্ষা ঈষৎ চড়া। অবশ্য হারমোনিয়মের কল্যাণে আজকাল স্বরের এই সূক্ষ্মতা আর নেই—সবই একাকার হয়ে গেচে।

মুলতানীতে সা, ম ও প স্বর তিনটি যেমন প্রবল, রে ও ধ তেমনি দুর্বল। রে ও ধ যদি সামলে না লাগানো যায়, যদি সামান্য জোরও তাদের ওপর পড়ে, তাহলেই টোড়ীর প্রভাব এসে পড়বে।

তাছাড়া মুলতানীতে যেমন সা, প ও নি ; টোড়ীতে তেমনি রে, গ ও ধ গুরুত্বপূর্ণ।

ক্ষ
মুলতানীর পূর্বাঙ্গ ঃ নি্ সা জ্ঞ, ক্ষ প।

ঋ
টোড়ীর পূর্বাঙ্গ ঃ দ্, নি্ সা, ঋ, জ্ঞ।

ক্ষ´
মূলতানীর উত্তরাঙ্গ ঃ ক্ষ প নি র্সা, জ্ঞ´, ঋ´ র্সা।

ঋ´
টোড়ীর উত্তরাঙ্গ ঃ ক্ষ দ, নি নি র্সা, ঋ´, জ্ঞ´, ঋ´ র্সা।

আমরা ইতিপূর্বে জেনে এসেচি যে, টোড়ী ঠাটের রাগগুলিকে পঃ ভাতখণ্ডে কোমল গ-নি যুক্ত রাগগুলির অন্তর্ভুক্ত করে, তা'র সময় নির্ধারণ করেচেন ১২টা থেকে ৪টে পর্যন্ত (সঙ্গীত পরিচিতি ॥ পূর্বভাগ ॥ পৃষ্ঠা ২৬)। এর পরেই (৪টে থেকে ৭টা) পরিবেশিত হয় কোমল রে-ধ বর্গের রাগ, যেমন পূর্বী। কোমল গ-নি বর্গের রাগ হলেও, মূলতানীতে রে ও ধ স্বর দুটিও কোমল লাগে। এইজন্য মূলতানীকে কেউ কেউ পরমেল-প্রবেশক রাগও বলেন। মূলতানীতে যেমন কোমল রে ধ লাগচে, তেমনি তীব্র মধ্যমও লাগচে।

পরবর্তী মেলের (পূর্বী ঠাটের) পূর্বী রাগেও রে ও ধ কোমল এবং ম তীব্র লাগে। কাজেই মূলতানীর পর পূর্বী ঠাটের রাগ পরিবেশনের পথ সুগম করে দেয়। পরমেল-প্রবেশক রাগ কাকে বলে তা পূর্বেই বলা হয়েচে (সঙ্গীত-পরিচিতি ॥ পূর্বভাগ ॥ পৃঃ ৪৭ দ্রষ্টব্য)।

পরীক্ষার সময় প্রায়ই টোড়ী ও মূলতানীর মধ্যে আবির্ভাব-তিরোভাব দেখাতে বলা হয়। এই ক্রিয়াটি নিম্নরূপে দেখাতে হয়।

মূল রাগ মূলতানী ॥ নি্ সা হ্ম জ্ঞ, হ্ম প, হ্ম জ্ঞ, ঋ সা।
টোড়ীতে তিরোভাব ॥ সা ঋ, জ্ঞ, হ্ম জ্ঞ, ঋ, সা।
মূলতানীতে পুনরাবির্ভাব ॥ হ্ম জ্ঞ, হ্ম প, হ্ম জ্ঞ, ঋ সা।

॥ পুরিয়া ॥

ঠাট—মারোয়া। প্রকৃতি গম্ভীর। জাতি ষাড়ব-ষাড়ব। পঞ্চম এ-রাগের বর্জিত স্বর। বাদী গ, সম্বাদী নি। পূর্বাঙ্গের রাগ। সময় সায়ংকালীন সন্ধিপ্রকাশ।

আরোহ ॥ নি্ ঋ সা, গ, হ্ম ধ নি, ঋ´ র্সা।
ভিন্ন মতে ॥ নি্ ঋ গ, হ্ম ধ নি, ঋ´ র্সা।
অবরোহ ॥ র্সা নি, ধ হ্ম গ, ঋ সা।
পকড় ॥ গ, নি্ ঋ সা, নি্ ধ্ নি্, হ্ম্ ধ্ ঋ সা।
ন্যাস স্বর ॥ গ ও নি।

শার্ঙ্গদেবের "সঙ্গীত রত্নাকর" (১২০৫-১২৪৭ খৃঃ) থেকে অহোবলের "সঙ্গীত পারিজাত" (১৬৫০ খৃঃ) পর্যন্ত কোন গ্রন্থে পুরিয়া রাগের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। মনে হয়, এ-রাগটির বয়েস খুব বেশি নয়।

ভাতখণ্ডেজীর মতের সঙ্গে অন্যান্য গুণীদের, এ-রাগ সম্বন্ধে তেমন কোন মত-বৈষম্য দেখা যায় না। শুধু ধৈবত সম্বন্ধে একটু মতভেদ আছে। কোন মতে শুদ্ধ—কোন মতে কোমল ধৈবত। সাধারণতঃ বিষ্ণুদিগম্বর-ঘরানায় কোমল ধৈবত প্রয়োগ করতে দেখা যায়। কিন্তু এ কোমল ধৈবত হারমোনিয়মের কোমল ধৈবত নয়। এটি হ'ল ঐ কোমল ধৈবত অপেক্ষা একটু

উঁচু শ্রুতির—যার অবস্থান শুদ্ধ থেকে সামান্য একটু নিচুতে। কোমল ঋষভও সাধারণ কোমল ঋষভ অপেক্ষা একটু নিচু শ্রুতির।

পুরিয়ার সঙ্গে মারোয়া ও সোহিনী রাগের সম্পর্ক খুব নিকট। এই নৈকট্য শুধু ঠাটগতই নয়, আরো অনেক কিছু সাম্য আছে। পৃষ্ঠান্তরে সমতা-বিভিন্নতা দ্রষ্টব্য। কল্যাণ ঠাটের হিণ্ডোল ও পূর্বী ঠাটের পুরিয়াধনাশ্রীর সঙ্গেও পুরিয়ার স্বর সমষ্টির কিছুটা সাদৃশ্য দেখা যায়।…কাজেই পুরিয়া বেশ কঠিন রাগ। ভালো ভাবে অভ্যাস না করলে এটি যথাযথ ভাবে পরিবেশন করা বেশ কঠিন। শেখবার সময় সমপ্রকৃতির রাগগুলির সঙ্গে এর কোথায় কতটুকু তফাৎ—তা' ভালো ভাবে বুঝে নেওয়া দরকার।

মারোয়া রাগের পরিচয় ইতিপূর্বে জানানো হয়েচে 'সঙ্গীত পরিচিতি', পূর্বভাগ, ২য় সংস্করণে। পুরিয়া ও মারোয়া দুটিই যেমন মারোয়া ঠাটের, তেমনি দুটিই সায়ংকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ। কিন্তু দুটির মধ্যে রয়েচে প্রকৃতিগত ভিন্নতা। মারোয়া চঞ্চল কিন্তু পুরিয়া শান্ত—গম্ভীর। যদিও দুটি রাগই পূর্বাঙ্গবাদী। তবু পুরিয়ার স্বর বিস্তার বেশির ভাগই মন্দ্র ও মধ্য সপ্তকে তথা মারোয়া মধ্য ও তার সপ্তকে সীমিত। অবশ্য মারোয়াকেও মন্দ্র সপ্তকে নিয়ে যাওয়া হয়; তবে খুব বেশি নয়। এই দুটির মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখার জন্য এদের বাদী সম্বাদী ও ন্যাস স্বরের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। মারোয়ার বাদী-সম্বাদী যথাক্রমে রে ও ধ হওয়ায় এ স্বর দুটি এতে খুব প্রবল এবং ন্যাস করা হয়। কিন্তু পুরিয়ার বাদী-সম্বাদী হল যথাক্রমে গ ও নি। কাজেই এ ক্ষেত্রে রে ও ধ অপেক্ষা গ ও নি-কে প্রবল রাখতে হবে বেশি এবং এই দুটির উপর ন্যাস করতে হবে। পুরিয়া পরিবেশনের সময় যদি রে ও ধ-কে প্রবল করা হয় এবং ন্যাস করা হয়, তাহলে মারোয়ার রূপই প্রকট হয়ে উঠবে। তাছাড়া পুরিয়ার কোমল ঋষভ মারোয়ার কোমল ঋষভ অপেক্ষা একটু নিচু। এখানে দুটি রাগের চলন সংক্ষিপ্ত ভাবে দেখানো হচ্ছে।—

পুরিয়া॥ নি্, ঋ গ, হ্ম গ, হ্ম ঋ গ, নি্, হ্ম গ, ঋ সা, নি্, হ্ম্ ধ্ স।
অন্তরা॥ গ, হ্ম ধ র্সা, নি, র্ঋ র্গ, নি নি র্ঋ র্সা, নি ধ নি,
হ্ম ধ নি, র্ঋ নি, হ্ম ধ র্সা।

মারোয়া॥ নি্ ঋ, সা, গ ঋ, হ্ম গ ঋ, সা, নি্ ধ্, ঋ, সা।
অন্তরা॥ হ্ম ধ, হ্ম ধ র্সা, র্ঋ, নি ধ, হ্ম ধ, নি ধ, হ্ম ধ র্সা,
নি র্সা র্ঋ, নি ধ, হ্ম নি ধ, র্ঋ, র্সা।

সোহিনীর সঙ্গে পুরিয়াকে পৃথক করা খুব কষ্টকর নয়, এই জন্য যে, সোহিনী উত্তরাঙ্গের রাগ এবং সেটির ঝোঁক সব সময় তার সপ্তকের দিকে। (সোহিনীর পরিচয় 'সঙ্গীত পরিচিতি' পূর্ব ভাগে দ্রষ্টব্য)। সেই জন্য পুরিয়ার অন্তরা পরিবেশনের সময় সোহিনীর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যেমন—

পুরিয়া॥ গ, হ্ম ধ র্সা, নি ঋ্র্ সা, নি ধ নি, হ্ম ধ নি, ঋ্র্ সা।
সোহিনী॥ হ্ম ধ নি র্সা, ঋ্র্ সা, র্সা ঋ্র্ সা ঋ্র্ নি র্সা, নি ধ,
গ, হ্ম ধ নি, র্সা ঋ্র্ নি র্সা।

অর্থাৎ সোহিনীতে তার সপ্তকের সা খুব প্রবল এবং পুরিয়ার মত হ্ম ধ র্সা এ ভাবে যায় না। সোহিনীতে সব সময় হবে হ্ম ধ নি র্সা ঋ্র্ সা। ঋষভকেও চঞ্চল ভাবে বারবার প্রয়োগ করা হয় কিন্তু ন্যাস ক'রে প্রবল করা হয় না। সোহিনীতে ঋষভের স্থান আরোহে লংঘন-অল্পত্ব এবং অবরোহে অলংঘন-বহুত্ব।

ভাতখণ্ডেজীর মতে পুরিয়ার ঋষভে ন্যাস করা হয় না। কিন্তু সেনী ঘরানায় আরোহে গ ও ধ-তে এবং অবরোহের সময় নি ও রে-তে ন্যাস করা হয়।

পুরিয়ার স্বরগুলির প্রয়োগ-পরিমাণ (অল্পত্ব-বহুত্ব) নিম্নরূপ—

সা—সামান্য।
ঋ—অলংঘন-বহুত্ব।
গ—উভয় প্রকার বহুত্ব।
হ্ম—অলংঘন বহুত্ব।
ধ—অলংঘন বহুত্ব।
নি—উভয় প্রকার বহুত্ব।

একই স্বর থাকা সত্ত্বেও একটি রাগ থেকে আরেকটি রাগকে পৃথক রাখার যে বৈশিষ্ট্য, তা আপনার আচার্য দেবের কাছ থেকে শিখে নেওয়ার বিষয়। লিখে-পড়ে এ জিনিষ শেখানো বা শেখা যায় না।

মারোয়াতে আদৌ মীড়ের কাজ হয় না। কিন্তু পুরিয়া ও সোহিনীতে হয়। পুরিয়াতে বেশি হয়।

পুরিয়াতে গ হ্ম ধ গ এই স্বর সমষ্টির প্রয়োগ বেশি হয়।

পুরিয়ার সঙ্গে হিণ্ডোলের স্বরগত কিছু বৈশিষ্ট্য থাকলেও, হিণ্ডোলে রে বর্জিত থাকায় সহজেই দুটির মধ্যে পার্থক্য দেখানো যায়।

পূরিয়াধনাশ্রী ও পূরিয়া—দুটিতেই নি্ ঋ গ এবং হ্ম ঋ গ—স্বর সমষ্টি প্রযুক্ত হয়। কিন্তু তা'র পরেই গ হ্ম ধ গ হ্ম গ জুড়ে দিলে পূরিয়ার রূপ পরিস্ফূট হয়ে ওঠে।

রাগের আবির্ভাব-তিরোভাব দেখানোর সময় এই বৈশিষ্ট্যগুলি জানা থাকলে আর কোন অসুবিধা হয় না। যেমন—

মূল রাগ পূরিয়া॥ নি্ ঋ গ, হ্ম ধ নি, ধ হ্ম গ, গ হ্ম ধ গ হ্ম গ, ঋ সা।

মারোয়ায় তিরোভাব॥ ধ্, নি্ ঋ, গ ঋ।

পূরিয়ার পুনরাবির্ভাব॥ নি্ ঋ গ, গ হ্ম ধ গ হ্ম গ, ঋ সা।

মূল রাগ পূরিয়া॥ নি্ ঋ গ, হ্ম গ, নি্ ঋ সা।

সোহিনীতে তিরোভাব। গ, হ্ম ধ নি র্সা, র্ঋ র্সা, নি ধ গ।

মূল রাগে পুনরাবির্ভাব॥ হ্ম ঋ গ, গ হ্ম ধ গ হ্ম গ, ঋ সা।

॥ ললিত ॥

ঠাট—মারোয়া। প্রকৃতি শান্ত—গম্ভীর। রে কোমল, দুই মধ্যম ও অবশিষ্ট স্বরগুলি শুদ্ধ। জাতি ষাড়ব-ষাড়ব। পঞ্চম এ রাগে একেবারেই লাগে না। বাদী শুদ্ধ মধ্যম; সম্বাদী ষড়্জ। উত্তরাঙ্গের রাগ। সময় প্রাতঃকালীন সন্ধিপ্রকাশ।

আরোহ॥ নি্ ঋ গ ম, হ্ম ম গ, হ্ম ধ, র্সা।

অবরোহ॥ র্ঋ নি ধ, হ্ম ধ হ্ম ম গ, ঋ সা।

পকড়॥ নি্ ঋ গ ম, ধ হ্ম ধ হ্ম ম, গ।

ন্যাস স্বর॥ সা, গ, ম ও ধ।

এটি প্রাচীন রাগ হলেও, এর পরিচয় সম্পর্কে গুণীজনদের মধ্যে বিলক্ষণ মতানৈক্য আছে।

পণ্ডিত ভাতখণ্ডে এটিকে মারোয়া ঠাটের অন্তর্গত করেছেন। কারণ, এতে রে কোমল, ধ শুদ্ধ ও ম তীব্র লাগে। অধিকন্তু শুদ্ধ মধ্যমও ব্যবহৃত হয়। যদিও দুটি মধ্যমের একটিকেও এ রাগে বাদ দেওয়া যায় না, তবু শুদ্ধ মধ্যমের স্থানই এখানে গুরুত্বপূর্ণ। এটি এ রাগের বাদী স্বর অর্থাৎ প্রাণ স্বরূপ।

ঠাটের যে সংজ্ঞা ভাতখণ্ডেজী দিয়েছেন, সেই সংজ্ঞা অনুসারে ললিতকে কোন মতেই তাঁর প্রবর্তিত দশ ঠাটের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। প্রধানতঃ

স্বর সাম্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই তিনি সমস্ত রাগগুলিকে দশ ঠাটের মধ্যে ভাগ করেছেন। যেখানে তার ব্যতিক্রম ঘটেছে, সেখানে দেখা হয়েছে স্বরূপ সাম্য। ললিতের বেলায় ঐ দুটির একটিও খাটে না। এই অসঙ্গতির প্রতি যে তিনি অবহিত ছিলেন না তা নয়, সেই জন্যই তিনি বলেছেন, ইচ্ছে করলে এটিকে 'সূর্যকান্ত' (কর্ণাটকী) মেলের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

ধৈবতের প্রয়োগ সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। কোন মতে শুদ্ধ—কোন মতে কোমল ধৈবত। কোন মতে আবার কোমল ধৈবত থেকে একটু চড়া এবং শুদ্ধ ধৈবত থেকে একটু নিচে (পুরিয়ার ধৈবত সম্বন্ধেও এই মত প্রযোজ্য) হ'ল ললিতে ধৈবতের স্থান।

আরোহের সময় মধ্য সপ্তকে নিষাদকে লংঘন করা হলেও মনে করবেন না নিষাদ আরোহে বর্জিত! অবশ্য এরূপ ভাবা যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ আরম্ভই করা হয়েছে মন্দ্র সপ্তকের নিষাদ দিয়ে। তবে জেনে রাখুন, আরোহের সময় মধ্য সপ্তকে প্রায়ই লংঘনমূলক অল্পত্ব হিসেবে নিষাদের প্রয়োগ হলেও, মন্দ্র সপ্তকে তা আদৌ লংঘনীয় নয়।

ভাতখণ্ডেজী ষড়্‌জকে সম্বাদী রূপে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু আরোহের সময় ষড়্‌জকে লংঘন ক'রে ঋষভকে গ্রহণ করা হয়। সম্বাদী স্বর—যা'র স্থান বাদীর পরেই—তাকে এভাবে উপেক্ষা করাটা যেন কেমন ঠেকে।

সেনী মতে কিন্তু ঋষভকে দুর্বল রাখা হয় এবং নি্ ঋ গ ম—এই ভাবে আরোহণ করাকে খুবই অন্যায় এবং নিয়মবিরুদ্ধ মনে করা হয়। তাঁদের মতে—

আরোহ॥ সা ঋ গ ম দ হ্ম দ নি র্সা।

অবরোহ॥ র্সা নি দ হ্ম ম গ ঋ সা।

পকড়॥ নি্ সা গ ম, ম, ম হ্ম গ, হ্ম দ নি দ হ্ম ম।

ললিতের কিছু স্বর-সমষ্টির সঙ্গে পুরিয়া ও সোহিনীর স্বর-সাম্য দৃষ্টিগোচর হয়। অবশ্য ললিতের শুদ্ধ মধ্যম এবং ধৈবতের প্রাধান্য থাকায়, অপর পক্ষে পুরিয়ায় শুদ্ধ মধ্যম না থাকায় এবং নিষাদের প্রাধান্য থাকায়, রাগদুটি সহজেই পৃথক হয়ে যায়। তবে সামান্য হলেও, সুচতুর শিল্পীরা এই সামান্য সুযোগটুকুর সদ্ব্যবহার করার লোভও সংবরণ করতে পারেন না। তাঁরা উভয় রাগের স্বরসমষ্টির সাহায্যে চতুরতার সঙ্গে আবির্ভাব-তিরোভাব ঘটিয়ে গুণী সমাজের প্রশংসা অর্জন করেন। যেমন—

মূল রাগ ললিত॥ নি্ ঋ গ ম, হ্ম ম গ, হ্ম ধ

পুরিয়ায় তিরোভাব ॥ ঋ নি ধ ঋ গ, নি ধ নি, ঋ গ
ললিতে পুনরাবির্ভাব ॥ ঋ ম গ ম গ, গ ঋ ধ, ঋ ম, গ ম গ,
ঋ গ ঋ সা।

ললিতের মধ্যে সোহিনীর সাহায্যে আবির্ভাব-তিরোভাব—
মূল রাগ ললিত ॥ গ, ঋ ধ র্সা, র্সা ঋ র্সা, ঋ নি ধ, ঋ ধ, র্সা
সোহিনীতে তিরোভাব ॥ ঋ ধ নি র্সা, ঋ র্সা, নি ধ ঋ ধ
মূল রাগে পুনরাবির্ভাব ॥ র্সা, র্সা, ঋ নি ধ, ঋ ধ, ঋ ম গ,
ঋ গ ঋ সা।

আগেই বলেচি, ললিতে আরোহের সময় মধ্য সপ্তকে নিষাদের স্থান লংঘনমূলক অল্পত্ব। সেই জন্যই ললিতের উত্তরাঙ্গে ঋ ধ র্সা, র্সা ঋ সা—এই ভাবে ওঠা হয়। কিন্তু সোহিনীর উত্তরাঙ্গে নিষাদের প্রয়োগ ক'রে এই ভাবে ওঠা হয়ঃ গ, ঋ ধ নি র্সা, ঋ র্সা, নি ধ।

॥ অধ্বদর্শক স্বর ॥

মধ্যম (ম) স্বরটিকে বলা হয় অধ্বদর্শক স্বর। মধ্যমের দুটি রূপ (শুদ্ধ ও তীব্র) হিন্দুস্থানী রাগগুলির পরিবেশন-কালকে সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত করেচে। যেমন, শুদ্ধ মধ্যমযুক্ত রাগগুলি দিনের দ্যোতক, তীব্র মধ্যম তেমনি রাত্রির পরিচয়সূচক। যে রাগগুলিতে দুই মধ্যম প্রযুক্ত হয় সেগুলির সময় বুঝে নিতেও খুব অসুবিধে হয় না যদি এই বৈশিষ্ট্যটুকু জানা থাকে। যেমন, বেলা শেষের যে রাগে উভয় মধ্যম লাগে, সেখানে শুদ্ধ মধ্যমের অল্পত্ব যেমন দিনের স্বল্পায়ুর ইঙ্গিত দেয়, তেমনি তীব্র মধ্যম সূচিত করে রাত্রির আগমন বার্তা। যথা পূর্বী। অপর পক্ষে শেষ রাত্রির রাগ রামকেলীতে তীব্র মধ্যম যেমন নিষ্প্রভ, শুদ্ধ মধ্যম তেমনি অপেক্ষাকৃত প্রবল। অর্থাৎ রাত্রি শেষ হয়ে দিন আসচে। এইভাবে দিন যত বাড়তে থাকে, তীব্র মধ্যম ততই ধীরে ধীরে একেবারে মিলিয়ে যায় এবং শুদ্ধ মধ্যমের প্রভাব বেড়ে ওঠে। আবার দিনের আলো যত মলিন হয়ে আসে, শুদ্ধ মধ্যম ততই নিষ্প্রভ হয় এবং রাত্রি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র মধ্যম তার ক্ষমতা বিস্তার করে।...অবশ্য এটা সাধারণ নিয়ম। এর ব্যতিক্রমও আছে। যেমন রাত্রির রাগ খমাজ, কাফী, বাগেশ্রী, রাগেশ্রী, মালকোষ প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে।

॥ রাগের তুলনামূলক আলোচনা ॥

সমপ্রকৃতির দুটি রাগের তুলনা কী ভাবে করতে হয়, সে সম্বন্ধে পূর্বভাগে আলোচনা করেছিলাম। এবার ৪র্থ থেকে ৬ষ্ঠ বর্ষ পর্যন্ত পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত কতকগুলি রাগের সমতা-বিভিন্নতা দেখানো হচ্ছে।—

১ ॥ শংকরা ও বেহাগ ॥

॥ সমতা ॥

১। দুটি রাগেরই ঠাট—বিলাবল।
২। " " আরোহ ঔড়ব জাতীয়।
৩। " " আরোহে ঋষভ বর্জিত।
৪। " " ন্যাস স্বর সা, গ, প ও নি।
৫। " " পরিবেশনের সময় রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।

॥ বিভিন্নতা ॥

॥ শংকরা ॥	॥ বেহাগ ॥
১। জাতি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। যেমন এক মতে ঔড়ব-ষাড়ব, ভিন্ন মতে ঔড়ব-ঔড়ব।	১। জাতি সম্বন্ধে কোন মতান্তর নেই। সর্বসম্মতভাবে এটি ঔড়ব-সম্পূর্ণ জাতীয় রাগ।
২। আরোহে রে ও ম বর্জিত।	২। আরোহে রে ও ধ বর্জিত।
৩। অবরোহে ষাড়ব বা ঔড়ব। (ম বা রে-ম বর্জিত)।	৩। অবরোহ সম্পূর্ণ। সব স্বরই এতে ব্যবহৃত হয়।
৪। মধ্যম এই রাগে বর্জিত।	৪। দুই মধ্যমই ব্যবহৃত হয়।
৫। ঠাট সম্বন্ধে কোন মতভেদ নেই। সর্বসম্মত বিলাবল ঠাট।	৫। ঠাট সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কোন মতে বিলাবল, কোন মতে কল্যাণ।
৬। বাদী-সম্বাদীর মতভেদ আছে। কেউ বলেন র্সা ও প, কেউ বলেন গ ও নি।	৬। বাদী-সম্বাদী যথাক্রমে গ ও নি। এ সম্বন্ধে কারো কোন মতভেদ নেই।

---

২ ॥ দেশকার ও ভূপালী ॥

॥ সমতা ॥

১। দুটি রাগই শান্ত প্রকৃতির।

২। দুটিরই জাতি ঔড়ব-ঔড়ব।

৩। ম ও নি দুটি রাগেই বর্জিত এবং অবশিষ্ট স্বরগুলি শুদ্ধ।

৪। দুটিরই আরোহ-অবরোহের ক্রম এক।

॥ বিভিন্নতা ॥

॥ দেশকার ॥	॥ ভূপালী ॥
১। ঠাট বিলাবল।	১। ঠাট কল্যাণ।
২। বাদী-সম্বাদী যথাক্রমে ধ ও গ।	২। বাদী-সম্বাদী যথাক্রমে গ ও ধ।
৩। উত্তরাঙ্গের রাগ।	৩। পূর্বাঙ্গের রাগ।
৪। পরিবেশনের সময় দিবা ১ম বা ২য় প্রহর।	৪। সর্বসম্মত পরিবেশনের সময় রাত্রি ১ম প্রহর।
৫। এতে গান্ধারের ওপর সাধারণতঃ ন্যাস করা হয় না এবং প থেকে রে পর্যন্ত মীড় টানা হয়।	৫। গান্ধারের ওপর ন্যাস করা হয় এবং প থেকে গ-তে মীড় সহযোগে আসা হয়।
৬। গ, প ও ধ স্বরের সঙ্গতি বেশি। হয়।	৬। সা রে গ স্বরের সঙ্গতি বেশি হয়।
৭। এর সঙ্গে জৈৎকল্যাণ রাগের বেশি মিল আছে।	৭। এর সঙ্গে শুদ্ধ কল্যাণ রাগের বেশি মিল আছে।

---

৩ ॥ ছায়ানট ও কামোদ ॥

॥ সমতা ॥

১। দুটিই কল্যাণ ঠাটের জন্য-রাগ।

২। দুটি রাগেই দুই মধ্যম ব্যবহৃত হয়।

৩। দুটি রাগেই বিবাদী স্বর হিসেবে অল্প পরিমাণে কোমল নিষাদ প্রযুক্ত হয়।

৪। দুটিই এক জাতীয় রাগ। অর্থাৎ দুটিরই জাতি সম্পূর্ণ।

৫। দুটিরই বাদী ও সম্বাদী যথাক্রমে প ও রে।

৬। দুটি রাগের রূপই আরোহে পরিস্ফুট হয়।

৭। দুটি রাগেরই আরোহে নি ও অবরোহে গ বক্র।

৮। দুটি রাগেরই অন্তরা ওঠবার সময় মধ্য প থেকে সোজা তার সা-তে যাওয়া হয়।

॥ বিভিন্নতা ॥

॥ ছায়ানট ॥	॥ কামোদ ॥
১। এটি গম্ভীর প্রকৃতির রাগ।	১। এটি চঞ্চল প্রকৃতির রাগ।
২। এই রাগে তীব্র মধ্যম কামোদ অপেক্ষা কম লাগে।	২। এই রাগে তীব্র মধ্যম ছায়ানট অপেক্ষা বেশি লাগে।
৩। এই রাগে প-রে স্বর সঙ্গতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।	৩। এই রাগে রে-প স্বর সঙ্গতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।
৪। দুটি রাগই সম্পূর্ণ জাতির হলেও ছায়ানটের আরোহ-অবরোহ নিম্নরূপ—	৪। দুটি রাগই সম্পূর্ণ জাতির হলেও কামোদের আরোহ-অবরোহ নিম্নরূপ—
আরোহ—সা, রে, গ ম প, নি ধ, র্সা।	আরোহ—সা, ম রে, প, হ্ম প, নি ধ র্সা
অবরোহ—র্সা নি ধ প, হ্ম প ধ প, গ ম রে সা।	অবরোহ—র্সা, নি ধ, প, হ্ম প ধ প, গ ম প গ ম রে সা।

———

৪ ॥ শুদ্ধকল্যাণ ও দেশকার ॥

॥ সমতা ॥

১। দুটি রাগেরই আরোহ ঔড়ব জাতীয়।

২। দুটি রাগেরই আরোহে একই স্বর লাগে অর্থাৎ ম ও নি স্বর দুটি বর্জিত এবং অবশিষ্ট স্বরগুলি শুদ্ধ।

৩। দুটি রাগেই গ ও ধ প্রবল।

॥ বিভিন্নতা ॥

॥ শুদ্ধ কল্যাণ ॥	॥ দেশকার ॥
১। এটি কল্যাণ ঠাটের রাগ।	১। এটি বিলাবল ঠাটের রাগ।
২। এর প্রকৃতি গম্ভীর।	২। এটির প্রকৃতি শান্ত হলেও শুদ্ধ-কল্যাণের মত গম্ভীর নয়।
৩। এর জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ।	৩। এর জাতি ঔড়ব-ঔড়ব।
৪। এই রাগের বাদী ও সম্বাদী যথাক্রমে গ ও ধ।	৪। এই রাগের বাদী ও সম্বাদী যথাক্রমে ধ ও গ।
৫। এটি পূর্বাঙ্গের রাগ।	৫। এটি উত্তরাঙ্গের রাগ।
৬। এটি কল্যাণ অঙ্গে গাওয়া হয়।	৬। এটি বিলাবল অঙ্গে গাওয়া হয়।
৭। এর পরিবেশন-সময় রাত্রি প্রথম প্রহর।	৭। এর পরিবেশন-সময় দিবা প্রথম প্রহর।
৮। এটি ভূপালী ও কল্যাণ রাগের মিশ্রণে রচিত।	৮। এটি একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ রাগ।
৯। এর স্বর বিস্তার প্রধানতঃ মন্দ্র ও মধ্য সপ্তকে সীমিত থাকে।	৯। এর স্বর বিস্তার প্রধানতঃ মধ্য ও তার সপ্তকে সীমাবদ্ধ।
১০। এর অবরোহে ম ও নি দুর্বল ভাবে লাগে।	১০। এতে কোন সময়েই ম ও নি স্বর প্রযুক্ত হয় না।

॥ শুদ্ধ কল্যাণ ও ভূপালী ॥

॥ সমতা ॥

১। দুটি রাগেরই ঠাট কল্যাণ।

২। দুটিরই আরোহ ঔড়ব জাতীয়।

৩। দুটি রাগেরই আরোহে ম ও নি বর্জিত।

৪। দুটিরই বাদী ও সম্বাদী যথাক্রমে গ ও ধ।

৫। দুটিই সায়ংকালীন রাগ—রাত্রি প্রথম প্রহরে গেয়।

৬। দুটিই পূর্বাঙ্গের রাগ।

॥ বিভিন্নতা ॥

॥ শুদ্ধ কল্যাণ ॥	॥ ভূপালী ॥
১। জাতি নিয়ে মতভেদ আছে।	১। জাতি সম্বন্ধে কোন মতভেদ নেই।
২। অবরোহ সম্বন্ধে মতভেদ আছে (সম্পূর্ণ, ষাড়ব ও ঔড়ব)।	২। এর অবরোহ সর্ববাদী সম্মত ঔড়ব।
৩। এই রাগে রে স্বরটি গুরুত্বপূর্ণ (কোন মতে বাদী স্বর)।	৩। ঋষভের স্থান শুদ্ধ কল্যাণের মত গুরুত্বপূর্ণ নয়।
৪। এটি কল্যাণ ও ভূপালীর মিশ্রিত রূপ।	৪। এই রাগে কোন মিশ্রণ নেই।
৫। এই রাগে গ রে, প রে, সা— স্বরসংগতি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।	৫। এই রাগে গ রে, প রে, সা— স্বরসংগতি হয় না।
৬। এতে মন্দ্র সপ্তকের কাজ বেশি হয়।	৬। শুদ্ধ কল্যাণের মত এতে মন্দ্র সপ্তকের কাজ বেশি হয় না।

---

৬ ॥ হিন্দোল ও পুরিয়া ॥

॥ সমতা ॥

১। দুটি রাগেই পঞ্চম বর্জিত থাকে।
২। " " মধ্যম তীব্র লাগে।
৩। " " গান্ধার প্রবল।
৪। দুটি রাগই গম্ভীর প্রকৃতির।

॥ বিভিন্নতা ॥

॥ হিন্দোল ॥	॥ পুরিয়া ॥
১। এটি কল্যাণ ঠাটের রাগ।	১। এটি মারোয়া ঠাটের রাগ।
২। জাতি ঔড়ব-ঔড়ব।	২। জাতি ষাড়ব-ষাড়ব।
৩। এই রাগে রে ও প স্বর বর্জিত থাকে।	৩। এই রাগে শুধু পঞ্চম বর্জিত হয়।

৪। এই রাগে বাদী ও সম্বাদী যথাক্রমে ধ ও গ। মতান্তরে গ ও ধ।	৪। এই রাগের বাদী-সম্বাদী যথাক্রমে গ ও নি। কোন মতভেদ নেই।
৫। এটি উত্তরাঙ্গের রাগ।	৫। এটি পূর্বাঙ্গের রাগ।
৬। দিবা প্রথম প্রহরে গেয় মতান্তরে (যাঁরা গ-কে বাদী করেন) রাত্রিতে গেয়।	৬। রাত্রি প্রথম প্রহরে গেয়, সন্ধিপ্রকাশ রাগ। কোন কোন মতে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে গেয়।
৭। এতে রে সম্পূর্ণ ভাবে বর্জিত।	৭। এতে কোমল রে ব্যবহৃত হয়।
৮। এই রাগের বিস্তার মধ্য ও তার সপ্তকে হয়।	৮। এই রাগের বিস্তার হয় মন্দ্র ও মধ্য সপ্তকে।
৯। এতে নিষাদ অল্প পরিমাণে এবং বক্র ভাবে ব্যবহার করা হয়।	৯। নিষাদ সম্বাদী রূপে প্রবল ভাবে ব্যবহৃত হয় এবং বক্র হয় না।

---

৭ ॥ মালগুঞ্জী ও বাগেশ্রী ॥

॥ সমতা ॥

১। দুটি রাগই কাফী ঠাটের অন্তর্গত।

২। দুটিরই আরোহে পঞ্চম বর্জিত এবং অবরোহে দুর্বল।

৩। দুটি রাগেই অবরোহ সম্পূর্ণ।

৪। দুটিরই বাদী-সম্বাদী যথাক্রমে ম ও সা।

৫। দুটিই পূর্বাঙ্গের রাগ।

৬। দুটিরই জাতি নিয়ে মতভেদ আছে।

॥ বিভিন্নতা ॥

॥ মালগুঞ্জী ॥	॥ বাগেশ্রী ॥
১। ঠাট নিয়ে মতভেদ আছে। কোন মতে এর ঠাট খমাজ।	১। এটি সর্বসম্মত কাফী ঠাট কোন মতভেদ নেই।
২। এতে দুই গ ও দুই নি লাগে।	২। এতে গ ও নি শুধুই কোমল লাগে।
৩। অবরোহে প বক্রভাবে লাগে না।	৩। অবরোহে প বক্রভাবে লাগে।

৮ ॥ বাহার ও মিঞা-মল্লার ॥

॥ সমতা ॥

১। দুটি রাগই কাফি ঠাট থেকে উৎপন্ন।
২। দুটি রাগেই গ কোমল ও দুই নিষাদ ব্যবহার করা হয়।
৩। ধৈবত স্বরটি দুটি রাগেরই অবরোহে বর্জিত থাকে।
৪। দুটিরই অবরোহ ষাড়ব জাতীয়।
৫। দুটি রাগই ঋতুকালীন।
৬। দুটি রাগই মধ্যরাত্রে পরিবেশিত হয়।
৭। দুটি রাগেরই অবরোহে গ বক্র।

॥ বিভিন্নতা ॥

॥ বাহার ॥	॥ মিঞা-মল্লার ॥
১। প্রকৃতি চঞ্চল।	১। প্রকৃতি গম্ভীর।
২। বসন্ত ঋতুতে গেয়।	২। বর্ষায় গীত হয়।
৩। আরোহে রে বর্জিত।	৩। আরোহে সব স্বরই লাগে।
৪। কোমল গ আন্দোলিত হয় না এবং আরোহে প্রত্যক্ষ প্রয়োগ হয়।	৪। বাহার অপেক্ষা এর গ আরেকটু কোমল এবং আন্দোলিত হয়ে বক্রভাবে প্রযুক্ত হয়।
৫। ণি ধ নি সা স্বরগুলি এতে যে ভাবে ব্যবহৃত হয়, মিঞা-মল্লারে সেরূপ হয় না। এতে প্রত্যেকটি স্বর সমান ওজনে লাগানো হয়। যেমন ণি ধ নি র্সা। তাছাড়া এই স্বরগুলির প্রয়োগ কথনই মন্দ্র সপ্তকে হয় না।	৫। ণি ধ নি সা স্বরগুলি বাহারের মত সমান ওজনে লাগানো হয় না। ধৈবতের ওপর যতটুকু দাঁড়ানো হয়, তার চাইতে বেশি দাঁড়ানো হয় কোমল নিষাদের ওপর এবং তার চাইতে বেশি হয় শুদ্ধ নি-এর ওপর। যেমন, ণি-ধনি- -সা। এই স্বর সমষ্টির প্রয়োগ মন্দ্র এবং মধ্য—দুই সপ্তকেই করা হয়।
৬। সা-ম স্বর সঙ্গতির প্রয়োগ বেশি হয়।	৬। রে ও প সঙ্গতি এই রাগে বেশি হয়।

৭। বাদী-সম্বাদীর কোন মতভেদ নেই, বাদী ম ও সম্বাদী সা।	৭। বাদী-সম্বাদীর মতভেদ আছে। কেউ বলেন, ম-সা, কেউ বলেন সা-পা।
৮। এটির জাতি ষাড়ব-ষাড়ব। মতভেদ নেই।	৮। জাতি সম্পূর্ণ-ষাড়ব। মতান্তরে ষাড়ব-সম্পূর্ণ।

---

৯ ॥ বাগেশ্রী ও বাহার ॥

॥ সমতা ॥

১। দুটিই কাফী ঠাটের রাগ।
২। দুটিরই বাদী-সম্বাদী যথাক্রমে ম ও গ।
৩। দুটিই পূর্বাঙ্গবাদী রাগ।
৪। দুটিই মধ্য রাত্রির রাগ।

॥ বিভিন্নতা ॥

॥ বাগেশ্রী ॥	॥ বাহার ॥
১। জাতি নিয়ে মতভেদ আছে। যথা ষাড়ব-ষাড়ব, ষাড়ব-সম্পূর্ণ ও সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ।	১। জাতি নিয়ে কোন মতভেদ নেই। জাতি ষাড়ব-ষাড়ব—সর্বসম্মত।
২। আরোহে রে অল্প লাগে।	২। আরোহে রে বর্জিত।
৩। অবরোহে ধ লাগে।	৩। অবরোহে ধ বর্জিত।
৪। কখনো শুদ্ধ গ লাগে না।	৪। বিবাদী হিসেবে শুদ্ধ গ লাগানো হয়।
৫। কোমল ধ কখনই লাগে না।	৫। বিবাদী হিসেবে কখনো কখনো কোমল ধ লাগানো হয়।
৬। ম জ্ঞ রে সা এই ভাবে নামা হয়।	৬। জ্ঞ ম রে সা এই ভাবে নামে।

---

১০ ॥ দরবারী কানাড়া ও অড়ানা ॥

॥ সমতা ॥

১। আসাবরী ঠাট থেকে দুটি রাগই উৎপন্ন হয়েচে।
২। দুটি রাগেই গ, ধ ও নি কোমল লাগে।
৩। দুটি রাগেই গ ও ধ বক্র ভাবে লাগে।
৪। দুটিরই অবরোহে ধৈবত বর্জন করা হয়।
৫। দুটিরই অবরোহ ষাড়ব জাতীয়।
৬। দুটিরই সম্বাদী স্বর পঞ্চম।
৭। দুটিরই জাতি নিয়ে মতভেদ আছে।

॥ বিভিন্নতা ॥

॥ দরবারী কানাড়া ॥

১। এটির জাতি সম্পূর্ণ-ষাড়ব।
২। এটি পূর্বাঙ্গের রাগ।
৩। আরোহে সব স্বর লাগে।
৪। বাদী স্বর রে।
৫। প্রকৃতি গম্ভীর।
৬। এতে আড়ানার তুলনায় বেশি মীড় ও গমকের কাজ হয়।
৭। মন্দ্র ও মধ্য সপ্তকের মধ্যেই এর বিস্তার বেশি হয়।
৮। এর ধ অতি কোমল।
৯। এর গ ও ধ-তে আন্দোলিত হয়।
১০। এতে শুধুই কোমল নি লাগে।

॥ আড়ানা ॥

১। এর জাতি ষাড়ব-ষাড়ব।
২। এটি উত্তরাঙ্গের রাগ।
৩। আরোহে গ বর্জিত।
৪। বাদী স্বর র্সা।
৫। প্রকৃতি চঞ্চল।
৬। এতে দরবারীর তুলনায় কম মীড় ও গমকের কাজ হয়।
৭। এর বিস্তার বেশি হয় মধ্য ও তার সপ্তকের মধ্যে।
৮। এর ধ সাধারণ কোমল।
৯। এর গ ও ধ-তে আন্দোলন হয় না।
১০। এতে দুই নিষাদই প্রযোজ্য।

---

১১ ॥ পরজ ও বসন্ত ॥

॥ সমতা ॥

১। দুটি রাগই পূর্বী ঠাট থেকে উদ্ভূত।

২। দুটি রাগেই রে ও ধ কোমল, উভয় মধ্যম এবং অবশিষ্ট স্বরগুলি শুদ্ধ ব্যবহৃত হয়।

৩। দুটিরই বাদী-সম্বাদী যথাক্রমে তার-র্সা ও প।

৪। দুটিই উত্তরাঙ্গের রাগ।

৫। দুটিই প্রাতঃকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ।

৬। স্বর বিস্তারের ক্ষেত্র দুটিরই মধ্য ও তার সপ্তকে।

৭। দুটিরই জাতি সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

॥ বিভিন্নতা ॥

॥ পরজ ॥	॥ বসন্ত ॥
১। প্রকৃতি চঞ্চল।	১। প্রকৃতি শান্ত।
২। দুই মধ্যমের ব্যবহার সর্ববাদী সম্মত।	২। দুই মধ্যমের ব্যবহার সম্বন্ধে মতভেদ আছে।
৩। শুদ্ধ ম বেশি লাগে।	৩। শুদ্ধ মধ্যমের ব্যবহার কম।
৪। পূর্বী অঙ্গে গীত হয়।	৪। শ্রী অঙ্গে গীত হয়।
৫। এটি কালিংড়া ও বসন্তের মিশ্রিত রূপ (পূর্বাঙ্গে কালিংড়া, উত্তরাঙ্গে বসন্ত)।	৫। এটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ রাগ।
৬। নি প্রবল, ধ গৌণ।	৬। ধ প্রবল, নি গৌণ।
৭। হ্ম দ নি র্সা এবং নি দ নি স্বর সমষ্টির প্রয়োগ বেশি হয়।	৭। হ্ম দ র্সা এবং হ্ম দ ঋ´ সা স্বর সমষ্টির প্রয়োগ বেশি হয়।

---

১২ ॥ টোড়ী ও মুলতানী ॥

॥ সমতা ॥

১। দুটি রাগই টোড়ী (বা তোড়ী) ঠাট থেকে উৎপন্ন।
২। রে, গ ও ধ স্বর তিনটি কোমল এবং ম তীব্র উভয় রাগেই ব্যবহৃত হয়।
৩। দুটি রাগেই গ-এর ওপর ন্যাস করা হয়।
৪। দুটিরই অবরোহ সম্পূর্ণ।
৫। দুটিকেই যাবনিক রাগ বলা হয়। প্রাচীন গ্রন্থে এদের উল্লেখ নেই।
৬। দুটিরই প্রকৃতি শান্ত গম্ভীর।

॥ বিভিন্নতা ॥

॥ টোড়ী ॥	॥ মূলতানী ॥
১। জাতি সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ।	১। জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ।
২। আরোহে কোন স্বর বর্জিত নেই।	২। আরোহে রে ও ধ বর্জিত।
৩। পূর্বাঙ্গ সা থেকে আরম্ভ হয়।	৩। পূর্বাঙ্গ নি থেকে আরম্ভ হয়।
৪। বাদী ধ, সম্বাদী গ।	৪। বাদী সা, সম্বাদী প।
৫। ম-গ স্বর সঙ্গতির পুনরাবৃত্তি হয় না।	৫। ম-গ স্বর সঙ্গতির পুনরাবৃত্তি হয়।
৬। গ ও ধ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।	৬। নি ও প বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।
৭। পঞ্চম এতে কম লাগে—অনুবাদী স্বর।	৭। পঞ্চম বেশি লাগে—সম্বাদী স্বর।

---

১৩ ॥ পুরিয়া ও সোহিনী ॥

॥ সমতা ॥

১। দুটি রাগই মারোয়া ঠাটের অন্তর্গত।
২। দুটি রাগই ষাড়ব জাতীয়।
৩। দুটি রাগেই পঞ্চম বর্জিত।
৪। দুটিই সন্ধিপ্রকাশ রাগ।

॥ বিভিন্নতা ॥

॥ পুরিয়া ॥	॥ সোহিনী ॥
১। প্রকৃতি গম্ভীর।	১। প্রকৃতি চঞ্চল।
২। জাতি নিয়ে মতভেদ নেই। সর্বসম্মত জাতি ষাড়ব।	২। জাতি নিয়ে মতভেদ আছে। কোন মতে জাতি ঔড়ব-ষাড়ব।
৩। বাদী গ, সম্বাদী নি।	৩। বাদি ধ, সম্বাদী গ।
৪। পূর্বাঙ্গের রাগ।	৪। উত্তরাঙ্গের রাগ।
৫। সায়ংকালীন সন্ধিপ্রকাশ।	৫। প্রাতঃকালীন সন্ধিপ্রকাশ।
৬। পরিবেশনের সময় রাত্রি প্রথম প্রহর (সন্ধ্যা)।	৬। পরিবেশনের সময় রাত্রি শেষ প্রহর।

১৪॥ পুরিয়া ও মারোয়া ॥

॥ সমতা ॥

১। দুটি রাগেরই ঠাট মারোয়া।
২। দুটিরই জাতি এক—ষাড়ব-ষাড়ব।
৩। দুটি রাগেই পঞ্চম বর্জিত।
৫। দুটিই সায়ংকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ।

॥ বিভিন্নতা ॥

॥ পুরিয়া ॥	॥ মারোয়া ॥
১। প্রকৃতি গম্ভীর।	১। প্রকৃতি চঞ্চল।
২। বাদী গ, সম্বাদী নি।	২। বাদী রে, সম্বাদী ধ।
৩। এর স্বর-বিস্তার মন্দ্র-মধ্য সপ্তকে হয়।	৩। এর স্বর-বিস্তার মধ্য ও তার সপ্তকে হয়।
৪। এতে মীড়ের কাজ হয়।	৪। এতে মীড়ের কাজ হয় না।
৫। এ রাগের কোমল ঋষভ মারোয়া অপেক্ষা কোমল মানে নিচু শ্রুতির।	৫। এ রাগের কোমল ঋষভ পুরিয়া অপেক্ষা উচু শ্রুতির।

॥ তাল-পরিচিতি ॥

১ ॥ **টপ্পা** ॥ টপ্পা তাল বলে যে ষোল মাত্রার ঠেকাটি প্রচলিত, আসলে সেটি ত্রিতালেরই একটি প্রকার। যেহেতু এই প্রকারটি টপ্পা গানের সঙ্গে সঙ্গত করা হয়, সেইহেতু এর নাম হয়ে গেচে টপ্পা তাল। যেমন ধামার (বা ধমার) তালে গাওয়া হয় বলে একটি গীত-শৈলীর নাম হয়েচে ধমার। অবশ্য ধমার-এর সঙ্গে এর একটু তফাৎ এই যে, ধামার গান শুধু ধামার তালের সঙ্গেই গাওয়া হয় কিন্তু টপ্পার সঙ্গে কেবল একটি ঠেকাই নয়—অন্য ঠেকাও সঙ্গত করা হয়। এখানে টপ্পা নামে প্রচলিত তালের ঠেকাটিই দেওয়া হল।

এর মাত্রা সংখ্যা, বিভাগ, তালি, খালি সবই ত্রিতালের মত। শুধু বোল-বাণী ও ছন্দ আলাদা।

[মূল ঠেকা ॥ বরাবর বা ঠায় লয়]

```
+                 ২                 ০                    ৩
১  ২  ৩  ৪ | ৫  ৬  ৭  ৮ | ৯  ১০  ১১  ১২ | ১৩  ১৪  ১৫  ১৬
না -ধী -ক ধী   না -ধী -ক ধী   না -তী  -ক  তী    না  -ধী  -ক  -ধী
```

[দ্বিগুণ লয় ॥ ৯ মাত্রা থেকে]

```
০                             ৩                           +
না-ধী  -কধী  না-ধী  -কধী | না-তী  -কতী  না-ধী  -কধী | না···
```

[তিগুণ লয় ॥ ১ মাত্রা থেকে]

```
+
না-ধী-ক  ধীনা-ধী  -কধীনা  -তী-কতী |

                        ২
                        না-ধী-ক  ধীনা-ধী  -কধীনা  -ধী-কধী।

০
না-তী-ক  তীনা-ধী  -কধীনা  -ধী-কধী |

                        ৩                                  +
                        না-ধী-ক  ধীনা-তী  -কতীনা  -ধী-কধী | না
```

[চৌগুণ লয় ॥ ১৩ মাত্রা থেকে]

৩ +
না-ধী-কধী না-ধী-কধী না-তী-কতী না-ধী-কধী | না···

[আড় লয় ॥ ১ মাত্রা থেকে]

+
না—-ধী —-ক— ধী—না —-ধী— |

২
-ক—ধী —না— -তী—-ক —তী— |

০
না—-ধী —-ক— ধী—না —-ধী— |

৩
-ক—ধী —না— -ধী—-ক —ধী— |

+
না—-তী —-ক— তী—না —-ধী— |

২
-ক—ধী —না— -ধী—-ক —ধী— |

০
না—-ধী —-ক— ধী—না —-তী |

৩ +
-ক—তী —না— -ধী—-ক —ধী— | না···

॥ টপ্পা ঠেকার দ্বিতীয় প্রকার ॥

+ ২
ধিন্ — ধা গ | ধা ধিন্ তা -ক্র |

০ ৩
তিন্ — তা -ক | ধা ধিন্ ধা -ক্র |

॥ টপ্পা ঠেকার তৃতীয় প্রকার ॥

+ ২
ধা ধিন্ -তা ধিন্ | ধা ধিন্ -তা ধিন্ |

০ ৩
তা কৎ -ক তা | না ধিন্ -ত ধিন্ |

টপ্পার সঙ্গে আরেক প্রকার তাল বাজে। তার নাম **আড়াঠেকা।** এটিও ১৬ মাত্রার তাল। ঠেকা নিম্নরূপ :—

+ ২ ০ ৩
তা — ঘে — | তা কে — কে | তা ঘে — ঘে | তা ঘে — ঘে

———

২ ॥ **ধুমালী** ॥ আট মাত্রার এই তালটির সঙ্গত হয় ঠুমরী গানের সঙ্গে। এর বিভাগ সম্বন্ধে মতানৈক্য আছে। কেউ মানেন চারটি বিভাগ কেউ বা দুটি। বিভাগ নিয়ে মতভেদ থাকলেও, ঠেকার বোল্ উভয় মতেই এক। এখানে চারটি বিভাগ দেখানো হ'ল।—

মাত্রা ৮। বিভাগ ৪। তালি ৩ (১, ৩ ও ৭ মাত্রায়)। খালি ১ (৫ মাত্রায়)।

[মূল ঠেকা ॥ ঠায় বা বরাবর লয়]

+ ২ ০ ৩
১ ২ | ৩ ৪ | ৫ ৬ | ৭ ৮
ধা ধিন্ ধা তিন্ ত্রিক ধিন্ ধাগে ত্রিক

[দ্বিগুণ লয় ॥ ৫ মাত্রা থেকে]

০ ৩ +
ধাধিন্ ধাতিন্ | ত্রিকধিন্ ধাগেত্রিক | ধা…

[তিগুণ লয় ॥ ১ মাত্রা থেকে]

+ ২
ধাধিন্ধা তিন্ত্রিকধিন্ | ধাগেত্রিকধা ধিন্ধাতিন্ |
০ ৩ +
ত্রিকধিন্ধাগে ত্রিকধাধিন্ | ধাতিন্ত্রিক ধিন্ধাগেত্রিক | ধা…

[চৌগুণ লয় ॥ ৭ মাত্রা থেকে]

৩ +
ধাধিন্ধাতিন্ ত্রিকধিন্ধাগেত্রিক | ধা…

[আড় লয় ॥ ১ মাত্রা থেকে]

+ ২ ০
ধা-ধিন্ -ধা- | তিন্-ত্রিক -ধিন্- | ধাগে-ত্রিক -ধা- |
৩ + ২
ধিন্-ধা -তিন্- | ত্রিক-ধিন্ -ধাগে- | ত্রিক-ধা -ধিন্- |
০ ৩ +
ধা-তিন্ -ত্রিক- | ধিন্-ধাগে -ত্রিক- | ধা…

ধুমালীর আরেকটি প্রকার দেখা যায় ; যার মাত্রা সংখ্যা ৭ ; ঠেকা দেখুন—

+ ২ ৩ ৪
ধা | ধিন্ | ন ত | ক ধিন্ ন

———

৩॥ **ঝুমরা** ॥ এটির মাত্রা সংখ্যা ধমার বা দীপচন্দী তালের মত ১৪। বিভাগও দীপচন্দীর মত। কিন্তু ঠেকার বোল ও ছন্দে তফাৎ আছে। মাত্রা ১৪। বিভাগ ৪। তালি ৩ (১, ৪ ও ১১ মাত্রায়)। খালি ১ (৮ মাত্রায়)।

[মূল ঠেকা ॥ বরাবর বা ঠায় লয়]

+ ২
১ ২ ৩ | ৪ ৫ ৬ ৭ |
ধিন্ -ধা তিরকিট ধিন্ ধিন্ ধাগি তিরকিট

০ ৩
৮ ৯ ১০ | ১১ ১২ ১৩ ১৪ |
তিন্ -তা তিরকিট ধিন্ ধিন্ ধাগি তিরকিট

[দ্বিগুণ লয় ॥ ৮ মাত্রা থেকে]

০
ধিন্-ধা তিরকিটধিন্ ধিনধাগি |

৩ +
তিরকিটতিন্ -তাতিরকিট ধিন্ধিন্ ধাগিতিরকিট | ধিন্…

[তিগুণ লয় ॥ ১ মাত্রা থেকে]

\+
ধিন্-ধাতিরকিট ধিন্‌ধিন্‌ধাগি তিরকিটতিন্-তা |

২
তিরকিটধিন্‌ধিন্ ধাগিতিরকিটধিন্ -ধাতিরকিটধিন্ ধিন্‌ধাগিতিরকিট |

০ ৩
তিন্-তাতিরকিট ধিন্‌ধিন্‌ধাগি তিরকিটধিন্-ধা | তিরকিটধিন্‌ধিন্

\+
ধাগিতিরকিটতিন্ -তাতিরকিটধিন্ ধিন্‌ধাগিতিরকিট | ধিন্…

[চৌগুণ লয় ॥ ৮ মাত্রা থেকে]

০
ধিন্-ধাতিরকিটধিন্ ধিন্‌ধাগিতিরকিটতিন্ -তাতিরকিটধিন্‌ধিন |

৩
ধাগিতিরকিটধিন্-ধা তিরকিটধিন্‌ধিন্‌ধাগি তিরকিটতিন্-তাতিরকিট

\+
ধিন্‌ধিন্‌ধাগিতিরকিট | ধিন্…

[আড় লয় ॥ ১ মাত্রা থেকে]

\+
ধিন্— -ধা —তিরকিট— ধিন্—ধিন্ |

২
—ধাগি— তিরকিট—তিন্ — -তা— তিরকিট—ধিন্ |

০
—ধিন্— ধাগি—তিরকিট —ধিন্— |

৩
-ধা—তিরকিট —ধিন্— ধিন্—ধাগি —তিরকিট— |

\+
তিন্— -তা —তিরকিট— ধিন্—ধিন্ |

২
—ধাগি— তিরকিট— -ধিন — -ধা — তিরকিট—ধিন্ |

০
—ধিন্— ধাগি—তিরকিট —তিন্— |

৩ +
-তা—তিরকিট —ধিন্— ধিন্—ধাগি —তিরকিট— | ধিন্···

৪। **আড়াচৌতাল**॥ মাত্রা ১৪। বিভাগ ৭। তালি ৪ (১, ৩, ৭ ও ১১ মাত্রায়)। খালি বা ফাঁক ৩ (৫, ৯ ও ১৩ মাত্রায়)।

[মূল ঠেকা ॥ বরাবর বা ঠায় লয়]

\+ ২ ০ ৩
১ ২ | ৩ ৪ | ৫ ৬ | ৭ ৮ |
ধিন্ তেরেকেটে ধী না তু না কৎ তা

০ ৪ ০
৯ ১০ | ১১ ১২ | ১৩ ১৪
তেরেকেটে ধিন্ না ধী ধী না

[দ্বিগুণ লয় ॥ ৮ মাত্রা থেকে]

৩ ০
কৎ ; ধিন্‌তেরেকেটে | ধীনা তুনা |

৪ ০ +
কত্তা তেরেকেটেধিন্ | নাধী ধীনা | ধিন্···

[তিগুণ লয় ॥ ১ মাত্রা থেকে]

\+ ২
ধিন্‌তেরেকেটেধী নাতুনা | কত্তাতেরেকেটে ধিন্‌নাধী |

০ ৩
ধীনাধিন্ তেরেকেটেধীনা | তুনাকৎ তাতেরেকেটেধিন্ |

০ ৪
নাধীধী নাধিন্‌তেরেকেটে | ধীনাতু নাকত্তা |

০ +
তেরেকেটেধিন্‌না ধীধীনা | ধিন্

[চৌগুণ লয় ॥ ৮ মাত্রা থেকে]

৩ ০
কৎ ; ধিন্‌তেরেকেটেধিনা | তুনাকত্তা তেরেকেটেধিন্‌নাধী |

৪ ০ +
ধীনাধিন্‌তেরেকেটে ধীনাতুনা | কত্তাতেরেকেটেধিন্ নাধীধীনা | ধিন্…

[আড় লয় ॥ ১ মাত্রা থেকে]

\+ ২ ০
ধিন্—তেরেকেটে —ধী— | না—তু —না— | কৎ—তা —তেরেকেটে— |

৩ ০ ৪
ধিন্—না —ধী— | ধী—না —ধিন্— | তেরেকেটে—ধী —না— |

০ + ২
তু—না —কৎ— | তা—তেরেকেটে —ধিন্— | না—ধী —ধী— |

০ ৩ ০
না—ধিন্ —তেরেকেটে— | ধী—না —তু— | না—কৎ —তা— |

৪ ০ +
তেরেকেটে—ধিন্ —না— | ধী—ধী —না— | ধিন্…

———

৫। **শিখর তাল** ॥ মাত্রা ১৭। বিভাগ ৪। তালি ৪ (১, ৭, ১৩ ও ১৫ মাত্রায়)। খালি বা ফাঁক নেই।

[মূল ঠেকা ॥ বরাবর বা ঠায় লয়]

\+ ২
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ | ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ |
ধা ত্রিক ধিন্ নক থুং গা ধিন্ নক ধুম কিট তক ধেৎ

৩ ৪
১৩ ১৪ | ১৫ ১৬ ১৭
ধা তিট কত গদি গিন্

[দ্বিগুণ লয় ॥ ১ মাত্রা থেকে]

\+ ২
ধাত্রিক ধিন্‌নক থুঙ্গা ধিন্‌নক ধুমকিট তকধেৎ | ধাত্তিট কতগদি গিনধা

৩ ৪ +
ত্রিকধিন্ নকথুং গাধিন্ | নকধুম কিটতক | ধেৎধা তিটকত গদিগিন | ধা···

[তিগুণ লয় ॥ ১ মাত্রা থেকে]

\+
ধাত্রিকধিন্ নকথুঙ্গা ধিন্‌নকধুম কিটতকধেৎ ধাতিটকত গদিগিনধা |
২
ত্রিকধিন্‌নক থুঙ্গাধিন নকধুমকিট তকধেৎধা তিটকতগদি গিনধাত্রিক |
৩ ৪ +
ধিন্‌নকথুং গাধিন্‌নক | ধুমকিটতক ধেৎধাতিট কতগদিগিন | ধা···

[চৌগুণ লয় ॥ ১ মাত্রা]

\+
ধাত্রিকধিন্‌নক থুঙ্গাধিন্‌নক ধুমকিটতকধেৎ ধাতিটকতগদি গিনধাত্রিকধিন

২
নকথুঙ্গাধিন | নকধুমকিটতক ধেৎধাতিটকত গদিগিনধাত্রিক ধিন্‌নকথুঙ্গা

৩ ৪
ধিন্‌নকধুমকিট তকধেৎধাতিট | কতগদিগিনধা ত্রিকধিন্‌নকথুং | গাধিন্‌নকধুম

\+
কিটতকধেৎধা তিটকতগদিগিন | ধা···

[আড় বা দেড়গুণ লয় ॥ ১ মাত্রা থেকে]

\+
ধা-ত্রিক -ধিন- নক-থুং -গা- ধিন্-নক -ধুম- |
২
কিট-তক -ধেৎ- ধা-তিট -কত- গদি-গিন -ধা- |
৩ ৪
ত্রিক-ধিন্ -নক- | থুং-গা -ধিন্- নক-ধুম |

+
-কিট- তক-ধেৎ -ধা- তিট-কত -গদি- গিন-ধা |

২
-ত্রিক- ধিন্‌-নক -থুং- গা-ধিন -নক- ধুম-কিট |

৩ ৪ +
-তক- ধেৎ-ধা | -তিট- কত-গদি -গিন- | ধা…

৬। **পঞ্চম সওয়ারী॥** মাত্রা ১৫। বিভাগ ৪। তালি ৩ (১, ৪ ও ১২ মাত্রায়)। থালি বা ফাঁক ১ (৮ মাত্রায়)।

[মূল ঠেকা ॥ বরাবর বা ঠায় লয়]

+ ২
১ ২ ৩ | ৪ ৫ ৬ ৭
ধী না ধীধী কৎ ধীধী নাধী ধীনা

০ ৩
৮ ৯ ১০ ১১ | ১২ ১৩ ১৪ ১৫
তীক্র তীনা তেরেকেটে তুনা কত্তা ধীধী নাধী ধীনা

[দ্বিগুণ লয় ॥ ১ মাত্রা থেকে]

+ ২
ধীনা ধীধীকৎ ধীধীনাধী | ধীনাতিক্র তীনাতেরেকেটে তুনাকত্তা

০
ধীধীনাধী | ধীনাধী নাধীধী কৎধীধী নাধীধীনা |

৩ +
তীক্রতীনা তেরেকেটেতুনা কত্তাধীধী নাধীধীনা | ধী…

[তিগুণ লয় ॥ ১১ মাত্রা থেকে]

৩
০
তীক্র তীনা তেরেকেটে ; ধীনাধীধী | কৎধীধীনাধী

+
ধীনাতীক্রতীনা তেরেকেটেতুনাকত্তা ধীধীনাধীধীনা | ধী…

[চৌগুণ লয় ॥ ১ মাত্রা থেকে]

\+
ধীনাধীধীকৎ ধীধীনাধীধীনাতীক্র তীনাতেরেকেটেতুনাকত্তা ।

২
ধীধীনাধীধীনাধী নাধীধীকৎধীধী নাধীধীনাতীক্রতীনা

০
তেরেকেটেতুনাকত্তাধীধী । নাধীধীনাধীনা ধীধীকৎধীধীনাধী

৩
ধীনাতীক্রতীনাতেরেকেটে তুনাকত্তাধীধীনাধী । ধীনাধীনাধীধী

\+
কৎধীধীনাধীধীনা তীক্রতীনাতেরেটেতুনা কত্তাধীধীনাধীধীনা । ধী…

[আড়লয় ॥ ৬ মাত্রা থেকে]

\+ ২
ধী নী ধীধী ॥ কৎ ধীধী ; ধী-না -ধীধী- ।

০
কৎ-ধীধী -নাধী- ধীনা-তীক্র -তীনা- ।

৩ ÷
তেরেকেটে-তুনা -কত্তা- ধীধী-নাধী -ধীনা- । ধী…

৭। গজঝম্পা ॥ মাত্রা ১৫। বিভাগ ৪। তালি ৩ (১, ৫ ও ১২ মাত্রায়)। খালি বা ফাঁক ১ (৯ মাত্রায়)।

+				২				০			৩			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
ধা	ধিন্	নক	তক	ধা	ধিন্	নক	তক	তিন্	নক	তক	তেটে	কতা	গদি	ঘিন্

[দ্বিগুণ লয় ॥ ১ মাত্রা থেকে]

\+ ২
ধাধিন্ নকতক ধাধিন্ নকতক । তিন্নক তকতেটে কতাগদি ঘিনধা ।

০ ৩
ধিন্‌নক তকধা ধিন্‌নক । তকতিন্‌ নকতক তেটেকতা গদিঘিন ।
\+
ধা…

[তিগুণ লয় ॥ ১১ মাত্রা থেকে]

০ ৩
তিন্‌ নক ; ধাধিননক ॥ তকধাধিন্‌ নকতকতিন্‌
\+
নকতকতেটে কতাগদিঘিন । ধা…

[চৌগুণ লয় ॥ ১ মাত্রা থেকে]

\+
ধাধিন্‌নকতক ধাধিন্‌নকতক তিন্‌নকতকতেটে কতাগদিঘিনধা ॥
২
ধিন্‌নকতকধা ধিন্‌নকতকতিন্‌ নকতকতেটেকতা গদিঘিনধাধিন্‌ ।
০
নকতকধাধিন্‌ নকতকতিন্‌নক তকতেটেকতাগদি ।
৩ +
ঘিনধাধিন্‌নক তকধাধিন্‌নক তকতিন্‌নকতক তেটেকতাগদিঘিন । ধা

[আড় লয় ॥ ৬ মাত্রা থেকে]

\+ ২ ০
ধা ধিন্‌ নক তক । ধা ; ধা-ধিন্‌ -নক- তক-ধা । -ধিন্‌- নক-তক -তিন্‌-
৩ +
নক-তক -তেটে- কতা-গদি -ঘিন- । ধা…

৮। **মত্ততাল** ॥ এই তালের মাত্রা সংখ্যা নিয়ে মতানৈক্য আছে। পুরোনো গুণীরা অনেকে ৯ মাত্রা মানেন কিন্তু বর্তমানের পরীক্ষা-প্রবর্তকেরা এটিকে মানেন ১৮ মাত্রা। পরীক্ষার্থীদের জন্য লেখা বলে আমি এখানে প্রথমে ১৮ মাত্রাই দেখালাম। মাত্রা ১৮। বিভাগ ৯। তালি ৬ (১, ৫, ৭, ১১, ১৩ ও ১৫ মাত্রায়)। খালি ৩ (৩, ৯ ও ১৭ মাত্রায়)।

[মূল ঠেকা ॥ বরাবর বা ঠায় লয়]*

\+ ০ ২ ৩ ০

১ ২ | ৩ ৪ | ৫ ৬ | ৭ ৮ | ৯ ১০

ধি — না — ধি তিরকিট ধি না তু না

৪ ৫ ৬ ০

১১ ১২ | ১৩ ১৪ | ১৫ ১৬ | ১৭ ১৮

কৎ তা তিরকিট ধি না ধি ধি না

[দ্বিগুণ লয় ॥ ১০ মাত্রা থেকে]

\+ ০ ২ ৩ ০

ধি — | না — | ধি তিরকিট | ধি না | তু ; ধি— |

৪ ৫ ৬ ০ +

না— ধিতিরকিট | ধিনা তুনা | কত্তা তিরকিটধি | নাধি ধিনা | ধি···

[তিগুণ লয় ॥ ১৩ মাত্রা থেকে]

৫ ৬ ০ +

ধি-না -ধিতিরকিট | ধিনাতু নাকত্তা | তিরকিটধিনা ধিধিনা | ধি···

[চৌগুণ লয় ॥ ১০ মাত্রা থেকে]

০ ৪ ৫

তু ; ধি-না- | ধিতিরকিটধিনা তুনাকত্তা | তিরকিটধিনাধি ধিনাধি- |

৬ ০ +

না-ধিতিরকিট ধিনাতুনা | কত্তাতিরকিটধি নাধিধিনা | ধি···

[আড় বা দেড়গুণ লয় ॥ ৭ মাত্রা থেকে]

৩ ০ ৪ ৫

ধি - - -না- | - - ধি -তিরকিট- | ধি-না -তু- | না-কৎ -তা- |

৬ ০ +

তিরকিট-ধি -না- | ধি-ধি -না- | ধি···

---

* এই ঠেকারই আরেক প্রকার বিভাগও মানা হয়। যেমন :

\+ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

ধি- না- | ধী তিরকিট | ধী না তু না | ক ত্তা | তিরকিট ধি | নাধি ধিনা |

এই তালের আরেক প্রকার ঠেকা নিচে দেওয়া হচ্ছে। লয়কারীগুলি উপরোক্ত নিয়মে করুন।

+ ০ ২ ৩ ০ ৪ ৫ ৬ ০
ধা -| ধি ড | ন ক | ধি ড | ন ক | তি ট | ক ত | গ দি | গি ন

॥ ৯ মাত্রার মত্ত তালের ঠেকা ॥

+ ২ ৩ ৪ ৫ ৬
ধা তিট | নাগে | তিট কত | কিট | তিট | কত গেন

৯। **পাঞ্জাবী ঠেকা**॥ এই ষোল মাত্রার ঠেকাটি অনেকটা টপ্‌পা ঠেকার মত। মাত্রা ১৬। বিভাগ ৪। তালি ৩ (১, ৫ ও ১৩)। খালি ১ (৯ মাত্রায়)।

[মূল ঠেকা ॥ বরাবর বা ঠায় লয়]

+ ২ ০ ৩
১ ২ ৩ ৪ | ৫ ৬ ৭ ৮ | ৯ ১০ ১১ ১২ | ১৩ ১৪ ১৫ ১৬
ধা -ধী -ক ধা ধা -তী -ক তা তা -ধী -ক ধা ধাগে নাধী -ক ধা

[দ্বিগুণ লয় ॥ ৯ মাত্রা থেকে]

০ ৩ +
ধা-ধী -কধা ধা-তী -কতা | তা-ধী -কধা ধাগেনাধী -কধা | ধা···

[তিগুণ লয় ॥ ১ মাত্রা থেকে]

+
ধা-ধী-ক ধাধা-তী -কতাতা -ধী-কধা |

২
ধাগেনাধী-ক ধাধা-ধী -কধাধা -তী-কতা |

০ ৩
তা-ধী-ক ধাধাগেনাধী -কধাধা -ধী-কধা | ধা-তী-ক তাতা-ধী

+
-কধাধাগে নাধী-কধা | ধা···

[চৌগুণ লয় ॥ ১৩ মাত্রা থেকে]

+ ২ ০
ধা -ধী -ক ধা | ধা -তী -ক তা | তা -ধী -ক ধা ; |

৩ +
ধা-ধী-কধা ধা-তী-কতা তা-ধী-কধা ধাগেনাধী-কধা | ধা···

[আড় লয় ॥ ১ মাত্রা থেকে]

+
ধা — -ধী — -ক — ধা — ধা — -তী — |

২
-ক — তা — তা — -ধী — -ক — ধা — |

০
ধাগে — নাধী — -ক — ধা — ধা — -ধী — |

৩
-ক — ধা — ধা — -তী — -ক — তা — |

+
তা — -ধী — -ক — ধা — ধাগে — নাধী |

২
-ক — ধা — ধা — -ধী — -ক — ধা — |

০
ধা — -তী — -ক — তা — তা — -ধী — |

৩ +
-ক — ধা — ধাগে — নাধী — -ক — ধা — | ধা

১০। **অদ্ধা** ॥ মাত্রা ১৬। বিভাগ ৪। তালি ৩ (১, ৫ ও ১৩ মাত্রায়)। খালি ১ (৯ মাত্রায়)। এই তালটিকে সিতারখানীও বলা হয়।

[মূল ঠেকা ॥ বরাবর বা ঠায় লয়]

+ ২ ০ ৩
১ ২ ৩ ৪ | ৫ ৬ ৭ ৮ | ৯ ১০ ১১ ১২ | ১৩ ১৪ ১৫ ১৬
ধা ধিন্ — ধা ধা ধিন্ — ধা ধা তিন্ — তা তা ধিন্ — ধা

[দ্বিগুণ লয় ॥ ৯ মাত্রা থেকে]

০ ৩ +
ধাধিন্ —ধা ধাধিন্ —ধা । ধাতিন্ —তা তাধিন্ —ধা । ধা···

[তিগুণ লয় ॥ ১ মাত্রা থেকে]

+
ধাধিন্— ধাধাধিন্ —ধাধা তিন্—তা ।

২
তাধিন্— ধাধাধিন্ —ধাধা ধিন্—ধা ।

০
ধাতিন্— তাতাধিন্ —ধাধা ধিন্—ধা ।

৩ +
ধাধিন্— ধাধাতিন্ —তাতা ধিন্—ধা । ধা···

[চৌগুণ লয় ॥ ১৩ মাত্রা থেকে]

৩ +
ধাধিন্—ধা ধাধিন্—ধা ধাতিন্—তা তাধিন্—ধা । ধা···

[আড় লয় ॥ ১ মাত্রা থেকে]

+ ২
ধা—ধিন্ — — — ধা—ধা —ধিন্— । — — ধা —ধা—
তিন্ — — —তা— ।

০ ৩
তা—ধিন্ — — — ধা—ধা —ধিন্— । — — ধা —ধা—
ধিন্ — — —ধা— ।

+ ২
ধা—তিন্ — — — তা—তা —ধিন্— । — — ধা —ধা—
ধিন্ — — —ধা— ।

০ ৩
ধা—ধিন্ — — — ধা—ধা —তিন্— । — — তা —তা—
+
ধিন্ — — —ধা— । ধা

—

॥ গণিতের দ্বারা কোন গান বা তালের দ্বিগুন, তিগুন ইত্যাদি আরম্ভ করার স্থান নির্ণয় ॥

ধ্রুপদ ও ধমার গানের বিশেষভাবে দুগুণ, তিগুণ, চারগুণ ইত্যাদি বিভিন্ন লয়কারীর কাজ দেখান হয়। এই লয়কারীর নিয়ম হচ্ছে, গানের মুখড়া— মানে আরম্ভের কথা থেকে সুরু করে সম্পূর্ণ স্থায়ী বা অন্তরার কথাকে সমান ২গুণ, ৩গুণ ইত্যাদি হিসেবে ভাগ করে বলতে হবে। এই লয়কারী করার একটি বিধিবদ্ধ নিয়ম আছে। নিজের সুবিধে মত কোথাও ছোট-বড় করা বিধিসম্মত নয়। যে শৈলীতে ধ্রুপদ ও ধমার গানের কবিতা রচিত হয়, তাতে এই ধরনের লয়কারী করতে সুবিধে হয়। কোনো লয়কারী করার সময় কোন্ জায়গা থেকে আরম্ভ করলে সেটা ঠিকমত হবে, তার একটা হিসেব আছে। অনেকেই শিক্ষার্থীদের লয়কারী শেখাবার সময় শুধু মুখস্থ করিয়ে দেন, আসল হিসেবের রহস্যটা বুঝিয়ে দেন না। এইখানে সেই হিসেবটা বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

উদাহরণের জন্য একটি ধমার গানকে বেছে নিচ্চি। কারণ ধমার তালটা একটু কঠিন, অসমান ছন্দের তাল। এখানে ধমারের যে গানটির স্থায়ী দেওয়া হচ্ছে, সেটি স্বর্গীয় ভাতখণ্ডেজীর ক্রমিক পুস্তকমালিকার (হিন্দী সংস্করণ) তৃতীয় খণ্ডের ১১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

১১	১২	১৩	১৪	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
অ	বি	র	গু	লা	০	০	ল	০	লা	০	ল	কে	০
স	র	রং	গ	ছি	র	০	ক	ত	বি	র্জ	তি	য়০	ন
কো	০	হ	রি	প	ক	র০	কে	০	ধা	য়	ধা	০	য়

মনে করুন এই স্থায়ীটির দুগুণ করতে হবে। তাহলে প্রথমে আপনি দেখবেন, সম্পূর্ণ স্থায়ীটি কত আবৃত্তিতে (আবর্তনে) আছে এবং মুখড়া (গান আরম্ভের সময় সমের আগে যে কথাগুলি থাকে) কত মাত্রার।

স্থায়ী পুরো তিন আবৃত্তিতে শেষ হয়েচে, মানে স্থায়ীর মোট মাত্রাসংখ্যা

৪২। মুখড়া আরম্ভ হয়েচে ১১শ মাত্রা থেকে। তার মানে মুখড়াটি ৪ মাত্রার। মুখড়ার এই ৪ মাত্রা এবার যোগ ক'রে দিন ৪২-এর সঙ্গে। মোট মাত্রাসংখ্যা হ'ল ৪৬ (৪২ + ৪)। এবার এই ৪৬ মাত্রাকে ২ দিয়ে ভাগ করুন। হ'ল ২৩ মাত্রা (৪৬ ÷ ২ = ২৩)। পূরো স্থায়ীকে দুগুণ করতে হলে ২৩ মাত্রার মধ্যে বলতে হবে। এবার দুগুণ আরম্ভ করার জায়গাটি বার করার জন্য দেখুন, ২৩ মাত্রায় ধমার তালের কত আবৃত্তি হয়। হবে ১ আবৃত্তি, ৯ মাত্রা। ৯ মাত্রা মানে মাত্রা কম ১ আবৃত্তি (১৪ − ৯ = ৫)। অতএব সম থেকে ৫ মাত্রা বাদ দিয়ে ৬ষ্ঠ মাত্রা মানে ২য় তাল থেকে দুগুণ আরম্ভ করুন।

৩					+						২			০		
১১	১২	১৩	১৪	|	১	২	৩	৪	৫	|	৬	৭	|	৮	৯	১০
অ	বি	র	গু		লা	০	০	ল	০; অবি		রগু	লা০		০ল	০লা	

০ল কে০ সর রঙ্গ ছির ০ক তবি র্জতি য়০ন কো০ হরি পক র০কে ০ধা

য়ধা ০য় অবি রগু লা

আশা করি হিসেবটা বুঝতে কোনই অসুবিধে হয় নি। এবার দেখুন তিগুণ করতে হলে কি করতে হবে।

প্রথমে আগের মত সম্পূর্ণ স্থায়ীর মোট মাত্রাসংখ্যা বার করে তার সঙ্গে মুখড়ার মোট মাত্রা যোগ করে দিন।

১৪ × ৩ = ৪২ ; ৪২ + ৪ = ৪৬ ∴ মোট ৪৬ মাত্রা।

এবার এই যোগফলকে ভাগ করুন ৩ দিয়ে। কারণ ৩ গুণ করতে হবে। দুগুণ করার সময় করেছিলেন ২ দিয়ে ভাগ। তাহলে বুঝুন যে, যতগুণ লয়কারী করতে হবে, পূরো মাত্রাসমষ্টিকে তত ভাগে ভাগ করে নিতে হবে।

$৪৬ \div ৩ = ১৫\frac{১}{৩}$ মাত্রা।

এবার দেখুন $১৫\frac{১}{৩}$ মাত্রা মানে কত আবৃত্তি কত মাত্রা।

$১৪ + ১\frac{১}{৩} = ১৫\frac{১}{৩}$। $\therefore ১৪ - ১\frac{১}{৩} = ১৪ - \frac{৪}{৩} = \frac{৪২-৪}{৩} = \frac{৩৮}{৩} = ১২\frac{২}{৩}$

অতএব সম থেকে $১২\frac{২}{৩}$ মাত্রা বাদ দিয়ে, তার পর থেকে তিগুণ আরম্ভ করতে হবে। ক'রে দেখা যাক ঠিক হয় কি না।

৩ + ২
১১ ১২ ১৩ ১৪ | ১ ২ ৩ ৪ ৫ | ৬ ৭
অ বি ০০,অ বিরগু লা০০ ল০লা ০লকে ০সর রঙ্গছি র০ক তবির্জ

০ ৩ +
৮ ৯ ১০ | ১১ ১২ ১৩ ১৪ | ১
তিয়০ন কো০হ রিপক র০কে০ ধায়ধা ০য়অ বিরগু লা

এবার দেখুন আড় লয় করতে হ'লে কোন জায়গা থেকে আরম্ভ করতে হবে। আড় লয় মানে দেড়ি লয়।

মোট মাত্রা সংখ্যা আগের মত বার করুন। হল ৪৬ মাত্রা। এবার এই মাত্রাকে $১\frac{১}{২}$ দিয়ে ভাগ করুন।

$$৪৬ \div ১\frac{১}{২} = ৪৬ \div \frac{৩}{২} = ৪৬ \times \frac{২}{৩} = \frac{৯২}{৩} = ৩০\frac{২}{৩}$$

এবার দেখুন, $৩০\frac{২}{৩}$ মাত্রা মানে কত আবৃত্তি? হবে ২ আবৃত্তি, $২\frac{২}{৩}$ মাত্রা। $২\frac{২}{৩}$ মাত্রাকে ১৪ (১ আবৃত্তি) থেকে বাদ দিন।

$$১৪ - ২\frac{২}{৩} = ১৪ - \frac{৮}{৩} = \frac{৪২-৮}{৩} = \frac{৩৪}{৩} = ১১\frac{১}{৩}$$

∴ উক্ত স্থায়ীটির আড় (দেড়গুণ) আরম্ভ করতে হবে সম থেকে $১১\frac{১}{৩}$ মাত্রার পর থেকে। যদি কোন সন্দেহ থাকে, মিলিয়ে দেখে নিন।

৩ +
১১ ১২ ১৩ ১৪ | ১ ২ ৩ ৪ ৫ |
অ ০;অ০ বি০র ০গু০ লা০০ ০০০ ল০০ ০লা০ ০০ল

২ ০ ৩
৬ ৭ | ৮ ৯ ১০ | ১১ ১২ ১৩ ১৪ |
০কে০ ০০স ০র০ রং০গ ০ছি০ র০০ ০ক০ ত০বি ০র্জ০

+ ২
১ ২ ৩ ৪ ৫ | ৬ ৭ |
তি০য় ০০ন০ কো০০ ০হ০ রি০প ০ক০ র০০কে

০ ৩ +
৮ ৯ ১০ | ১১ ১২ ১৩ ১৪ | ১
০০০ ধা০য় ০ধা০ ০০য় ০অ০ বি০র ০গু০ লা

দেড়গুণ মানে হ'ল তিনগুণ লয়কারীর অর্ধেক। অর্থাৎ ৩ মাত্রাকে ২ মাত্রার মধ্যে বলা।

॥ পাশ্চাত্য সঙ্গীত ॥

প্রথমেই বলা দরকার যে, পাশ্চাত্য সঙ্গীতের অধ্যায়ও ভারতীয় সঙ্গীতের মত এক বিরাট অধ্যায়। এই গ্রন্থের স্বল্প পরিসরে ঐ অধ্যায়ের ওপর সামান্য একটু আলোক সম্পাতের চেষ্টা করা হয়েচে মাত্র। যাঁরা সঙ্গীতের স্নাতক হতে চলেচেন, পাঠক্রম অনুসারে তাঁদের এ সম্বন্ধে যতটুকু জানা দরকার, ততটুকু আলোচনাই এতে করা হয়েচে, তার বেশি নয়।

॥ পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের স্বর ও অক্‌টেভ ॥

ভারতীয় স্বরের মত পাশ্চাত্য সঙ্গীতেও শুদ্ধ স্বর সাতটি। এই সাতটি স্বরের সাধারণ নাম হ'ল Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, (ডো, রে, মি, ফা, সোল, লা, সি)। সংক্ষেপে এদের বলা হয় যথাক্রমে C, D, E, F, G, A, B, সেই হিসেবে দুটি দেশের স্বরগুলির সাধারণ ক্রম নিম্নরূপ :—

সা রে গ ম প ধ নি
C D E F G A B

একটি কথা, C D E F ইত্যাদি স্বরের সংক্ষিপ্ত নামগুলি, এগুলি যে সব সময়েই ডো মানে সি, রে মানে ডি,—এমন না-ও হতে পারে। স্কেলের পার্থক্য অনুসারে ডো রে মি ফা ইত্যাদি যথাক্রমে B C D E ইত্যাদিও হতে পারে। 'স্কেল' সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় ব্যাপারটা বুঝতে আরো সুবিধে হবে।

স্বরকে ইংরিজীতে বলা হয় Note (নোট)। এই স্বরগুলিকে ডিগ্রীর (degree) অনুপাত হিসেবে যথাক্রমে first note, second note, third note, fourth note, fifth note, sixth note ও seventh note বলেও বোঝান হয়। আপনাদের কি মনে আছে, 'সঙ্গীতের ইতিবৃত্ত' পড়ার সময় (সঙ্গীত-পরিচিতি ॥ পূর্বভাগ) পড়েছিলেন, 'শিক্ষাকার নারদ ও বেদভাষ্যকার আচার্য সায়ন সাত স্বরের নাম দিয়েছিলেন প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম'? পাশ্চাত্ত্যের first note, second note নামগুলির প্রসঙ্গে উক্ত উল্লেখটি স্বভাবতই মনে পড়ে যায়।······

ইংরিজী সপ্তকে ব্যবহৃত এই স্বরগুলিকে আবার আরেক নামেও অভিহিত করা হয়। যেমন—

প্রথম C স্বরটিকে বলা হয় টনিক (Tonic)
দ্বিতীয় D " " " সুপারটনিক (Supertonic)
তৃতীয় E " " " মিডিয়াণ্ট (Mediant)
চতুর্থ F " " " সাবডমিনেণ্ট (Subdominant)
পঞ্চম G " " " ডমিনেণ্ট (Dominant)
ষষ্ঠ A " " " সাবমিডিয়াণ্ট (Submediant or
বা সুপারডমিনেণ্ট Superdominant)
সপ্তম B " " " লীডিং নোট (Leading Note
বা সাবটনিক or Subtonic)

পাশ্চাত্যের বিকৃত স্বরও আমাদের দেশের মত দু'রকম—তীব্র ও কোমল। ইংরিজীতে তীব্রকে বলা হয় (sharp) এবং কোমলকে বলা হয় ফ্ল্যাট (flat)। কিন্তু আমাদের যেমন কয়েকটি নির্দিষ্ট স্বরকেই কোমল বা তীব্র করা হয়—ওদেশে তা হয় না। ওদেশে প্রত্যেকটি স্বরকেই কোমল কিংবা তীব্র করা যেতে পারে। শুদ্ধ, কোমল ও তীব্র স্বরগুলিকে বলা হয় যথাক্রমে natural flat ও sharp.

Natural	Flat	Sharp
শুদ্ধ	কোমল	তীব্র

অবশ্য সাধারণতঃ শুদ্ধ স্বরের কোন চিহ্ন দেওয়া হয় না, তবে যখন কোন স্বরকে একবার কোমল বা তীব্র রূপে চিহ্নিত করার পর সেই স্বরেরই শুদ্ধ রূপটি দেখানোর দরকার হয়, তখনই natural-এর (শুদ্ধ) চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।

পাশ্চাত্য স্বরের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, উচ্চারণ ও লেখার জন্য স্বরগুলির পৃথক নাম ব্যবহার করা হয় কিন্তু আমাদের উচ্চারিত ও লিখিত স্বরের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। শুধু নামই নয়, লেখার সময় ওদেশের স্বর-গুলিকে চিহ্ন দিয়ে বোঝান হয়। স্বরলিপি পদ্ধতি আলোচনা করার সময় এ

বিষয়ে বিস্তৃত জানা যাবে। একটু একটু করে না বুঝে যদি সবগুলো একসঙ্গে বোঝবার চেষ্টা করা হয় তাহলে কোনটাই ভালো বোঝা যাবে না।

ভারতীয় সঙ্গীতে যেমন সাতটি শুদ্ধ স্বরের সমষ্টিকে বলা হয় সপ্তক, ইংরিজীতে তেমনি আটটি স্বরের সমষ্টি নিয়ে তৈরি হয় অকটেভ (octave)। তাছাড়া যে কোন স্বরের দ্বিগুণ উচু স্বরটিকেও অকটেভ বলা হয়। যেমন—

C D E F G A B C—সা রে গ ম প ধ নি র্সা

॥ স্বর-সপ্তক বা স্কেল ॥

আমরা যাকে বলি স্বর-সপ্তক, পাশ্চাত্ত্য দেশে তাকে বলা হয় স্কেল (scale)। স্কেল মানে হ'ল: An orderly succession of the notes employed in music. The diatonic scales (major, minor and modal), the chromatic scale, the whole-tone scale and the pentatonic scale are the principal scales which have been used in European music (R. Illing). অর্থাৎ, য়ুরোপিয়ান সঙ্গীতে মুখ্য কয়েকটি স্কেল ব্যবহৃত হয়। যেমন ডায়াটনিক স্কেল (মেজর, মাইনর ও মোডাল), ক্রমেটিক স্কেল, হোলটোন স্কেল ও পেণ্টাটনিক স্কেল। এগুলির মধ্যে আধুনিক কালের পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতে ডায়াটনিক ও ক্রমেটিক স্কেল দুটিই ব্যবহৃত হয়।

॥ ডায়াটনিক স্কেল ॥

ডায়া (dia) মানে দুই। তাই টোন ও সেমিটোন—এই দুই টোনের সমন্বয়ে যে স্কেলটি রচিত, তাকে বলা হয় ডায়াটনিক স্কেল। এই স্কেলে শুধুই সাতটি শুদ্ধ স্বর থাকে—ঠিক আমাদের বিলাবল ঠাটের শুদ্ধ স্বর সপ্তকের মত। হিন্দীতে এই স্কেলটিকে বলা হয় "সচ্চা স্বর সপ্তক"। "সচ্চা" মানে শুদ্ধ। ডায়াটনিক নোট মানেও হ'ল শুদ্ধ স্বর। এই স্কেলের স্বরগুলি সবই শুদ্ধ।

এই স্কেল বা সপ্তকের আবার দুটি উপবিভাগ আছে—**মেজর ডায়াটনিক** ও **মাইনর ডায়াটনিক** স্কেল।

যে স্কেলটিকে **মেজর ডায়াটনিক** বলা হয়, সেই স্কেলের সাতটি শুদ্ধ স্বরকে টোন (মেজর ও মাইনর) এবং সেমিটোন দিয়ে ভাগ করা হয়েচে।

টোন ও সেমিটোন হচ্ছে আমাদের শ্রুতির মত। আমরা যেমন শ্রুতি দিয়ে স্বরের ব্যবধান পরিমাপ করি, পাশ্চাত্ত্যে তেমনি টোন ও সেমিটোন দিয়ে ব্যবধান (interval) মাপা হয়। এ সম্বন্ধে পরে ভালোভাবে বুঝিয়ে দেব। এখন শুধু দেখান হচ্ছে, মেজর ডায়াটনিক স্কেলে একটি স্বর থেকে আরেকটি স্বরের মধ্যে কত টোন বা সেমিটোনের ব্যবধান আছে।

মনে রাখবেন, যে-কোন পর্দাকেই স্কেলের তারতম্য অনুসারে মূল স্বর ধরা যেতে পারে। এখানেও মনে করুন, আমাদের সা-এর মত পাশ্চাত্ত্যের মূল (root) স্বর হ'ল C. সেই হিসেবেই নিম্নলিখিত ব্যবধান দেখান হয়েচে।

সা— রে / C — D } এই দুই স্বরের মধ্যে ব্যবধান রয়েচে
১ টোনের (মেজর টোন) মানে ৪ শ্রুতির

রে — গ / D — E } এই দুই স্বরের মধ্যে ব্যবধান রয়েচে
১½ সেমিটোনের (মাইনর টোন) মানে ৩ শ্রুতির

গ — ম / E — F } এই দুই স্বরের মধ্যে ব্যবধান রয়েচে
১ সেমিটোনের (সেমিটোন) মানে ২ শ্রুতির

ম — প / F — G } এই দুই স্বরের মধ্যে ব্যবধান রয়েচে
১ টোনের (মেজর টোন) মানে ৪ শ্রুতির

প — ধ / G — A } এই দুই স্বরের মধ্যে ব্যবধান রয়েচে
১ টোনের (মেজর টোন) মানে ৪ শ্রুতির

ধ — নি / A — B } এই দুই স্বরের মধ্যে ব্যবধান রয়েচে
১½ সেমিটোনের (মাইনর টোন) মানে ৩ শ্রুতির

নি — সা / B — C } এই দুই স্বরের মধ্যে ব্যবধান রয়েচে
১ সেমিটোনের (সেমিটোন) মানে ২ শ্রুতির

উপরোক্ত হিসেবটি ঠিক আমাদের স্বর-শ্রুতি বিভাজনের হিসেবের মত। সেই জন্যই টোন বা সেমিটোনের পাশে শ্রুতি-সংখ্যাও লেখা হ'ল যাতে এক নজরেই দুটির মধ্যে সাম্য খুঁজে পাওয়া যায়।

আগেই বলেচি, এই স্কেলটির সঙ্গে আমাদের বিলাবল ঠাটের মিল আছে। বিলাবল ঠাটকে যেমন শুদ্ধ ঠাট কিংবা শুদ্ধ স্বরের ক্রমিক রচনাকে শুদ্ধ স্বর-

সপ্তক বলা হয়, তেমনি এই স্কেলটিকেও ইংরিজীতে অনেকে natural scale বলেন।

মাইনর ডায়াটনিক স্কেলটিতে C D E F G A B C স্বরগুলিকে এমন ভাবে টোন ও সেমিটোন দিয়ে ভাগ করা হয়েচে যে, আমাদের স্বরগুলি যদি ঐ হিসেবে সাজানো হয় তাহ'লে ঠিক আসাবরী ঠাটের মত হয়ে যাবে। অর্থাৎ গ, ধ ও নি স্বর ক'টি কোমল এবং অবশিষ্ট স্বরগুলি শুদ্ধ হবে। যেমন—

রে — জ্ঞ / D — E } এই দুই স্বরের মধ্যবর্তী ব্যবধান ২ শ্রুতির= ১ সেমিটোন (সেমিটোন)

জ্ঞ — ম / E — F } এই দুই স্বরের মধ্যবর্তী ব্যবধান ৩ শ্রুতির= ১½ সেমিটোন (মাইনর টোন)

প — দ / G — A } এই দুই স্বরের মধ্যবর্তী ব্যবধান ২ শ্রুতির= ১ সেমিটোন (সেমিটোন)

দ — ণি / A — B } এই দুই স্বরের মধ্যবর্তী ব্যবধান ৪ শ্রুতির= ১ টোন (মেজর টোন)

কিন্তু পরে এই নিয়মের সামান্য সংশোধন করা হয়েচে। আর সেই সংশোধন অনুসারে এই স্কেলটি বিভক্ত হয়ে গেচে দু' ভাগে—হার্মোনিক মাইনর ও মেলডিক মাইনর স্কেল-এ।

হার্মোনিক মাইনর স্কেলের সঙ্গে মাইনর ডায়াটনিক স্কেলের তফাৎ শুধু নি স্বরটিকে নিয়ে। মাইনর ডায়াটনিক স্কেলে আমরা দেখেচি কোমল ধ ও কোমল নি স্বরের মধ্যে ব্যবধান রয়েচে মাত্র ১ টোনের। হার্মোনিক স্কেলে কোমল নি-কে সরিয়ে আর এক টোন উঁচুতে স্থাপিত করা হ'ল। তাহ'লে ধ ও নি স্বরের মধ্যবর্তী ব্যবধান হয়ে গেল দেড় টোনের। আমাদের সপ্তক অনুসারে সাজালে এর চেহারা হবে সা রে জ্ঞ ম প দ নি র্সা। আমাদের পদ্ধতিতে এরকম চেহারার কোন ঠাট নেই।

মাইনর ডায়াটনিক স্কেলের কোমল ধ ও কোমল নি স্বর দুটিকে যদি তাদের পূর্ব স্থান থেকে এক সেমিটোন তুলে দেওয়া হয়, তাহলে সেই স্কেলটির চেহারা হয়ে যাবে—সা রে জ্ঞ ম প ধ নি র্সা। এই চেহারার স্বরসমষ্টিযুক্ত স্কেলকেই পাশ্চাত্ত্যে বলা হয় মেলডিক মাইনর স্কেল। হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে

এই চেহারার কোন ঠাট নেই। কিন্তু এই স্কেলটি বেশ মজার। এর আরোহ ও অবরোহ ক্রম একরকম নয়। আরোহ আগেই বলেচি। অবরোহটা হবে ঠিক মাইনর ডায়াটনিক স্কেলের নিয়মে। অর্থাৎ র্সা ণি দ প ম জ্ঞ রে সা।

এই হ'ল ডায়াটনিক স্কেলের বিভিন্নতার সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

॥ ইকোয়ালী টেম্পার্ড বা ক্রমেটিক স্কেল ॥

ডায়াটনিক স্কেলে কেবল সাতটি শুদ্ধ স্বরকে যেমন টোন ও সেমিটোন দিয়ে ভাগ করা হয়েচে, ইকোয়ালী টেম্পার্ড স্কেলে (equally tempered scale) তেমনি সাজানো হয়েচে শুদ্ধ ও বিকৃত মিলিয়ে মোট বারোটি স্বরকে। আর এই বারোটি স্বরকে ভাগ করা হয়েচে শুধুই সেমিটোন দিয়ে। শুধু তাই নয়, এই স্কেলের প্রত্যেকটি স্বরের মাঝখানে রাখা হয়েচে মাত্র একটি করে সেমিটোন অর্থাৎ বারোটি স্বরের প্রত্যেকটির মধ্যবর্তী ব্যবধান হ'ল বারোটি সেমিটোনের—২৪টি শ্রুতির। প্রত্যেকটি স্বরকে সমান সংখ্যক সেমিটোন দিয়ে ভাগ করা হয়েচে বলেই এই স্কেলের নাম রাখা হয়েচে ইকোয়ালী টেম্পার্ড স্কেল।—এই স্কেলটিকে ক্রমেটিক (chromatic) স্কেলও বলা হয়। ডায়াটনিক স্কেলকে যেমন এদেশী ভাষায় "শুদ্ধ স্বর সপ্তক" বা হিন্দীতে "সচ্চা স্বর-সপ্তক" বলা হয়, ইকোয়ালী টেম্পার্ড বা ক্রমেটিক স্কেলকে তেমনি বলা যেতে পারে "সমান স্বরান্তর যুক্ত সপ্তক", বা "সমবিভাগীয় সপ্তক" কিংবা "বিকৃত স্বর-সপ্তক"। ইংরিজীতে এই স্কেল সম্বন্ধে বলা হয়েচে : The system of tuning now used, which divides the octave into twelve equal semitones.

পিয়ানো, হারমোনিয়ম ইত্যাদি যন্ত্রগুলি এই স্কেলের ভিত্তিতে রচিত।

আচ্ছা এবার আপনাদের একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি।—বলুন তো, প্রত্যেকটি স্বরের মধ্যে যদি সমান ব্যবধান রাখা হয়, মানে সা থেকে কোমল রে, কোমল রে থেকে শুদ্ধ রে, শুদ্ধ রে থেকে কোমল গ, কোমল গ থেকে শুদ্ধ গ, শুদ্ধ গ থেকে শুদ্ধ ম, শুদ্ধ ম থেকে তীব্র ম, তীব্র ম থেকে প ইত্যাদি স্বর-গুলির মাঝে যদি সমান সংখ্যক সেমিটোনের (বা শ্রুতির) ব্যবধান থাকে, তাহলে স্বরগুলির রূপ ঠিক বজায় থাকে কি না ?

সকলেই বলবেন, না। কারণ আমরা আগেই জেনে এসেচি, ভারতীয় সঙ্গীতের স্বরগুলি "চতুশ্চতুশ্চতুশ্চৈব ষড়্‌জমধ্যমপঞ্চমা। দ্বৌ দ্বৌ নিষাদ গান্ধারৌ ত্রিস্ত্রির্ঋভ ধৈবতৌ" রীতিতে ভাগ করা আছে। পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের

ডায়াটনিক স্কেলের স্বরগুলিকে যে টোন ও সেমিটোন দিয়ে ভাগ করা হয়েচে, তা-ও আমাদের স্বর-শ্রুতি বিভাগের নিয়মের সঙ্গে অভিন্ন। আর ঐ ভাবে বিভক্ত সপ্তক বা স্কেলকেই বলা হয়েচে "শুদ্ধ স্বর সপ্তক" বা "Natural scale", অথচ ইকোয়ালী টেম্‌পার্ড স্কেলের সব স্বরগুলিই সমান সমান ব্যবধানে স্থাপিত। তার ফলে, রে ও গ স্বরের ব্যবধান ৩ শ্রুতির (১½ সেমিটোনের) বদলে এই স্কেলে হয়ে গেচে ৪ শ্রুতি (২ সেমিটোন) দূরে। ধ ও নি স্বরের ব্যবধানেও ঐ একই ত্রুটি লক্ষ্যণীয়। কোমল গ ও শুদ্ধ গ তথা কোমল নি ও শুদ্ধ নি স্বরের ব্যবধান উভয় স্কেলে ভিন্ন দেখা যায়। অতএব উভয় দেশের (ভারতীয় ও পাশ্চাত্য) পণ্ডিতদের মত অনুসরণ করে বলা চলে, ইকোয়ালী টেম্‌পার্ড স্কেলের স্বরগুলি কৃত্রিমতা দোষে দুষ্ট।

ঠিকই বলেচেন আপনারা। আর সেইজন্যেই উভয় দেশের পণ্ডিতেরাই এই স্কেলকে ত্রুটিপূর্ণ স্কেল বলেন। আর ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞেরা এই কারণেই রাগ-সঙ্গীত (ক্ল্যাসিকাল) শিক্ষার্থীদের হারমোনিয়ম বর্জন করার উপদেশ দিয়ে থাকেন।

॥ স্বরলিপি পদ্ধতি ॥

অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আমাদের দেশে যেমন বর্তমানে প্রচলিত আকার-মাত্রিক ও ভাতখণ্ডে পদ্ধতির (হিন্দুস্থানী পদ্ধতি) স্বরলিপি প্রতিষ্ঠা পেয়েচে, পাশ্চাত্য দেশেও তেমনি শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করেচে স্টাফ নোটেশন (Staff Notation)। শুধু পাশ্চাত্য দেশেই নয়, স্টাফ নোটেশন আজ আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করেচে। এই স্বরলিপি পদ্ধতি সম্বন্ধে জানতে হলে, আগে এই পদ্ধতির নিয়ম এবং পরিভাষাগুলি সংক্ষেপে জেনে নিতে হবে।

॥ স্টেভ বা স্টাফ ॥

প্রধানতঃ পাঁচটি সমান্তরাল রেখা (line) দিয়ে একটি ফ্রেমের (ladder) মত তৈরী করে নেওয়া হয়। এই ফ্রেমটিকে বলা হয় স্টাফ (Staff) বা স্টেভ (Stave)। Staff বা Stave হচ্চে : The parallel horizontal lines, now inveriably five in number, upon which music is written. (R. Illing).

পাঁচটি লাইন (line) এবং তার মধ্যবর্তী চারটি স্থান (space) দিয়ে

স্টাফ তৈরী করতে হয়। এই লাইন ও স্পেসগুলিকে গণনা করা হয় নিচের দিক থেকে ক্রমশঃ ওপর দিকে। অর্থাৎ শেষের (নিচের) লাইন এবং স্পেসই হ'ল ১ম লাইন এবং ১ম স্পেস। লাইনের ওপর এবং স্পেসের মধ্যে ডিমের মত গোল গোল চিহ্ন দিয়ে স্বরগুলি লিখতে হয়।

স্টাফ প্রধানতঃ দু' রকমের হয়—ট্রেব্‌ল (treble) ও বেস (bass) স্টাফ। এই দুটি স্টাফেই পাঁচটি লাইন ও চারটি স্পেস থাকে। তাছাড়া এগারটি লাইন ও দশটি স্পেস দিয়ে তৈরী এক রকম স্টাফ আছে—যাকে বলা হয় গ্রেট স্টাফ (Great staff)। স্টাফের লাইন ও স্পেসের নির্দিষ্ট নাম আছে। যেমন—

॥ নক্সা—১ ॥

লাইনের সংখ্যা	ভারতীয় স্বর	লাইনের নাম	স্পেসের নাম	ভারতীয় স্বর	স্পেসের সংখ্যা
১১	র্ম	F			
১০	রে´	D	E	র্গ	১০
৯	নি	B	C	র্সা	৯
৮	প	G	A	ধ	৮
৭	গ	E	F	ম	৭
৬	সা	C	D	রে	৬
৫	ধ্	A	B	নি্	৫
৪	ম্	F	G	প্	৪
৩	রে্	D	E	গ্	৩
২	নি্	B	C	সা্	২
১	প,,	G	A	ধ,,	১

এগারটি লাইন ও দশটি স্পেস বিশিষ্ট এই স্টাফকে বলা হয় গ্রেট স্টাফ বা গ্রেট স্টেভ। মধ্যের লাইনটিকে (৬ষ্ঠ লাইন) বলা হয় middle C (মধ্য সা)। মধ্য সা-এর নিচের অংশে লেখা হয় মধ্য সা-এর নিম্নবর্তী অর্থাৎ

আমাদের নিয়মে মন্দ্র এবং অতিমন্দ্র সপ্তকের স্বরগুলিকে এবং ওপরের ভাগে লেখা হয় মধ্য সা-এর পরবর্তী অর্থাৎ মধ্য ও তার সপ্তকের স্বরগুলিকে। তা'র মানে, মধ্য সা-এর লাইনটি এখানে দুই সপ্তকের সংযোগ রক্ষা করচে। পরবর্তী কালে মধ্য সা-এর লাইনটি তুলে দেওয়া হয়েচে এবং ওপরের ও নিচের অংশ দুটির মাঝে খানিকটা জায়গা ফাঁক রাখা হয়েচে। ওপরের ভাগটিকে বলা হয় ট্রেবল স্টাফ (বা ট্রেবল স্টেভ) এবং নিচের ভাগটিকে বলা হয় বেস স্টাফ (ব বেস-স্টেভ)। পিয়ানো বাজাবার সময় ডান হাত দিয়ে ট্রেবল স্টাফ ও বাঁ হাত দিয়ে বেস স্টাফের স্বরগুলি বাজাতে হয়। ট্রেবল ও বেস স্টাফের অবলম্বন হিসেবে একটি ব্র্যাকেট চিহ্ন থাকে বাঁ দিকে। এই ব্র্যাকেটের নাম হ'ল ব্রেস্ (brace)। ব্রেস মানে হল অবলম্বন। ব্রেস চিহ্নটি হ'ল এই রকম {।

ট্রেবল স্টাফের ওপর কী ভাবে স্বর লেখা হয়, বুঝে নিন। আগেই জেনে নিয়েচেন যে, প্রত্যেকটি লাইন এবং স্পেসের নির্দিষ্ট নাম আছে। স্বর লেখার সময় ই, জি, বি, ডি, এফ স্বরগুলি লিখতে হয় ঐ নামের লাইনগুলির ওপর এবং এফ, এ, সি, ই স্বরগুলি লিখতে হয় ঐ নামের নির্দিষ্ট স্পেসগুলির ভেতর যেমন—

নক্সা—২ ॥ লাইনের ওপর স্বর

পাশ্চাত্য স্বর	E	G	B	D	F
ভারতীয় স্বর	গ	প	নি	রেঁ	র্ম

নক্সা—৩ ॥ স্পেসের মধ্যে স্বর

E
C
A
F

পাশ্চাত্য স্বর	F	A	C	E
ভারতীয় স্বর	ম	ধ	র্সা	র্গ

মনে আছে তো, স্টাফের লাইন ও স্পেসগুলিকে নিচের দিক থেকে গুণতে হবে? সেই হিসেবে ট্রেব্‌ল স্টাফের (নক্সা—২) ১ম লাইনটির নাম ই, ২য় লাইনের নাম জি, ৩য়টির নাম বি, ৪র্থ টির নাম ডি এবং ৫ম লাইনের নাম হ'ল এফ। তেমনি ট্রেব্‌ল স্টাফের (নক্সা—৩) ১ম স্পেসের নাম এফ, ২য়টির নাম এ, ৩য়টির নাম সি এবং ৪র্থ স্পেসের নাম হ'ল ই। অতএব ই, জি, বি, ডি এবং এফ স্বরগুলি যথাক্রমে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম লাইনের ওপর তথা এফ, এ, সি এবং ই স্বরগুলি যথাক্রমে ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ স্পেসের মধ্যে লিখতে হবে। পাশ্চাত্ত্যের middle C-কে যদি আমরা আমাদের মধ্য সা ধরে নি, তাহ'লে ট্রেব্‌ল ও বেস স্টাফে লিখিত পাশ্চাত্ত্য স্বরগুলি আমাদের কোন্ কোন্ স্বর হবে বোঝাবার স্থবিধার জন্য নক্সা—২ ও নক্সা—৩-এর নিচে আমাদের স্বরগুলিও লিখে দেওয়া হয়েচে।

আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, মধ্য সা ও রে স্বর ছুটি তো উপরোক্ত চিত্রে দেখানো হয় নি, তাহ'লে সে ছুটি স্বর লেখার সময় কী ভাবে লিখতে হবে?

প্রশ্নটি খুব যুক্তিযুক্ত হয়েচে। এই প্রশ্নের উত্তর এবার শুনুন।

এই লাইনগুলি ছাড়া যদি আরো লাইনের প্রয়োজন হয়, তাহ'লে স্টাফের নিচে বা ওপরে ছোট্ট ছোট্ট লাইন দিয়ে স্বরগুলি সেই লাইন ও তার মধ্যবর্তী স্পেসের মধ্যে লেখা যেতে পারে। এই ছোট্ট ছোট্ট লাইনগুলিকে বলা হয় **লেজার লাইন** (Ledger Line)। এবার যদি আপনি মধ্য সা ও রে স্বর ছুটি লিখতে চান, তাহ'লে ট্রেব্‌ল স্টাফের ১ম লাইনের নিচে একটি লেজার লাইন টানুন। লক্ষ্য রাখবেন, লেজার লাইনগুলিও যেন সমান্তরাল হয়; মানে আগের লাইনগুলির মধ্যে যে ফাঁক ছিল, এখনও সেই ফাঁক বজায় রেখে লেজার লাইন টানতে হবে। লেজার লাইন টানার পর, সেই লাইনের ওপর ডিম্বাকৃতি চিহ্নটি দিলে হবে মধ্য সা এবং এই লেজার লাইন ও ১ম লাইনের মধ্যবর্তী স্পেসের মধ্যে আরেকটি ডিম্বাকৃতি চিহ্ন দিলে (যে ভাবে ৩নং নক্সায় দেওয়া আছে) হবে মধ্য রে।

ঠিক এই নিয়মেই স্টাফের ৫ম লাইনের ওপরেও প্রয়োজনমত লেজার লাইন দিয়ে আরো উঁচু স্বর লেখা যেতে পারে। আশাকরি মধ্য সপ্তকের সা থেকে তার সপ্তকের ম পর্যন্ত স্বরগুলি কী ভাবে লিখতে হয় বুঝলেন এবং সেই সঙ্গে

বুঝলেন ট্রেবল স্টাফের ব্যাপারটা। এবার বেস স্টাফের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। এই স্টাফের মধ্যে সা-এর নিচের মানে মন্দ্র এবং অতিমন্দ্র সপ্তকের স্বরগুলি লিখতে হয়।

যে ভাবে ট্রেব্‌ল স্টাফ তৈরী করা হয়েছিল পাঁচটি লাইন ও চারটি স্পেস দিয়ে, ঠিক তেমনি ভাবেই রচনা করুন বেস স্টাফ। বেস স্টাফের ১ম লাইনের নাম হ'ল জি, ২য় লাইনের নাম বি, ৩য়টির নাম ডি, ৪র্থটির নাম এফ এবং ৫ম লাইনটির নাম হ'ল এ। বেস স্টাফের লাইন এবং স্পেসগুলিও নিচের দিক থেকে গুণতে হবে। এই স্টাফের ১ম স্পেসটির নাম এ, ২য়টির সি, ৩য়টির ই এবং ৪র্থটির নাম হ'ল জি। অতএব বুঝতে পারচেন নিশ্চয়ই যে, জি, বি, ডি, এফ এবং এ স্বরগুলি যথাক্রমে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম লাইনের ওপর লিখিত হবে—যেমন ট্রেবল স্টাফের লাইনের ওপর স্বরগুলি লেখা হয়েছিল, ঠিক সেই ভাবে। আবার এ, সি, ই এবং জি স্পেসের মধ্যে লিখিত হবে ঐ নামের স্বরগুলি। আচ্ছা, এবার নিচের নক্সাটি (নক্সা নং ৪ ও ৫) দেখুন, তাহ'লে আরো স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারবেন।

॥ নক্সা—৪ ॥

॥ নক্সা—৫ ॥

॥ ক্লেফ ॥

এতক্ষণ আমরা যে ট্রেবল ও বেস স্টাফের কথা বললাম, সেই স্টাফ দুটি রচনার নিয়ম একই, অর্থাৎ দুটি স্টাফই পাঁচটি সমান রেখা ও চারটি সমান মাপের স্পেস দিয়ে তৈরী করতে হয়। কিন্তু এই দুটি স্টাফের চেহারা একই রকম হওয়ার জন্য চিনে নিতে অসুবিধা হবে বলে দুটি স্টাফের (ট্রেবল ও বেস) জন্য দু'রকম চিহ্ন দিয়ে স্টাফ দুটির পার্থক্য বোঝানর ব্যবস্থা করা হয়েচে। এই চিহ্নকে বলা হয় ক্লেফ সিগনেচার (cleff signature)। স্টাফের বাঁদিকে এই চিহ্ন দেওয়া থাকে। ট্রেবল স্টাফের চিহ্নটিকে বলা হয় ট্রেব্‌ল ক্লেফ্‌ (Treble cleff) এবং বেস স্টাফের নাম হ'ল বেস ক্লেফ (Bass cleff)। ট্রেবল ও বেস ক্লেফকে যথাক্রমে জি ক্লেফ (G cleff) ও এফ ক্লেফ্‌-ও (F cleff) বলা হয়। এ দুটি ছাড়া আরো অনেক রকম ক্লেফ আছে—যেমন, সোপ্রানো (soprano) ক্লেফ, অল্‌টো (alto) ক্লেফ বা টেনর (tenor) ক্লেফ ইত্যাদি কিন্তু পিয়ানোতে মাত্র ট্রেবল ও বেস ক্লেফেরই প্রয়োজন হয়। সংক্ষিপ্ত করার জন্য আমরাও এখানে শুধু এই দুটিরই আলোচনা করলাম। এই দুটি ক্লেফকে একই সঙ্গে লেখা হয় এবং যুক্ত করে দেওয়া হয় ব্রেস (brace) দিয়ে। অবশ্য ব্রেস না দিয়ে একটি মোটা লাইন দিয়েও যুক্ত করা যেতে পারে। এবার ক্লেফ চিহ্ন সহ দুটি স্টাফের ওপর স্বরগুলিকে লিখে দেখান হচ্চে (নক্সা ৬ দেখুন)। তাহলেই বিষয়টি আরও সহজ মনে হবে।

মধ্য সা স্বরটিকে লেজার লাইনের ওপর বসান হয়েচে। এই ভাবে যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে শেষ লাইনের ওপরে বা প্রথম লাইনের নিচে আরো লেজার লাইন দিয়ে উঁচু বা নিচু সপ্তকের স্বরগুলি দেখান যেতে পারে।

বলা বাহুল্য যে, আমাদের মন্দ্র সপ্তকের স্বরগুলিতে একটি এবং অতিমন্দ্র সপ্তকের স্বরগুলিতে দুটি হসন্ত চিহ্ন দেওয়া হয়েচে।

এই সম্পূর্ণ ফ্রেমটিকে বলা হয় স্কেল। স্কেল শব্দটি ল্যাটিন 'স্কালা' (scala) থেকে এসেচে। শব্দটির মানে হচ্চে 'ল্যাডার'। আর 'ল্যাডার' মানে হচ্চে সিঁড়ি—যার সাহায্যে ধাপে ধাপে ওঠা বা নামা যায়।

৬ নং নক্সাটি থেকে স্বরলিপি লেখার একটি নিয়ম আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেচেন যে, যে স্বর একবার লাইনের ওপর লেখা হয়েচে, সেই স্বরই

॥ নক্সা—৬ ॥

C D E F G A B C D E F
সা রে গ ম প ধ নি র্সা র্রে র্গ র্ম
ট্রেব্‌ল্ ক্লেফের চিহ্ন
মধ্য সা
মধ্য সা
MIDDLE C
ব্রেস্ চিহ্ন
বেস্ ক্লেফের চিহ্ন
G A B C D E F G A B C
প্‌‌ ধ্‌‌ ন্‌ সা রে্ গ্‌ ম্‌ প্‌ ধ্‌ নি্ সা
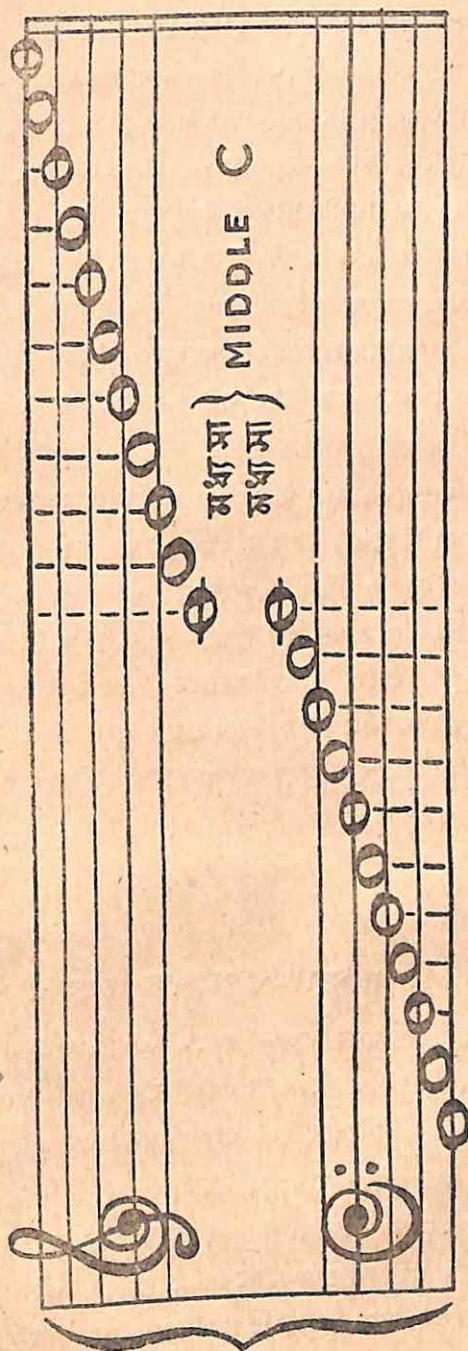
ভিন্ন অক্টেভে দেখাবার সময় লেখা হয়েচে স্পেসের মধ্যে। যেমন—৬নং নক্সার বেস ক্লেফের প্রথম জি ও শেষ জি কিংবা প্রথম এ ও শেষ এ। প্রথম জি (আমাদের অতি মন্দ্র প) লেখা হয়েচে লাইনের ওপর ; সেই জি যখন পরের অক্টেভে (আমাদের মতে মন্দ্র সপ্তকে) দেখানো হচ্চে, তখন তা লেখা হচ্চে স্পেসের মধ্যে। আবার ঐ ক্লেফেরই এ (অতি মন্দ্র ধ) প্রথমে লেখা হয়েচে স্পেসের মধ্যে কিন্তু যেই সেটি পরের অক্টেভে (মন্দ্র সপ্তকে) দেখাতে হচ্চে, তখনই সেটি লিখতে হচ্চে লাইনের ওপর। এ থেকে আমরা বুঝতে পারচি যে, একই স্বর অক্টেভের ভিন্নতা অনুসারে কখনও লাইনের ওপর কখনও স্পেসের মধ্যে লিখতে হয় এবং এই নিয়ম ট্রেবল ও বেস উভয় ক্লেফেই এক।

আরেকটি ব্যাপারও লক্ষ্য করার মত। কোন একটি স্বর যখন এক অক্টেভ তফাতে (উঁচু বা নিচুতে) থাকে, তখন সেই স্বর দুটির মধ্যে ব্যবধান থাকে মাত্র তিনটি লাইন ও তিনটি স্পেসের। ৬নং নক্সা দেখুন। দেখবেন, বেস ক্লেফের প্রথম জি (অতি মন্দ্র প) থেকে পরবর্তী অক্টেভের জি (মন্দ্র প), প্রথম এ (ধ্‌‌) থেকে পরের অক্টেভের এ (ধ্‌), প্রথম বি (নি্‌) থেকে পরবর্তী অক্টেভের বি (নি্) প্রভৃতি যে কোন স্বরই ঐ নিয়মে লিপিবদ্ধ করা হয়েচে। স্বরলিপি লেখার সময় এই প্রয়োজনীয় নিয়মগুলি আপনাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

॥ স্থায়িত্বজ্ঞাপক চিহ্ন ॥

হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে যখন কোন স্বরকে একাধিক মাত্রা পর্যন্ত দীর্ঘ বা স্থায়ী (length or duration) দেখাতে হয়, তখন সেই স্বরের পরে একাধিক ড্যাশ্‌ দিয়ে (স্থান বিশেষে সেই স্বরেরই পুনরুল্লেখ দ্বারা) তা বোঝান হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য স্বরলিপিতে স্বরের স্থায়িত্বজ্ঞাপক পদ্ধতিটি বড় সুন্দর। সেখানে স্বর-চিহ্নের মধ্যে নতুন চিহ্ন যোজনা করে বুঝিয়ে দেওয়া হয় কোন্ স্বর কতক্ষণ স্থায়ী হবে। আমরা আগেই জেনে এসেচি যে, এই পদ্ধতিতে, ডিম্বাকৃতি চিহ্ন দিয়ে স্বর লেখা হয়। সেই ডিম্বাকার স্বর-চিহ্নকে সামান্য হের-ফের করেই স্বরের স্থায়িত্ব বোঝান হয় ; যেমন :

স্থায়িত্ব জ্ঞাপক স্বরের নাম	স্থায়িত্ব জ্ঞাপক চিহ্ন	স্থায়িত্ব বা মাত্রার পরিমাণ
ব্রিভ (Breve)		১ ব্রিভ=২ সেমিব্রিভ=৮ মাত্রা
সেমিব্রিভ (Semibreve)		১ সেমিব্রিভ=২ মিনিম=৪ মাত্রা
মিনিম (Minim)		১ মিনিম=২ ক্রচেট=২ মাত্রা
ক্রচেট (Crotchet)		১ ক্রচেট=২ কোয়েভার=১ মাত্রা
কোয়েভার (Quaver)		১ কোয়েভার=২ সেমিকোয়েভার=½ মাত্রা
সেমিকোয়েভার (Semiquaver)		১ সেমিকোয়েভার=২ ডেমি-সেমিকোয়েভার=¼ মাত্রা
ডেমিসেমিকোয়েভার (Demisemi-quaver)		

অথবা, ১ ব্রিভ=২ সেমিব্রিভ=৪ মিনিম=৮ ক্রচেট=১৬ কোয়েভার=৩২ সেমিকোয়েভার=৬৪ ডেমিসেমিকোয়েভার।

ব্রিভ হল সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ স্বর—মানে অনেকক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। তার পরবর্তী স্থায়ী স্বর হল সেমিব্রিভ। এইভাবে মিনিম, ক্রচেট প্রভৃতি প্রত্যেকটি স্বরই যথাক্রমে কম স্থায়িত্বজ্ঞাপক। যেমন মনে করুন, একটি ব্রিভকে যদি আমরা ৮ মাত্রার সমান দীর্ঘ মনে করি, তাহলে একটি সেমিব্রিভের পরিমাণ হবে ৪ মাত্রা, একটি মিনিমের পরিমাণ হবে ২ মাত্রা ইত্যাদি।

উপরোক্ত সাতটি স্থায়িত্বজ্ঞাপক স্বর-চিহ্নের মধ্যে আমরা দেখেছি যে, ব্রিভ এবং সেমিব্রিভ ছাড়া অবশিষ্ট প্রত্যেকটিরই দুটি করে পৃথক চিহ্ন আছে। আর চিহ্ন দু'রকম হলেও তাদের পরিমাণে যে কোন তারতম্য ঘটে না, তা-ও আমরা জেনে নিয়েচি। কিন্তু পরিমাণের প্রভেদ না থাকলে কি হবে, দুটি চিহ্ন ব্যবহারের নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। এই নিয়মগুলি জানাও খুব জরুরী।

॥ স্টেম ॥

যখন কোন স্বর, স্টাফের মধ্যবর্তী লাইনের ওপর দিকে থাকে, তখন তার সঙ্গে যুক্ত দণ্ডটি (Stem) নিম্নমুখী হয় আর যখন স্বরটি স্টাফের মধ্যবর্তী লাইনের নিচের দিকে থাকে, তখন দণ্ডটি হয় উৰ্দ্ধমুখী। তাছাড়া উৰ্দ্ধমুখী স্টেম দিতে হয় ডিম্বাকৃতি স্বরের ডান দিকে এবং নিম্নমুখী স্টেম দিতে হয় স্বরের বাঁদিকে। মিনিম ও ক্রচেট স্বরের চিহ্নগুলি দেখলেই বক্তব্যটা বোঝা যাবে।

কোয়েভার, সেমিকোয়েভার ও ডেমিসেমিকোয়েভার চিহ্নগুলিতে স্টেমের সঙ্গে পতাকার মত যে চিহ্নগুলি দেওয়া হয়েচে, ইংরিজীতে সেগুলিকে বলা হয় টেল্ (Tail)। এই টেলগুলি সব সময়েই স্টেমের ডান দিকে থাকে—ভুলেও বাঁদিকে যাবে না। তবে স্টেমের ওপর দিকের টেলগুলি হবে নিম্নমুখী এবং নিচের দিক্‌কার টেলগুলি হবে উৰ্দ্ধমুখী।

॥ ডট্ ও টাই ॥

উপরোক্ত পরিমাণ ছাড়া যদি কোন স্বরকে আরো দীর্ঘ বা স্থায়ী বোঝাতে হয়, তাহলে ব্রিভ, সেমিব্রিভ প্রভৃতি চিহ্নের সঙ্গে বিন্দু (Dot) বা বন্ধনী (Tie) দিয়ে তা বোঝান হয়।

ডট্ হচ্ছে মূল স্বরের যে পরিমাণ, তার অর্ধেক। মূল স্বরের মাত্রা যদি ১ হয়, ডট্ হবে অর্ধেক। অতএব কোন স্বরের পরে (ডান দিকে) যদি একটি ডট্ (বিন্দু) দেওয়া থাকে, তাহলে সেই স্বরের পরিমাণ দেড়গুণ হয়ে যায়। যেমন, মনে করুন, যদি একটি সেমিব্রিভের পরে একটি ডট্ দেওয়া হয়, তার পরিমাণ হয়ে যাবে দেড় সেমিব্রিভ, মানে তিন মিনিমের সমান। সেমিব্রিভ মানে ৪ মাত্রা + ডট্ মানে ২ = ৬ মাত্রা। আবার যদি একটি মিনিমের সঙ্গে ডট্ দেওয়া থাকে, তাহ'লে তার পরিমাণ হয়ে যাবে তিন ক্রচেটের সমান। পুরো হিসেবের তালিকাটা এইরূপ—

১টি	ডট্‌যুক্ত	সেমিব্রিভ	= ৬ মাত্রা	= ৩ মিনিম
১টি	"	মিনিম	= ৩ "	= ৩ ক্রচেট
১টি	"	ক্রচেট	= $১\frac{১}{২}$ "	= ৩ কোয়েভার
১টি	"	কোয়েভার	= $\frac{৩}{৪}$ "	= ৩ সেমিকোয়েভার
১টি	"	সেমিকোয়েভার	= $\frac{৩}{৮}$ "	= ৩ ডেমেসেমিকোয়েভার

অনেক সময় একাধিক (দুই বা তিন) ডট্‌যুক্ত স্বরও দেখা যায়। সে ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ডটের পরিমাণ ধরা হয় প্রথম ডটের অর্ধেক এবং তৃতীয় ডটের

পরিমাণ ধরা হয় দ্বিতীয় ডটের অর্ধেক। অর্থাৎ ১ ডটযুক্ত সেমিব্রিভের পরিমাণ যদি হয় ১½, তাহ'লে ২ ডট্‌যুক্ত সেমিব্রিভের পরিমাণ হবে ১¾। তিন ডট্‌যুক্ত স্বর সচরাচর ব্যবহার করা হয় না।

এবার বুঝুন বন্ধনী (Tie) কি।

ইংরিজীতে টাই-এর ব্যাখ্যা এইরূপ: "It adds the value of the second note to that of first"—*Text Book of Trinity College of Music* অথবা "A note of same pitch is written on each side of a bar, the total value of the two being equal to the length of the note to be performed, and a curved line called a 'tie'"—*John Curwen.*

ঠিক বন্ধনীর মত আরেকটি চিহ্নও ব্যবহার করা হয়, তাকে বলা হয় স্লার্ (Slur)। এটি হ'ল আমাদের মীড় চিহ্নের অনুরূপ। পাশ্চাত্যেও এটি মীড় হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। এটি স্বরের ওপরে বা নিচে দু'দিকেই দেওয়া যেতে পারে। যখন স্বরগুলি স্টাফের ৩য় লাইনের ওপর দিকে থাকে, তখন স্লার চিহ্ন দেওয়া হয় ওপরে আর যখন স্বরগুলি ৩য় লাইনের নিচে থাকে, তখন স্লার্ দেওয়া হয় স্বরের নিচে।

একাধিক কোয়েভার, সেমিকোয়েভার প্রভৃতি স্বরকে যখন সমষ্টিগতভাবে (group) বোঝাতে হয়, তখন ঐ স্বরগুলির পতাকা একসঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়। এইভাবে পতাকাগুলিকে যুক্ত করার সময় যে রেখাটি টানা হয়, সেটি একটু মোটা এবং বাঁকা ভাবে টানতে হয়। যেমন:

দুটি কোয়েভারের একটি সমষ্টি
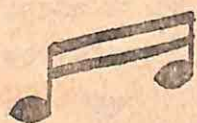
দুটি সেমিকোয়েভারের একটি সমষ্টি

চারটি ডেমিসেমিকোয়েভারের একটি সমষ্টি

॥ বিরাম চিহ্ন ॥

আমরা যাকে বলি বিরাম বা বিশ্রান্তি, ইংরিজীতে তাকে বলা হয় রেস্ট, পজ বা সায়লেন্স (Rest, Pause or Silence).

আমাদের স্বরলিপিতে অবশ্য বিরাম বা বিশ্রান্তির কোন বিশেষ চিহ্ন নেই যার দ্বারা বোঝা যায় কোথায় কতক্ষণ পর্যন্ত চুপ করে থাকতে হবে। পাশ্চাত্য-পদ্ধতি সেদিক দিয়েও এগিয়ে আছে—তার জন্য পৃথক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।

প্রত্যেকটি স্বরেরই বিরাম চিহ্ন আছে, সেইজন্য বিরাম চিহ্নগুলির চেহারা পৃথক হলেও নামগুলি রাখা হয়েচে ব্রিভ, সেমিব্রিভ প্রভৃতি স্থায়িত্বজ্ঞাপক চিহ্নের নামানুসারে। স্টাফের মধ্যে রেস্টগুলি কী ভাবে লেখা থাকে পরপৃষ্ঠায় দেখুন।

বিরাম চিহ্নের নাম স্থায়িত্বজ্ঞাপক চিহ্নের নাম অনুসারে রাখার তাৎপর্য এই যে, যদি একটি ব্রিভ-এর মাত্রা সংখ্যা হয় ৮, অর্থাৎ যদি সেটি ৮ মাত্রা পর্যন্ত স্থায়ী হয়, তাহ'লে ব্রিভ রেস্ট-এর বিরাম হবে ৮ মাত্রা পর্যন্ত অর্থাৎ ৮ মাত্রা পর্যন্ত থামতে হবে। এই ভাবেই সেমিব্রিভ ৪ মাত্রা অবধি দীর্ঘ হবে এবং সেমিব্রিভ রেস্ট চিহ্ন থাকলে থামতে হবে ৪ মাত্রা পর্যন্ত। মিনিম রেস্ট-এ যদি থামতে হয় ২ মাত্রা পর্যন্ত, তাহ'লে মিনিম-এ স্থায়ী থাকতে হবে ২ মাত্রা অবধি···ইত্যাদি ইত্যাদি।

রেস্ট-এর চিহ্নগুলি লক্ষ্য করলেই দেখবেন যে, সেমিব্রিভ আর মিনিম রেস্ট এবং ক্রচেট আর কোয়েভার রেস্ট-এর চেহারার মধ্যে কোন তফাৎ নেই। তফাৎ হল: সেমিব্রিভ রেস্ট লেখা হয় স্টাফের ৪র্থ লাইনের গা ঘেঁসে—৩য় স্পেসের মধ্যে এবং মিনিম রেস্ট লেখা হয় ৩য় লাইনের গা গেঁসে—৩ স্পেসের মধ্যে। ঠিক তেমনি ক্রচেট রেস্ট লিখতে হয় দণ্ডের (স্টেম) ডান দিকে এবং কোয়েভার রেস্ট দণ্ডের বাঁদিকে।

॥ স্বরান্তর বা ইণ্টারভাল ॥

দুটি স্বরের মধবর্তী ব্যবধানকে এদেশে বলা হয় স্বরান্তর, ওদেশে বলা হয় ইণ্টারভাল (Interval : The difference in pitch between two

notes)। এই ব্যবধানকে আমরা যেমন শ্রুতি দিয়ে মাপি, ওদেশে তেমনি ইণ্টারভালকে মাপা হয় টোন ও সেমিটোন (Tone and Semitone) দিয়ে।
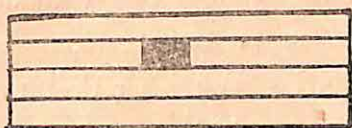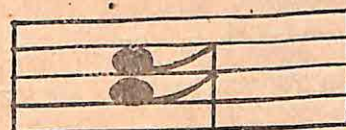
টোন দু'রকমের।—হোল টোন (whole tone) ও সেমিটোন (semi-tone)। হোল টোনকে শুধু টোন-ও বলা হয়। এক টোন হ'ল দুই

সেমিটোনের সমান (১ টোন = ২ সেমিটোন)। এই টোন দুটির প্রত্যেকটির আবার দুটি ক'রে উপবিভাগ আছে। হোল টোনের উপবিভাগ দুটির নাম হল মেজর টোন (Major tone) ও মাইনর টোন (Minor tone) এবং সেমিটোনের দুটি উপবিভাগের নাম হল মেজর সেমিটোন ও মাইনর সেমিটোন। মেজর টোনের গাণিতিক অনুপাত (ratio) হল ৯ : ৮ ($\frac{৯}{৮}$) ও মাইনর টোনের অনুপাত ১০ : ৯ ($\frac{১০}{৯}$)। তেমনি মেজর সেমিটোন ও মাইনর সেমিটোনের অনুপাত হল যথাক্রমে ১৬ : ১৫ ও ২৫ : ২৪ ($\frac{১৬}{১৫}$ ও $\frac{২৫}{২৪}$)।

শ্রুতি ও সেমিটোনের মধ্যে তফাৎ এই যে, দুই শ্রুতি হল আধ টোন বা এক সেমিটোনের সমান (২ শ্রুতি = ১ সেমিটোন = $\frac{১}{২}$ টোন)। তাহলে শ্রুতি, টোন ও সেমিটোনের পরিমাপটা হল এইরূপ :

১ শ্রুতি = $\frac{১}{২}$ সেমিটোন। ২ শ্রুতি = ১ সেমিটোন। ৪ শ্রুতি = ১ টোন = ২ সেমিটোন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা পাঁচ রকম স্বরান্তর (Interval) মানেন। যেমন, Perfect, Major, Minor, Diminished ও Augmented interval. আমরা একে-একে এই পাঁচ রকম ইণ্টারভালের পার্থক্য বুঝে নি।

১ ॥ **Perfect interval :** কোন অক্টেভের সা থেকে পরবর্তী ৪র্থ বা ৫ম স্বর পর্যন্ত (সা থেকে ম বা প) যে অন্তর মানে ব্যবধান, তাকেই বলা হয় Perfect interval.

২ ॥ **Major interval :** সা থেকে পরবর্তী ৩য় স্বরের (অর্থাৎ সা থেকে গ পর্যন্ত) ব্যবধানকে বলা হয় Major interval.

৩ ॥ **Minor interval :** আমরা আগেই বলেচি যে, পাশ্চাত্য সঙ্গীতে যে কোন স্বরই বিকৃত হতে পারে (মানে সেখানে অচল স্বর বলে কোন বস্তু নেই)। সেই নিয়মে, minor interval-কে দু' ভাবে ভাগ করা হয়।—সা থেকে কোমল গ পর্যন্ত অথবা তীব্র সা থেকে শুদ্ধ গ পর্যন্ত (C to D sharp অথবা C sharp থেকে E পর্যন্ত)। তাহলে দেখা যাচ্চে যে, major ও minor interval-এর মধ্যে তফাৎ শুধু মাত্র ১ সেমিটোনের (২ শ্রুতি)।

৪ ॥ **Diminished interval :** Perfect বা Minor interval থেকে যদি মাত্র এক সেমিটোন কমিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে তাকে বলা হবে Diminished interval.

৫। **Augmented Interval :** Perfect অথবা Major interval থেকে এক সেমিটোন বাড়িয়ে দিয়ে সেই ব্যবধানকে বলা হয় Augmented interval.

বৈজ্ঞানিকেরা এই স্বরান্তরকে মেপেচেন তুটি স্বরের আন্দোলন সংখ্যার (frequency) অনুপাত (ratio) দিয়ে।

যেমন, মনে করুন সা-এর আন্দোলন সংখ্যা হল ২৪০ এবং রে স্বরের আন্দোলন সংখ্যা হল ২৭০। এখন যদি ২৭০-কে ২৪০ দিয়ে ভাগ করা যায়, তাহলেই সা ও রে স্বরের মধ্যে কতটা ব্যবধান, তা বেরিয়ে যাবে। তারের দৈর্ঘ্য ও আন্দোলন সংখ্যার রহস্য সম্বন্ধে বোঝবার সময় যেমন স্বরের গুণান্তর বা স্বরান্তর বার করা হয়েছিল। এইভাবে অঙ্ক কষে রে থেকে গ, গ থেকে ম, ম থেকে প, প থেকে ধ, ধ থেকে নি ও নি থেকে তার সপ্তকের সা পর্যন্ত সব স্বরান্তরগুলি আমরা জেনে নিতে পারি। আসুন হিসেব করে দেখা যাক।

প্রথমে পাশ্চাত্ত্যের মতে স্বরের আন্দোলন সংখ্যাগুলি জেনে নিতে হবে।— সা=২৪০, রে=২৭০, গ=৩০০, ম=৩২০, প=৩৬০, ধ=৪০০, নি=৪৫০, র্সা=৪৮০।

এবার যে কোন স্বর থেকে তার পরবর্তী স্বরের ব্যবধান জানতে চাইলে পরস্পর তুই স্বরের আন্দোলন সংখ্যাকে একে-একে ভাগ করে যান—

$$\frac{\text{সা - রে}}{\text{C - D}}=\frac{২৭০}{২৪০}=\frac{৯}{৮}$$

$$\frac{\text{রে - গ}}{\text{D - E}}=\frac{৩০০}{২৭০}=\frac{১০}{৯}$$

$$\frac{\text{গ - ম}}{\text{E - F}}=\frac{৩২০}{৩০০}=\frac{১৬}{১৫}$$

$$\frac{\text{ম - প}}{\text{F - G}}=\frac{৩৬০}{৩২০}=\frac{৯}{৮}$$

$$\frac{\text{প - ধ}}{\text{G - A}}=\frac{৪০০}{৩৬০}=\frac{১০}{৯}$$

$$\frac{\text{ধ - নি}}{\text{A - B}}=\frac{৪৫০}{৪০০}=\frac{৯}{৮}$$

$$\frac{\text{নি - র্সা}}{\text{B - C}}=\frac{৪৮০}{৪৫০}=\frac{১৬}{১৫}$$

আরেক ভাবেও স্বরান্তর গণনা করা যায়। সেটি হচ্ছে, সা থেকে ক্রমশ রে, গ, ম, প, ধ ও নি স্বরের দূরত্ব নির্ণয় করা। অর্থাৎ, আমরা যদি জানতে চাই যে সা থেকে রে, সা—গ, সা—ম, সা—প, সা—ধ, সা—নি ও সা—র্সা পর্যন্ত দূরত্বের হিসেবটা কি, তাহলে উপরোক্ত নিয়মেই তা বার করা যাবে। যেমন—

সা - রে $= \frac{২৭০}{২৪০} = \frac{৯}{৮}$

সা - গ $= \frac{৩০০}{২৪০} = \frac{৫}{৪}$

সা - ম $= \frac{৩২০}{২৪০} = \frac{৪}{৩}$

সা - প $= \frac{৩৬০}{২৪০} = \frac{৩}{২}$

সা - ধ $= \frac{৪০০}{২৪০} = \frac{৫}{৩}$

সা - নি $= \frac{৪৫০}{২৪০} = \frac{১৫}{৮}$

সা - র্সা $= \frac{৪৮০}{২৪০} =$ ২ (অর্থাৎ দ্বিগুণ উঁচু)

॥ পাশ্চাত্ত্য স্বরের তাল বা টাইম ॥

পাশ্চাত্ত্যে যাকে 'টাইম' বলা হয়, আমরা প্রধানতঃ তাকেই বলি তাল। টাইম হচ্ছে : The arrangement of the beats within the bar.

এবার হয়ত প্রশ্ন করবেন beat এবং bar কাকে বলে ?

আমরা যাকে মাত্রা বলি, তাকেই ওদেশে বলা হয় বীট (beat)। আমরা যেমন মাত্রা দিয়ে গান-বাজনার সময়ের পরিমাপ করি, ওদেশেও ঠিক সেই ভাবে সঙ্গীতের সময়কে মাপা হয়। টাইম মানে হচ্ছে : A feature of time.

তালের বিভাগ দেখাবার জন্য আমরা যেমন দণ্ড চিহ্ন ব্যবহার করি, ওখানেও তেমনি টাইমকে বিভক্ত করা হয় দণ্ড দিয়ে। আর সেই দণ্ডটিকেই বলা হয় বার (bar)। ভাতখণ্ডে পদ্ধতিতে একটি বার বা দণ্ডেরই ব্যবহার দেখা যায়—শুধু তালের বিভাগ দেখাবার জন্য। সেখানে তালের আবৃত্তি (আবর্তন) বা গানের কোন অংশ শেষ হবার পর কোন পৃথক চিহ্ন থাকে না। কিন্তু আকারমাত্রিকে তার জন্য পৃথক চিহ্ন দেওয়া হয়। যেমন আবৃত্তির শেষে I, স্থায়ী বা অন্তরার শেষে II এবং গান শেষ হয়ে গেলে IIII। ইংরিজীতে তেমনি দু রকম ভাবে বার চিহ্ন দেওয়া হয়।

সাধারণ বিভাগগুলি দেখান হয় একটি বার দিয়ে এবং একটি সম্পূর্ণ অংশ—(এক আবৃত্তি বা স্থায়ী ইত্যাদির মত কোন ভাগ) শেষ হয়ে গেলে ছুটি বার দেওয়া থাকে। নিচের নক্সাটি দেখুন।—এই ভাবে বার দিয়ে যে বিভাগগুলি রচনা করা হয়; তাকে বলে মেজর (measure)। মেজর মানে মাপা।
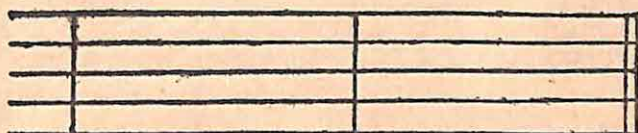
এবার নিশ্চয়ই বীট এবং বার পরিভাষা ছুটির অর্থ বুঝলেন।

এখানে একটি কথা জেনে রাখা দরকার। তাহলে আমাদের তাল পদ্ধতির সঙ্গে পাশ্চাত্যের তাল পদ্ধতির মূল তফাৎটা বুঝতে কোন অসুবিধা হবে না।

আমাদের সঙ্গীতে যেমন সব তালের বিভাগগুলি সমান মাত্রা বিশিষ্ট হয় না—যেমন মনে করুন, তেওরা, ঝাঁপতাল, ঝুমরা, ধমার ইত্যাদি,—পাশ্চাত্যের তালের সে রকম নিয়ম নেই। সেখানে প্রত্যেক বিভাগের মাত্রাসংখ্যা (beats) সমান (even) থাকে। অর্থাৎ, কোন বিভাগে ২ মাত্রা কোন বিভাগে ৩ মাত্রা কিংবা কোন বিভাগে ৩ মাত্রা বা কোন বিভাগে ৪ মাত্রা এরূপ হয় না। কোন বিভাগ ২ মাত্রার হলে সেই তালের সব বিভাগগুলিই ২ মাত্রা বিশিষ্ট হবে। কোন বিভাগ যদি ৩ মাত্রার হয়, তাহলে সব বিভাগগুলিতেই ৩ মাত্রা থাকবে।

দ্বিতীয়তঃ, আমাদের বিভিন্ন তালের জন্য বিভিন্ন রকম বোল বাণী থাকে, ওদেশে তা থাকে না। ওদেশে ঐ বীট বা মাত্রার ওপর যে আঘাত দেওয়া হয়, ঐ আঘাতের তারতম্যের ওপরেই এবং মাত্রা বিভাগের ওপরেই তাদের তালের বৈচিত্র্য নির্ভরশীল। সেইজন্যই ওদেশের শিল্পীরা আমাদের সঙ্গীতের তাল-বৈচিত্র্য দেখে অত বিস্মিত হন।

পাশ্চাত্যের টাইম-কে প্রধানতঃ দুভাগে ভাগ করা হয়েচে—সিম্প্ল টাইম (Simple time) এবং কম্পাউণ্ড টাইম (Compound time)। যাকে আমাদের ভাষায় বলা যেতে পারে সরল ও মিশ্র তাল।

একটু আগেই বলেছি যে, ওদেশী তালের বিভাগগুলি সমান মাত্রা-বিশিষ্ট হয় এবং কোন ভাগ দুই-দুই মাত্রার, কোন ভাগ তিন-তিন মাত্রার, কোন ভাগ চার-চার মাত্রার হয়ে থাকে। কোন্ ভাগটি কত মাত্রা-বিশিষ্ট, তা বোঝাবার জন্য তিন রকম নাম দেওয়া আছে।—ডুপ্ল টাইম, ট্রিপ্ল টাইম ও কোয়াড্রুপ্ল টাইম (Druple time, Triple time and Quadruple time)। নাম দেখেই বোঝা যাচ্ছে : ডুপ্ল মানে ২-২ মাত্রা, ট্রিপ্ল মানে ৩-৩ মাত্রা এবং কোয়াড্রুপ্ল মানে ৪-৪ মাত্রা-বিশিষ্ট ভাগ। এই উপবিভাগগুলি সরল (simple) ও মিশ্র (compound) দুই ভাগের মধ্যেই থাকে।

॥ সরল তাল বা সিম্প্ল টাইম ॥

বীট কাকে বলে আমরা জেনে নিয়েচি। একটি বার বা মেজরে যে কয়েকটি বীট থাকে (২, ৩ বা ৪), আঘাত দেবার বা বলবার সময় সমস্ত বীটের ওপরেই সমান জোর বা ঝোঁক দেওয়া হয় না। একটি দেওয়াল-ঘড়ি কল্পনা করুন। ঐ ঘড়ির পেণ্ডুলামটি যখন টিক্-টক্ শব্দ করে দুলতে থাকে, তখন নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেচেন যে, প্রথম টিক্-এর ওপর যত জোর পড়ে, দ্বিতীয় টক্-এর শব্দটি তত জোরালো না হয়ে একটু মৃদু হয়ে থাকে। এই ভাবে প্রত্যেক বিভাগেই, অন্যান্য বীট বা মাত্রা অপেক্ষা বার-এর প্রথম বীট-এর ওপর যে ঝোঁক বা জোর পড়ে, তাকে বলা হয় অ্যাক্সেণ্ট (accent)।

মাত্রার পরিমাণজ্ঞাপক স্বরের চিহ্নগুলির সঙ্গে আমরা ইতিপূর্বে পরিচিত হয়েচি। ঐ চিহ্নগুলিই তালের চিহ্ন স্বরূপ ব্যবহৃত হয় কিন্তু একটি বার-এর মধ্যে কতগুলি বীট (বা মাত্রা) আছে, তা বোঝাবার জন্য আরেক রকম চিহ্ন ব্যবহার করা হয় সংখ্যা দিয়ে। এই সংখ্যাগুলি লেখা হয় ক্লেফ সিগনেচারের ঠিক পাশেই—ভগ্নাংশের মত। এই ভগ্নাংশ দিয়ে আমরা যে শুধু বীট-এর সংখ্যা বুঝি তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারি, ঐ বীটগুলি যে স্বরের ওপর দেওয়া হবে, সেই স্বরগুলির পরিমাণ কত মাত্রা-বিশিষ্ট। অর্থাৎ প্রত্যেক বীটের জন্য কী ধরণের স্বর-চিহ্ন লিখতে হবে। এই ভগ্নাংশটিকে বলা হয় টাইম-সিগনেচার (time signature)। টাইম-সিগনেচারগুলি লেখা হয় এই ভাবে—

ডুপ্ল টাইমের জন্য লেখা হয় : $\frac{২}{২}$, $\frac{২}{৪}$, $\frac{২}{৮}$
ট্রিপ্ল টাইমের জন্য লেখা হয় : $\frac{৩}{২}$, $\frac{৩}{৪}$, $\frac{৩}{৮}$
কোয়াড্রুপ্ল টাইমের জন্য লেখা হয় : $\frac{৪}{২}$, $\frac{৪}{৪}$, $\frac{৪}{৮}$

এখন দেখুন, এই চিহ্নের দ্বারা আমরা কী বুঝচি !

ওপরের সংখ্যাটি দেখলে আমরা বুঝব, প্রত্যেকটি বার-এর মধ্যে ক'টি বীট বা স্বর আছে। ওপরের সংখ্যাটি যদি ২ থাকে, আমরা বুঝব, প্রত্যেকটি বার-এ ২টি করে বীট থাকবে। যদি ওপরের সংখ্যা ৩ হয়, বুঝতে হবে প্রতি বিভাগে (মানে বার-এ) বীট-এর সংখ্যা হবে ৩। তেমনি ওপরের ৪ সংখ্যাটি আমাদের বুঝিয়ে দিচ্চে যে প্রত্যেক বিভাগে ৪টি করে বীট হবে।

তেমনি নিচের সংখ্যাটি দেখলে বোঝা যাবে, প্রত্যেকটি বীট-এর জন্য কোন স্বরটি প্রযুক্ত হবে। কিন্তু এখানে আরেকটি বিষয় মনে রাখতে হবে। সেটি হচ্চে এই যে, সাধারণতঃ টাইম-সিগনেচারের নিচের সংখ্যাটি যে স্বর-চিহ্ন বা বীট লেখার নির্দেশ দেয়, সেই বীট হয় সেমিব্রিভেরই অংশ বিশেষ।

পাশ্চাত্ত্য স্বরের স্থায়িত্বজ্ঞাপক চিহ্ন পড়ার সময় আমরা যে হিসেবটি দেখেচি, সেই হিসেব অনুসারে জেনেচি যে ১ সেমিব্রিভ = ২ মিনিম, ১ সেমিব্রিভ = ৪ ক্রচেট এবং ১ সেমিব্রিভ = ৮ কোয়েভার। এই হিসেবটি মনে রাখলেই টাইম-সিগনেচার দেখে বীট লিখতে আমাদের কোন অসুবিধা হবে না।

তাহলে ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াল দেখুন। প্রথমে ডুপ্ল টাইমের ৩টি টাইম-সিগনেচার দেখা যাক। এই টাইম-সিগনেচারের ওপরের ২ সংখ্যাটি বলচে, প্রত্যেকটি বিভাগে বা বার-এর মধ্যে ২টি করে বীট্ থাকবে। আর নিচের সংখ্যা—

২ থাকলে, প্রতি বিভাগে ২টি করে মিনিম চিহ্ন বসবে,
৪ থাকলে, প্রতি বিভাগে ২টি করে ক্রচেট্ চিহ্ন বসবে এবং
৮ থাকলে, প্রতি বিভাগে ২টি করে কোয়েভার চিহ্ন বসবে।

এবার দেখুন ট্রিপ্ল টাইমের ৩টি টাইম-সিগনেচার।—ওপরের ৩ সংখ্যা মানে হচ্চে, প্রতি বিভাগে ৩টি করে বীট্ থাকবে। আর নিচের—

২ মানে প্রতি বিভাগে বা বার-এ ৩টি করে মিনিম,
৪ মানে প্রতি বিভাগে বা বার-এ ৩টি করে ক্রচেট এবং
৮ মানে প্রতি বিভাগে বা বার্-এ ৩টি করে কোয়েভার।

কোয়াড্রুপ্ল-এর তিনটি টাইম-সিগনেচার-এর (৪/২, ৪/৪ ও ৪/৮) মানে হচ্চে—

২ মানে, প্রতি বিভাগে ৪টি করে মিনিম,

৪ মানে, প্রতি বিভাগে ৪টি করে ক্রচেট এবং

৮ মানে, প্রতি বিভাগে ৪টি করে কোয়েভার থাকবে।

॥ মিশ্র বা কম্পাউণ্ড টাইম ॥

সরল টাইমে যে বীট্ বা স্বরগুলি আমরা ব্যবহার করেচি, সেগুলিতে কোন ডট্ ছিল না। কিন্তু আগে আমরা জেনেছিলাম যে, ডট্-যুক্ত স্বর দিয়েও স্বরের স্থায়িত্ব বোঝানো হয়। কম্পাউণ্ড বা মিশ্র টাইমে সাধারণতঃ ডট্-যুক্ত স্বরই (বীট্) ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ সেই মিনিম, ক্রচেট ও কোয়েভার চিহ্নগুলি কম্পাউণ্ড টাইমেও প্রযোজ্য কিন্তু সিম্প্ল টাইমে ঐ চিহ্নগুলি ডট্-যুক্ত ছিল না, কম্পাউণ্ড টাইমে ঐ চিহ্নগুলি ডট্‌যুক্ত হবে। এই হল দুই টাইমের বীটের চিহ্নগত তফাৎ।

যদিও ডুপ্ল্, ট্রিপ্ল ও কোয়াড্রুপ্ল টাইম, কম্পাউণ্ড টাইমেও আছে কিন্তু টাইম সিগনেচার সিম্প্ল টাইমের মত হবে না।

কম্পাউণ্ড টাইমের টাইম সিগনেচারের ওপরের সংখ্যাটি সাধারণতঃ সিম্প্ল টাইমের ৩ গুণ বেশি থাকে, আর নিচের সংখ্যাটি হয়ে থাকে ২ গুণ বেশি। যেমন মনে করুন, সিম্প্ল টাইমের ডুপ্ল টাইম-সিগনেচার ছিল ২/২, ২/৪ ও ২/৮। কম্পাউণ্ড টাইমের ডুপ্ল টাইম-সিগনেচার হবে ৬/৪, ৬/৮ ও ৬/১৬। আচ্ছা বেশ, আমি দুই টাইমেরই টাইম-সিগনেচার নিচে পাশাপাশি লিখে দিচ্চি, যাতে বিষয়টা আপনাদের কাছে পরিষ্কার ভাবে পরিস্ফুট হয়।

	সিম্প্ল টাইম	কম্পাউণ্ড টাইম
ডুপ্ল্	২/২ ২/৪ ২/৮	৬/৪ ৬/৮ ৬/১৬
ট্রিপ্ল্	৩/২ ৩/৪ ৩/৮	৯/৪ ৯/৮ ৯/১৬
কোয়াড্রুপ্ল্	৪/২ ৪/৪ ৪/৮	১২/৪ ১২/৮ ১২/১৬

॥ মেলডী ॥

একটির পর একটি স্বরকে যখন পৃথক-পৃথক ভাবে শ্রুতিমধুর করে প্রয়োগ করা হয়, সেই ক্রিয়াকে বলা হয় মেলডী (Melody)। ভারতীয় সঙ্গীত মেলডী প্রধান।·· ইংরিজীতে মেলডী বলতে বোঝায়—

A musically pleasing succession of notes.—*R. Illing.*

॥ হারমোনী ॥

দুই বা তা'র বেশি সংখ্যক স্বর যখন একই সঙ্গে শ্রুতিমধুর করে বাজানো বা সমবেত ভাবে গাওয়া হয়—তখন তাকে বলা হয় হারমোনী (Harmony)। আমাদের দেশীয় ভাষায় একে বলা হয় স্বর-সম্বাদ। হারমোনী প্রধানত দু' রকমের হয়—সিম্প্ল ও কাউণ্টার-পয়েণ্ট। হারমোনী সম্বন্ধে আর. ইলিং বলেন : One aspect of the simultanious combination of notes.

পরিশেষে একটি কথা আবার জানিয়ে রাখি। এই অধ্যায়ে পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হল, তা খুবই সামান্য এবং নিতান্তই মোটামুটি। এতদ্বারা পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত সম্বন্ধে খুবই স্বল্প ধারণা আপনার হবে। অতএব যেন মনে করবেন না,—এইটুকু জানলেই পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের সব কিছু জানা হয়ে গেল।

———

- - - - - পূর্ব ভাগ সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত - - - - -

যুগান্তর ॥ ···বিদ্যার্থীদের জন্য লেখা হলেও যে কোন ব্যক্তিই এ বইটি থেকে সঙ্গীতের ঔপপত্তিক বিষয়গুলির জ্ঞান আহরণ করতে পারবেন—এমন সহজ, সরল ও সরস ভাবে বিষয়গুলি লেখা। ২৭টি রাগের শাস্ত্রীয় পরিচয় ও ১৩টি তালের ঠেকা ঠায় থেকে আড় লয় পর্যন্ত এরূপ বিস্তৃত বর্ণনা এর আগে আর কোন বইতে দেখা যায় নি।

আনন্দবাজার ॥ ···উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্পর্কে যথেষ্ট নির্ভুল এবং প্রয়োজনীয় সংবাদই এই গ্রন্থে পরিবেশন করা হয়েছে। ···বাদ্যযন্ত্র ও প্রধান তার যন্ত্রের সংক্ষিপ্ত আলোচনা,···প্রধান ও পরিচিত রাগগুলির সঙ্গে···ছন্দ ও লয় বিষয়ে যেটুকু জ্ঞান সকল সঙ্গীত শিক্ষার্থীর থাকা উচিত, সেটুকু অতি সুন্দর ভাবে বলা হয়েছে।

দেশ ॥ ···আলোচ্য লেখক নিজে একজন দীর্ঘকালের সঙ্গীত-সম্পৃক্ত এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তি। সঙ্গীত পদ্ধতি, সাঙ্গীতিক পরিভাষা ও বিবরণ, বাদ্য ও তার প্রকার, ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিবৃত্ত প্রভৃতি সংক্ষেপে স্বচ্ছ ভঙ্গীতে আলোচনা করেছেন তিনি।···ছাত্রছাত্রীরা তো বটেই সঙ্গীত আগ্রহী মাত্রেই উপকৃত হবেন।

Hindusthan Standard ॥ ...In this book, Mr. Banerjee have taken particular care to explain the technical details and theories of North Indian Classical Music, in a language that is understandable without any effort... A learner will surely benefit going through the book.

শ্রীবিমলাকান্ত রায়চৌধুরী ॥ শ্রীযুক্ত নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপূর্ব গ্রন্থ "সঙ্গীত-পরিচিতি" শিক্ষার্থীদের মনে যে কী পরিমাণে স্বস্তি বহন করে এনেছে তা আমাদের বোধের বাইরে, শিক্ষার্থীরাই একমাত্র সে কথা বুঝতে পারবে, কারণ আমাদের পরীক্ষা দিতে হয় না, কিন্তু তাদের দিতে হয়। পরীক্ষার্থীরা সকলেই এক বাক্যে একথা বলে থাকে।

বনফুল ॥ ···তোমার 'সঙ্গীত-পরিচিতি' পেয়ে আনন্দিত হলাম। শেষ অধ্যায়টি পড়ে অনেক জ্ঞানলাভ করলাম।

অধ্যাপক শ্রীযামিনীমোহন কর ॥ ···সঙ্গীতের গোড়ার কথা, নতুন শিক্ষার্থীদের সহজ করে বুঝিয়ে বলা বেশ কঠিন কাজ। তিনি সেই কাজটি এত সুন্দর ও সাবলীল ভাবে করেছেন যে স্বতঃই প্রশংসা করতে হয়। আমার বিশ্বাস যে, যাদের জন্য এই পুস্তক লেখা হয়েছে তারা বিশেষ ভাবে উপকৃত হবে।